কবি ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ গুপ্ত

বন্ধুবরেষু—

প্রীতিধন্য

অশ্বিনী

পরিচয়-পত্র

আমাদের প্রীতিভাজন বন্ধু শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার পাল এম.এ. শুধু কবি নহেন, কথা-সাহিত্যিক। তিনি ইতঃপূর্বে 'মরু-প্রদীপ' নামক একখানা ছোট গল্পের বই লিখিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি 'জীবন ও যুদ্ধ' নাম দিয়া যে উপন্যাসখানি লিখিয়াছেন, তাহা পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না। এমন রোমাঞ্চকর উপন্যাস বহুদিন পড়ি নাই। উপন্যাসের ঘটনা আদৌ কাল্পনিক নহে। অশ্বিনীবাবু ব্রহ্মদেশে চাকুরী করিতেন। মহাযুদ্ধের সময় তিনি পদব্রজে ভারতে ফিরিয়া আসেন—সেই আগমন-কাহিনী তিনি কথা-সাহিত্যের মধ্য দিয়া চমৎকার ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সে-সময় কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়া তিনি যাহা দেখিয়াছেন, তাহাও এই পুস্তকে বর্ণনা করা হইয়াছে। যুদ্ধ মানুষের জীবনকে কি ভাবে বিব্রত, বিপন্ন ও বিপর্য্যস্ত করিয়াছিল কয়েকটি চরিত্র অঙ্কন করিয়া অশ্বিনী-বাবু সে কথা পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার কবিমন ও কবিত্ব-পূর্ণ ভাষা এই চরিত্র-চিত্রণকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে।

একদিকে সজল, সিন্ধু, খোকা, পাখী ও রামনাথের পদ-ব্রজে ভারতাভিমুখে যাত্রা-কাহিনী, আর একদিকে মৃণালিনী ও মুক্তার কলিকাতায় অসহায় জীবনযাত্রা-কাহিনী—উভয়

সাহিত্যরসিক প্রীতিময় বন্ধু ডাঃ পি, কে, বসু যে ভাবে আমাকে সাহায্য ও উৎসাহ দান ক'রেছেন গভীর সম্মানের সঙ্গে তার মর্য্যাদা অনুভব করছি। এ-ছাড়া বন্ধুবর সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায় চৌধুরী, স্নেহভাজনীয়া সাহিত্যপ্রতিভাময়ী শ্রীমতী নির্ম্মলা পাল, সাহিত্যানুরাগসম্পন্ন বন্ধুবর মিঃ এ, সি, নাগ প্রভৃতির নামও বিশেষ উল্লেখনীয়। এঁদের উৎসাহও আমার সাহিত্যজীবনের পরম সম্পদ হয়ে রইলো। প্রবর্ত্তক-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত রাধারমণ চৌধুরী মহাশয়ের কাছে অশেষভাবে ঋণী। তাঁর ঐকান্তিক সহযোগিতা ও প্রকাশতায় ব্যতীত জীবন ও যুদ্ধের প্রকাশ সম্ভব হ'তো না—এজন্য তাঁর কাছেও সশ্রদ্ধ চিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত বন্ধু সুকবি শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ও যথেষ্ট শ্রমস্বীকার করে' জীবন ও যুদ্ধের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছেন। শিল্পীবন্ধু শ্রীযুক্ত সুশীল পাল পুস্তকের প্রচ্ছদপট অঙ্কিত করে' বইটির শোভন বৃদ্ধি করেছেন। এজন্য এঁরা আমার ধন্যবাদার্হ। আমার অগ্রজপ্রতিম পরম শ্রদ্ধাস্পদ ভারতবর্ষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটি পরিচয়-পত্র লিখে আমাকে যে স্নেহাবদ্ধ করেছেন, তা আমার জীবনস্মৃতিপটে চির ভাস্বর হয়ে রইলো।

পরিশেষে আমার নিবেদন, 'জীবন ও যুদ্ধ' রচনায় হয়তো অনেক ত্রুটী-বিচ্যুতি আছে। আশা করি সুধী পাঠকপাঠিকা সে ত্রুটী-বিচ্যুতি মার্জ্জনার চক্ষে দেখে লেখককে অনুগৃহীত করবেন। এই উপন্যাস পাঠে যদি কেহ তৃপ্ত হন, তবেই আমার শ্রম ও প্রচেষ্টা সার্থক মণ্ডিত হবে। ইতি—

আইডিয়েল হোম
ক'লকাতা

অশ্বিনী পাল

—বাংলা পড়ো। মুক্তা বইয়ের স্যুটকেশটা টেবিলের উপর খুলে বসলো। তার মধ্যে রাশিকৃত জিনিষপত্র। লাল, নীল কতকগুলি উলের সূতা। সবুজ সূতার বোনা অসমাপ্ত একটি মানি-ব্যাগ, একটা রবারের বল—বলটির মধ্যে ছুটো টিয়া পাখী আঁকা, একটি জাপানী বাঁশী। মুক্তা বাঁশীটা বা'র করে' বাজিয়ে দেখালো, তারপর সজলের দিকে চেয়ে বললো—বাজাবেন আপনি? ফুঁ দিন জোরে। তারপর আবার নিজেই আর একবার ফুঁ দিয়ে বাঁশীটি বাক্সে রেখে দিলো। এবার বা'র করলো একটা বুলডগ, সবুজ সূতায় তৈরী। সেটা বা'র করেই সজলের মুখের কাছে ধরে নিজের মুখেই ঘেউ ঘেউ শব্দ করে' হেসে ফেললো। তারপর কুকুরটি রেখে দিলো টেবিলের উপর।

সজল একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো: ধমক দিয়ে বললো, রেখে দাও এখন ও-সব! শীগ্‌গির বই বা'র করো। ছাত্রী আবার বইয়ের ব্যাগের আরো অন্যান্য জিনিষপত্র সব একবারে বা'র করে' নীচ থেকে শিশুমালা বইখানা বা'র করলো। সজল আরো জোর গলায় বললো, পড়ো। মুক্তা পড়তে সুরু করে দিলো: "১৮২০ খ্রীঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মেদিনীপুর জিলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।" হঠাৎ পড়া বন্ধ করে' সে সজলকে জিজ্ঞাসা করলো, হ্যাঁ মাষ্টারমশায়, আজ কি আমাদের ছুটী?

সজল বিরক্ত হয়ে বললো, তোমাদের স্কুল ছুটী কিনা তা আমি কি করে জানবো?

ছাত্রী এবার আবদারের সুরে বললো, বলুন না—ছুটী কিনা? সজল বিপদে পড়লো। সে দেয়ালে ঝুলানো ক্যালেণ্ডারের দিকে চেয়ে দেখলো—আজকের তারিখটা লাল কিনারে কিনা? না, কোন ছুটী নেই তো; স্বাভাবিক কালো অক্ষরে লেখা রয়েছে ৬ই মার্চ। সজল বললো, না, আজ ছুটী নেই।

ইতিমধ্যে ছাত্রী পড়ার আসন ছেড়ে উঠে এসে ক্যালেণ্ডারের কাছে মাথা উঁচু করে' দাঁড়িয়ে ক্যালেণ্ডারে ছাপা কানন দেবীর ছবিটার দিকে চেয়ে বললো, একটা খবর জানেন?—কানন দেবীর বিয়ে হয়ে গেছে: আচ্ছা মাষ্টারমশায়, কানন দেবীর বর দেখতে কেমন? ভদ্রলোক?

দে'য়ালের বড় ঘড়িতে সাড়ে আটটা বাজলো। সাতটা থেকে সাড়ে আটটা: এই দেড় ঘণ্টা সময়ের মধ্যে মাত্র ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছেন—এ ছাড়া আর একটি লাইনও পড়া হয়নি মুক্তার; শুধু বাজে প্রশ্ন, বাজে কথা। সজল ছাত্রীর দিকে এবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' বললো, কাল থেকে যদি ভালো করে' পড়াশুনা না করো, তবে মার খাবে বলে দিচ্ছি, বুঝলে? সজল বেরিয়ে গেলো।

সমগ্র ইউরোপে তখন সমরাগ্নি জ্বলে উঠেছে। ধ্বংসরূপী মৃত্যু তখন ইউরোপের বুকে তাণ্ডব নৃত্য সুরু করে' দিয়েছে। হিটলারের অপ্রতিহত গতিতে সমস্ত ইউরোপ থর-থর কম্পিত। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা রাশিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূমি ইউক্রেইন তখন জার্ম্মানীর করতলগত। রাশিয়ার প্রতি মানব জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে অসীম বিক্রমের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত। প্রত্যহ ধ্বংস প্রলয়ের অভিযানের মর্ম্মন্তুদ সংবাদ পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ছে। এদিকে জাপানও ব্রিটিশ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে তোড়জোড় করছে। যে কোন মুহূর্ত্তে সমস্ত প্রাচ্যেও সমরাগ্নি জ্বলে উঠতে পারে। যে-কোন মুহূর্ত্তে যে কোন সুসভ্য শহরে বোমা-বর্ষণ হ'তে পারে। সে জন্য পরীক্ষামূলক সাইরেণ-ধ্বনি প্রাচ্যের শহরগুলিতেও মাঝে মাঝে বাজছে।

সজল মুক্তাকে পড়িয়ে ফিরছে। রাস্তায় নামতেই সাইরেণ বাজলো, কাছে কোন শেল্‌টার নেই, আর একটু এগিয়ে গেলেই সিঁড়ি বৌদি

বাসা। সজল দৌড়ে গিয়ে সে বাসায় ঢুকতেই সিন্ধু [illegible] ঠাকুরপো! বোমা পড়বে নাকি? সাইরেণ বাজছে কেন?

সজল বললো, পড়বে একদিন নিশ্চয়ই, তবে এখন নয়; দেরী আছে কিছুদিন। জাপান যেদিন যুদ্ধে নামবে তার পরদিনই তোমার [illegible] রেঙ্গুন ছাড়তে হবে।

সিন্ধুর স্বামী ফণিবাবু বর্মা রেলওয়ে অফিসে কাজ করেন। সজলদের পাশের গ্রামেই ফণিবাবুদের বাড়ী। সজল সেই দেশ-সম্পর্কে তাই ফণিবাবুকে দাদা আর সিন্ধুকে বৌদি বলে ডাকে। অল্ ক্লিয়ার সাইরেণ পড়লে সিন্ধু হেসে বললো, বাঁচা গেলো ঠাকুরপো, ভাবছিলাম মাথার উপরেই বোধ হয় বোমাটা পড়বে। আচ্ছা আমি মরে গেলে তোমার দাদার খুব কষ্ট হবে, না?

—বিয়ে যখন করিনি তখন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা যে কতদূর দৃঢ় তাতো জানি না, তবে সম্পর্কটা দৃঢ় হ'লে নিশ্চয়ই কষ্ট হবে।

—আমাদের সম্পর্কে তোমার কি মনে হয়?

—খুব শক্ত ও দৃঢ়।

—কি করে' বুঝলে?

—তোমাদের ছেলেমেয়ে হয়েছে, এখন সম্পর্ক নিশ্চয়ই খুব গভীর। ছেলেমেয়ে না হওয়া পর্যন্ত মেয়েরা থাকে শিথিল, ভয়ানক অপর পুরুষভক্ত আর চঞ্চল।

—বিয়ে না করে'ই তোমার মেয়েদের সম্বন্ধে এই ধারণা? এ বিশ্রী ধারণা কোথায় পেলে শুনি?

—অর্ধ শিক্ষিত ভদ্রসমাজে। সত্যি বলছি, এ জন্যেই ইচ্ছে করে ছেলেপিলে সহ একটি মেয়েকে বিয়ে করতে—নির্ভয়ে, নিঃসন্দেহে।

—সেই অভিনব আশাতেই বুঝি রয়েছো? বয়স তো একেবারে কম নয়?

—কম হবে কেন? তোমার প্রায় সমবয়সীই হবো।

—তোমার বয়স কত বৌদি?

—পঁচিশ।

—আমার চব্বিশ। এ বয়সে বর্ত্তমান জগতে কেউ বিয়ে করে? এ বয়স "যুদ্ধং দেহি"র বয়স; fight, conquer, kill, destroy, fire. ছেলে হোক মেয়ে হোক—এ বয়স বিয়ের বয়স নয়, যুদ্ধের এবং জয়ের বয়স। দেশের পর দেশ জয় করতে হবে, বোমার পর বোমা ফেলতে হবে; জয় না হোক, অন্ততঃ পৃথিবী ধ্বংস করতে হবে, ধ্বংসেই জয়, ধ্বংসেই আনন্দ। এ যুগে কেউ এ বয়সে বিয়ে করে? এ বয়সে বিয়ে করে' বৌদি তুমি বড্ড ভুল করেছো। ধ্বংসের আনন্দে জীবনটাকে উপভোগ করতে শিখলে না।

সিন্ধু বৌদি বললো, মনে হয় এ বয়সে বিয়ে না করলেই মস্ত বড় ভুল হয়ে যেতো। তোমরা যখন ধ্বংসের আনন্দে উন্মত্ত; আমরা স্বামী স্ত্রী তখন মুখোমুখী বসে এ ধ্বংসের স্তূপে স্বর্গ সৃষ্টি করে' চলি। তোমরা যখন বোমার উত্তপ্ত অনলে ভস্মীভূত, আমরা তখন প্রেমের মন্দাকিনীতে অবগাহন করি। দেশে দেশে আজ বিচ্ছেদের অন্ধকার, হিংসা বিদ্বেষের হোমানল; সুখ কোথায়, শান্তি কোথায়? এমন সময় সিন্ধুর পোষা বিড়ালটা মিউ মিউ করে' তার গা ঘেঁষে শুয়ে পড়লো। সিন্ধু বিড়ালটার নম্র দেহের উপর হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো, এ বিড়ালটা পর্যান্ত মানুষের স্নেহ চায়, মানুষের সঙ্গে একত্র মেলেমিশে সুখে থাকতে চায়, মিলন সকলেরই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। বিরহ, বিচ্ছেদ, ধ্বংস, প্রলয়, মৃত্যু কে চায়? মিলনেই প্রচুর প্রাণ, প্রচুর আনন্দ—তোমাদের ধ্বংসে নয়।

সজল বিড়ালটার পিঠের উপর একটা কিল বসাতেই বিড়ালটা পালিয়ে গেলো।

—বিড়ালটাকে মারলে কেন ?

—তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে ইচ্ছা করে : তুমি যেখানে চাও মিলন, আদর, স্নেহ, যত্ন, আমি সেখানে চাই বিরহ, বিচ্ছেদ, ঝগড়া, বিবাদ, যুদ্ধ ; পৃথিবীর নিয়ম তাই।

—যতই বলো না ঠাকুরপো, আমি দেশের এই যুদ্ধ-বিদ্রোহ মোটেই পছন্দ করি না। পৃথিবীর পুরুষগুলি যেন প্রলয় ঝড়, তারা যেন ধ্বংসের নেশায় মত্ত।

পরদিন সজল সকালে ছাত্রীকে পড়াতে গেলো : দরজায় ধাক্কা দিতেই মুক্তা দরজা খুলে দিয়ে ভীষণ গম্ভীর হয়ে পড়ার টেবিলের চারিদিকে ঘুরে কি খুঁজতে লাগলো। সজল চেয়ারে বসে অপেক্ষা করতে লাগলো, কিন্তু মুক্তার খোঁজা আর শেষ হয় না। মনে হলো কি যেন একটা দরকারী জিনিষ হারিয়ে গেছে। সজল আর একটু অপেক্ষা করলো কিন্তু সময় কোথা ? সজল বললো, মুক্তা, পড়তে বসো।

একটু দাঁড়ান মাষ্টারমশায়, ড্রেসটা বদলে আসি। বলেই মুক্তা বাড়ীর ভিতর চলে গেলো।

প্রকাণ্ড বাড়ী, উপরে নীচে চল্লিশখানা ঘর। মুক্তা কোন ঘরে ঢুকলো কে জানে ! সজল চুপ করে' বসে পড়ার ঘরের আসবাবপত্রের দিকে চেয়ে থাকে। পড়ার ঘর একটা হলের মত। দেয়ালের একদিকে তিনটা কাঁচের আলমিরা ; দামী কাঠের ফ্রেম করা। সে ফ্রেমে চীনা শিল্পীর আঁকা নানা রকমের পশু পাখী, লতা পাতা, ফুল ফল। কাঁচের ভিতর দিয়ে আলমিরার ভিতরের সব দেখা যায়। আলমিরা ভর্ত্তি দেবদেবীর ছোট ছোট নানা রকম পাথরের মূর্ত্তি। হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতার কোন দেবতাই বাদ পড়ে নি যেন। তার

উপর বুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্টও আছে। সজলের মনে হলো: এত দেবতা যার ঘরে সে নিশ্চয়ই ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয়হীন। আলমিরার এক পাশে পাথরের ষ্ট্যাণ্ডের উপর বসানো একটা কাঁচের ট্যাঙ্ক পরিষ্কার জলে ভর্ত্তি। তাতে লাল মাছগুলি সাঁতার কেটে সুন্দর খেলা করছে। দেয়ালের গা ঘেঁষে অপর পাশে দু'টী পাথরের মূর্ত্তি—একটি নারী আর একটী অর্দ্ধ নগ্ন পুরুষ। লজ্জায় সজলের চোখ দু'টী যেন বুঁজে এলো। বড়লোকের রুচির মধ্যে এত হীনতা!

মুক্তা এবার ড্রেস বদ্‌লে এলো। পরণে গ্রীণ রঙের পাতলা সূক্ষ্ম শাড়ী, তার চেয়েও ডীপ গ্রীণ ব্লাউজ; গলায় মুক্তার মালা, কানে মুক্তার দুল। স্বর্গের রাজকন্যা যেন ধরায় এলো! এসেই আবার টেবিলের চারদিকে ঘুরে কি খুঁজতে লাগলো। এবার খোঁজবার গভীর মনোযোগ দেখে সজলের মনে হলো: নিশ্চয় সুঁচ কিম্বা আলপিনজাতীয় কোন অতি ক্ষুদ্র জিনিষ হারিয়েছে; কিন্তু সে সব খোঁজবার সময় কি এখন? সজল এবার ধমক্ দিয়ে বললো, বলি, পড়বে—না এভাবে খোঁজাখুঁজি করবে? তোমার কি হারিয়েছে?

—বইয়ের সুট্‌কেশটা পাচ্ছি না।

সজলের গা জলে উঠলো: সে বল্‌লো, ভয়ানক দুষ্টু হয়েছো দেখছি: সুইকেশ টেবিলের নীচে হারিয়ে যায় কি করে? শিগ্‌গির বাড়ীর ভিতর থেকে সুট্‌কেশ নিয়ে এসো।

মুক্তা এবার অত্যন্ত ম্লান হয়ে বললো, যাচ্ছি। বলে আস্তে আস্তে আবার টেবিলের নীচে উপুড় হয়ে ঢুকে পড়লো। ঘরের পোষা বিড়ালটা এ সময় রোজই টেবিলের নীচে পড়ে ঘুমোয়। মুক্তা বিড়ালটাকে টেনে বার করে' দু'হাত দিয়ে ধরে উঁচুকরে' সজলের সমুখে এনে বললো, লালুকে বাড়ীর ভিতর রেখে আসি?

সজল ছাত্রীর কাণ্ড দেখে এবার হেসে বললো, ওর নাম বুঝি লালু?

—হ্যাঁ মাষ্টারমশায়, লালু বলে ডাকলে দৌড়ে সামনে আসে। দেখবেন মজা? বলে ভিতরের ঘরে ঢুকে বিড়ালটাকে কোথায় রেখে এলো, তারপর সজলের কাছে ফিরে এসে ডাকলো লালু, লালু। বিড়ালটা অমনি দৌড়ে এলো। মুক্তা আবার দৌড়ে ভিতরের ঘরে ঢুকে লালুকে ডাকলো, বিড়ালটা এক লাফে ভিতরে চলে গেলো। মুক্তা হাসতে হাসতে এসে বললো, দেখলেন কেমন মজা?

সজল বললো, আচ্ছা, এখন স্যুটকেশটা নিয়ে এসে পড়তে বসো, লক্ষ্মী মেয়ে তো?

মুক্তা এবার সত্য সত্যই স্যুটকেশ এনে তার ভিতর থেকে শিশুমালা বইখানা বা'র করে' বললো, মাষ্টারমশায়, বইয়ের মলাটটা ছিঁড়ে গেছে। একটু দাঁড়ান, এই আসছি, একমিনিট। বলে আবার বাড়ীর ভিতর ঢুকে আনন্দবাজার পত্রিকার এক সীট কাগজ এনে সজলের সম্মুখে ধরে বললো, বইয়ের মলাট দিয়ে দিন না। সজল রাগে কাগজখানা মুক্তার হাত থেকে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখে আটটা বেজে গেছে। সজল তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো।

ছন্নছাড়া অবিবাহিত জীবনের ভার বহন করতে পারে একমাত্র শহরের মেস ও বোর্ডিংগুলি। সেই হিসাবে সজলের একমাত্র আশ্রয়-স্থল লুইস ষ্ট্রীটের চার তলার একটা মেস। এই মেসের অপর পাশে মিস্টার দে'র বাসা। মিস্টার দে অফিসে বড় চাকরী করেন।

মেসের পাশে বাসা করে' আছেন একটি প্রবাসী বাঙালী পরিবার। মেসের লোকগুলি যেমন ভদ্র, সুমার্জিত, সুসভ্য—বাসার লোকগুলিও তেমনি সুশৃঙ্খল ও ভদ্ররুচিসম্পন্ন। মেস আর বাসাতে চিরদিন অভিন্ন-হৃদয়। ঘর পৃথক, কিন্তু মন প্রাণ এক। রান্না-বান্না

পৃথক, কিন্তু মেসের তরকারী বাসায় যায়, বাসার মাছের ঝোলও মাঝে মাঝে মেসে আসে। এমনি দু'পাশে দুটি সোনার সংসার। মেসের মেম্বার মাত্র চারজন; কাঠব্যবসায়ী প্রবীণ ললিতবাবু আর যৌবন-বয়সী জীবন, কানাই আর সজল। জীবনও কাঠ-ব্যবসায়ী, কানাই অফিসে কাজ করে, সজল করে টিউশনি। সজল মেসে এসে বেকার জীবনের একমাত্র সম্বল ঐ বিছানায় শুয়ে পড়লো। মনটা ভয়ানক খারাপ। মেয়েটা একেবারে পড়তে চায় না। টিউশনিটা এখন গেলে না গেলে হয়। পড়ায় একটুকুও প্রোগ্রেস হচ্ছে না, বড়লোকের মেয়ে, শাসন করতে গেলে শাসিত হতে হবে। ভূপেনবাবু আগেই বলে রেখেছেন—মেয়েকে পড়াবেন কিন্তু শাসন করবেন না যেন। ও আমার একমাত্র মেয়ে; প্রাণের রক্তের চেয়েও কোমল ওর প্রতি আমার স্নেহ, মায়া-মমতা। ও বেঁচে থাকলে হবে রাণী আর ওর স্বামী হবে রাজা। আমার এ বিপুল সম্পত্তির একমাত্র মালিক হবে ওরাই। তবে ম্যাট্রিকটা পাশ করে যদি তবেই ভাল; না করে সেও ভালো। ও পড়াশুনা করবে, স্কুলে যাবে—জীবনে একটা ডিসিপ্লিন্ গড়ে উঠুক ওর। শুধু পাশ করার মূল্য কি? চরিত্রে চাই ডিসিপ্লিন্, মাধুর্য।

মেসের চাকর সারদা এসে বললো, বাবু, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি? এখন শুয়ে পড়লেন যে! রান্না হয়ে গেছে, চান করে আসুন। ও বাড়ী থেকে দিদিমণি আপনাকে দুটো আম আর সন্দেশ দিয়ে গেছেন।

সজলের অবসন্ন মনে একটা জীবন্ত মাধুরী ঢেউ খেলে গেলো। আম, সন্দেশ জিনিষটা তুচ্ছ কিন্তু পাখীর স্বহস্তের এই নিবেদন—তার তুলনা নাই। বিপুল প্রশ্ন মনে জাগে, কিন্তু তার চেয়েও বিপুল প্রশ্ন মেসের ললিতবাবুকে নিয়ে। আজ ক'দিন যাবৎ তাঁর সঙ্গে সজলের জীবন তর্ক-বিতর্ক চলছে। তার মতে বর্তমানকালের প্রেম মানেই ব্যভিচার,

corruption। বর্তমান যুগের বাঙালী ছেলেমেয়েদের প্রেম ও ভালবাসার পিছনে নাকি রয়েছে ব্যভিচার। কুৎসিত দেহ-আকাঙ্ক্ষা, রক্ত-মাংসের পিপাসা; দেহ বিক্রী করে' প্রেম ও ভালবাসার মত পাই করা। কত বড় অন্যায় উক্তি একটা কর, শিক্ষিত বাঙালী সমাজের বিরুদ্ধে। সকলের মতে প্রেম হচ্ছে হৃদয়ের পবিত্র বন্ধন, অন্তরের আকুল আকূতি মিলনের জন্য। সেখানে দেহের কোন বিশ্রী গন্ধ নাই। এই কথা শুনে ললিতবাবু রাগ হয়ে বলেন, বাঙালী ছেলেমেয়ের সে পবিত্র প্রেম আর সে বিশুদ্ধ অন্তর আছে কোথায়? আছে শুধু দেহ আর গলিত রক্ত-মাংস। প্রেম করে' অপবিত্র হয়নি এমন ছেলেমেয়ে আজকাল আছে ক'জন? সজল কিছু বলে না, চুপ করে' থাকে। বেশী কিছু বলতে গেলে ঝগড়া হয়, এ যেন ছেড়ে পালাতে হয়। সে বোধ হয় যৌবন কালে কোন মেয়েকে কোনদিন ভালবাসে নাই। যে সারা জীবন কাটিয়ে এলো শুধু ব্রহ্মদেশ থেকে কাঠ কিনে ক'লকাতা চালান দিয়ে—প্রেমের খবর সে কি রাখবে? শুষ্ক কাঠের সাথে যার চিরদিন কারবার, সে বুঝবে কি প্রেমের মর্ম? এ লোকটার সামনে কোন যুবতী মেয়ের সম্বন্ধে কোন ভালো কথা বললেও বাঘের মত গর্জন করে' ওঠে। পাশের বাড়ীর মিষ্টার দে'র মেয়ে শাশ্বতী এসে আম, সন্দেশ দিয়ে গেলো—শুনে হয়তো মনে একটা বিশ্রী সন্দেহ করে' বসবে। এখন হয়তো কাঠের গুদামে আছেন; মেসে ফিরবার সময় হয়ে এলো। তার আগেই বরং খাওয়া দাওয়া শেষ করা যাক্—বলে সজল স্নান করে' এসে খেতে বসলো। সারদা ভাত দিতে দিতে বললো, বাবু, এ-সময়ে মেসের সবাই কাজে যায়, চাকরী-বাকরী করে আর আপনি সারা দিনরাত্তি মেসে পড়ে থাকেন। বিছানায় বসে অত কি-সব লেখেন? আপনি নাকি অনেকগুলো পাশ করেছেন শুনলুম, তবে চাকরী করেন না কেন?

সত্যিই সজল সারাদিন বসে বসে লেখে। সকাল বেলা দু'জনকে ঘণ্টাখানেক পড়িয়ে ফেলে এসে আহারাদি করে' একটু ঘুমিয়ে নেয়, তারপর বসে বসে কবিতা লেখে। বেকার জীবনের অফুরন্ত সময় আর কাটে না তার, তাই সে কবিতা লেখে। তবু সে ছন্দের পর ছন্দ মিলায়, সাথীদের কথার উত্তরে সে বল্‌তো—চাকরীর জন্ত আগে একটা মোহ ছিল, এখন আর সে মোহ নেই। চাকরী যারা করে এক বছরের ভিতরেই তারা অমানুষ হয়ে যায়। প্রকৃত যারা মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতে চায় তাদের জীবনের গতি ঝড়ের বেগের মতো, কোন বাধাই তারা মানে না। কারো অধীনতা তারা স্বীকার করে' জীবনের রক্ত গতিহীন করে' তোলে না।

সজল খাওয়া দাওয়া শেষ করে' বিছানায় এসে বসলো। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে খাতা বার করে' সে লিখলো :

তুমি যাহা দিলে পরাণের প্রীতি দিয়া—
অন্তরে তাহা করেছি গ্রহণ নিজেরে সমর্পিয়া।

এমন সময় ললিতবাবু কাঠগোলা থেকে এসে বললেন, আজকের জাহাজে মালগুলো সব পাঠাতে পারলুম না, দু'শো টন মাল। নদীর ঘাটে পড়ে রইলো সব। মিছামিছি কুলীর পেছনে কতগুলো টাকা খরচ করলাম। ব্যাটাদের কত বললাম, তাড়াতাড়ি কাজ কর, মালটা যাতে আজকের জাহাজে যায়, কিন্তু কার কথা কে শোনে! কোত্থেকে ক'টা বস্তী মেয়ে এসে কুলিদের সঙ্গে ইয়ার্কি সুরু করে দিলো, তাতেই ব্যাটারা কাজকর্ম সব ভুলে গেলো। কি দরকার ছিল ওই ছুঁড়ী ক'টার কুলিদের সঙ্গে হাসাহাসি করে' ইয়ার্কি করার? এ মেয়েজাত যেখানে আছে সেখানেই সর্বনাশের মূল। These are all corruptions.

সজল হেসে বললো, corruption নয় ললিতবাবু, energy.

ললিতবাবু রেগেই যেন বললেন, "Do n't talk !"

পরদিন সজল ছাত্রীকে পড়াতে গেলো। দরজায় ধাক্কা দিতেই মুক্তা এসে দরজা খুলে দিয়ে স্নিগ্ধ ফুলের মতো অধরপ্রান্তে হাসি ফুটিয়ে বললো, এত সকালেই এসে পড়েছেন? আমি তো ভাল করে' ঘুম থেকেই উঠিনি। আচ্ছা, একটু বসুন। একখানা বই পড়ুন—আপনি বই পড়তে ভালবাসেন না? বলে সামনের ঘরের বইয়ের আলমিরার সমুখে দাঁড়িয়ে তার মাকে ডেকে বললো—মা, আলমিরার চাবি কোথায়? মাষ্টারমশায় একখানা বই চাচ্ছেন।

ব্যাপার গুরুতর দেখে সজল মুক্তাকে ডেকে বললো, মুক্তা, এদিকে এসো, শুনে যাও। মুক্তা এসে বললো, মাকে ডাকাডাকি করে' এসব কি শোনাচ্ছ? আমি তোমাকে পড়াতে এসেছি, পড়বে তুমি—আমি আবার কি বই পড়বো? শীগগির তোমার বই নিয়ে এসো। মুক্তা চোখমুখ বুজে কতক্ষণ চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইলো, কতক্ষণ পরে আবার চোখ মেলে সজলের দিকে চেয়ে বললো, এত সকালে পড়তে বসবো? এমন সময় ঘড়িটায় সাতটা বাজলো, সজল বললো, সাতটা বেজে গেলো, এখনও বল্‌ছো এত সকাল?

মুক্তা গম্ভীর হয়ে বললো, বাবা বলছিলেন ঘড়িটা ঘোড়া হয়ে গেছে, লাফিয়ে চলে।

সজল ধমক্ দিয়ে বললো—চুপ কর, শীগগির বই নিয়ে এসো। মুক্তা খুঁজতে লাগলো। বইয়ের সুটকেশ রোজ হারিয়ে যায়। সজলের গা জ্বালা করতে লাগলো, বললো—বার করো, কোথায় সুটকেশ।

—রোজই তো এই টেবিলের উপরেই রাখি, আজ কোথায় গেলো? আচ্ছা দেখছি আমি। বলে রেডিওটার কাছে গিয়ে বললো, মাষ্টার-মশায়, এ বেলায় প্রোগ্রাম কি? বিদেশী খবর? শুনবেন একটু যুদ্ধের খবর? রেডিওটা চালাবো? শুনুন তো জাপানীরা এ-দেশে আসবে

কিনা! চালাবো? সজল রাগে জ্বলে' উঠলো, চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে মুক্তার সমুখে দাঁড়িয়ে বললো, শিগগির যাও বলছি, সুটকেশ কোথায়? মুক্তা এবার একটু ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর ঢুকে পড়লো। কতক্ষণ কেটে যায়, মুক্তার আসতে বিলম্ব হয়। সজল চুপ করে' কতক্ষণ রেডিওটার দিকে চেয়ে মনে মনে বিরক্ত হয়ে বললো, যত সব পড়ার ঘরে।

মুক্তা এসে বললো, সুট্‌কেশ খুঁজে পাচ্ছি না মাষ্টারমশাই! কোথায় যে রাখলাম! আপনি একটু খুঁজে দেখবেন? না থাক, আমিই দেখ্‌ছি। এই বলে সামনের রেলিং-দেওয়া বারান্দায় গেলো।—এই যে সুট

এখানে, ভুলেই গিয়েছিলাম। কাল রাত্রে ভয়ানক পূর্ব অনুরাগ তাই এখানে বসে পড়েছি বলে সুটকেশটা নি

এই বলে সে সুট্‌কেশটা সজলের বুঝি না—বলে পাখী হাসলো। করলো। সজল একনাগাড়ে বার বার হর্ন দিচ্ছে। পাখী তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেলো।

সজল মেসে ঢুকে দেখে জীবন মেসের মেঝের উপর মাদুর পেতে বসে চিঠি লিখছে। সজল জিজ্ঞাসা করলো, কাঠের হিসাব লিখছো বুঝি? যুদ্ধের বাজারে ক'লকাতায় একবার চালান দিতে পারলেই মোটা লাভ, না?

—এখন কাঠের কথা তুলবেন না—কাঠের হিসাব দু' মিনিটে করে' ফেলতে পারি। কিন্তু···বলে সজলের দিকে মুখ তুলে চাইলো। অসহায় দৃষ্টি, মলিন মিনতি ভরা। বললো, সজলদা, বড় বিপদে পড়েছি: কবিতায় চিঠিটা শেষ করতে চাই, কিন্তু ছন্দ মিলছে না। আপনি আমাকে অন্ততঃ তিন-চারটে লাইন কবিতা লিখে দেবেন।

সজলের মুখ ফেটে হাসি বেরোতে চায়; তবু গম্ভীর হয়ে বললো, প্রেমের চিঠি বুঝি?

আত প্রলয়ের আর্ত ছবি সকলের মনে মনে। সকলেই এই ধংসোন্মুখী রেঙ্গুন শহরটা ত্যাগ করে' পালাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পালবার চেষ্টা করলেই পালানো যায় না। ভারতবাসী এখানে এসেছে ব্যবসা করতে, ফ্যাক্টরী খুলতে, জমিজমা রেখে চাষ-আবাদ করতে, চাকরী করতে, ওকালতি করতে, ডাক্তারী করতে। বৎসরের পর বৎসর কত কষ্টে কত উপায়ে টাকা পয়সা রোজগার করে' বসবাস করছে। কিন্তু আজ সহসা জাপানী বোমার ভয়ে জীবনের সমস্ত অর্জিত ধন ফেলে

—সব সত্য কথাই খারাপ শোনায়, যারা সবাইকে জড়িত করেছে মনের আইডিয়ার ছবিটা সত্যের ছবি।

—তবে বলো।

—ধরুন, গভীর জোৎস্না রাত্রে প্রিয়ার ঘরে ঢুকেছি। প্রিয়া নিদ্রিতা। ঘরের জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না-ধারা তার মুখে, বুকে, চোখে এসে পড়েছে। সে ঘুমে অচেতন, অঙ্গে শিথিল বসন; অসাবধান সারা বক্ষস্থল; দেখে কেঁপে উঠলো আমার অসাবধান যৌবন-বাসনা।—নির্জ্জন গহন বনে সুপ্ত কমল অসীম পবিত্রতায় ভরা। আমি তার নিদ্রিত দেহ পানে চেয়ে যেন অসীম মাধুর্য্যে ভরে' গেলাম। আমার যৌবন কল্পনা যেন বিশুদ্ধ রূপ পেয়েলা।

সজল হেসে বললো, ও! প্রিয়ার উচ্ছৃঙ্খল অঙ্গে সুশৃঙ্খল বাসনা ঢেলে দিতে চাও?

—ঠিক তাই।

সজল লিখলো:

সুধা গন্ধে সর্ব্ব শুচি করি
ফুটিয়া যেন আছো পূজার ফুল,
অনাবৃত বক্ষ স্বর্গ ওই
চিত্তে মোর ভাঙ্গি আঁধার কূল।

কিনা! চালাবো? সজল রাগে জ্বলে' উঠলো, চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে মুক্তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললো, শীগগির যাও বলছি, স্যুটকেশ কোথায়? মুক্তা এবার একটু ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর ঢুকে পড়লো। কতক্ষণ কেটে যায়, মুক্তার আসতে বিলম্ব হয়। সজল চুপ করে' কতক্ষণ রেডিওটার দিকে চেয়ে মনে মনে বিরক্ত হয়ে বললো, যত সব জ্বালায় পড়া গেল।

মুক্তা এসে বললো, স্যুট্‌কেশ খুঁজে পাচ্ছি না মাষ্টারমশাই! কোথায় যে রাখলাম! আপনি একটু খুঁজে দেখবেন না?

এই বলে সামনের [illegible] নিজের স্ত্রীর সঙ্গে এমন উচ্চ আদর্শের প্রেম কেন? একেবারে শেফালী ফুলের মতো নির্মল, পবিত্র, অঙ্গস্পর্শহীন প্রেম।

—কেন? স্ত্রী কি শুধু যৌন প্রেমের জন্যই?

—যৌন প্রেমেই তো স্ত্রী সৃষ্টিরূপিনী, সন্তানের মঙ্গলময়ী জননী। কিন্তু সন্তানের জননী রূপেই কি স্ত্রীর সার্থকতা?

—সে কথা স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে দেখো, সে কি বলে।

—অনেক আগেই জিজ্ঞাসা করেছি সে কথা।

—কি বলেছে?

—বলেছে, তুমি যদি সত্যই আমাকে ভালবাসো, তবে আমার দেহ নিয়ে খেলা করতে পারবে না, কারণ আমি জননী হ'তে চাই না।

সজল গম্ভীর হয়ে বললো, সৃষ্টির মূলে ধ্বংস ডেকে আনতে চাও?

এবার হঠাৎ সাইরেন বাজলো। জীবন বললো, এখন দেখুন ধ্বংস করে কে?

জাপান তখনো যুদ্ধ-ঘোষণা করে নি সত্য: কিন্তু যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে। যে কোন মুহূর্তে বোমা ফেলে এই রেঙ্গুন শহর, এই ব্রহ্মদেশটা ধ্বংস করতে পারে। এমনি একটা

আশু প্রলয়ের ভয়ার্ত ছবি সকলের মনে মনে। সকলেই এই ধ্বংসোন্মুখী রেঙ্গুন শহরটা ত্যাগ করে' পালাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পালাবার চেষ্টা করলেই পালানো যায় না। ভারতবাসী এখানে এসেছে ব্যবসা করতে, ফ্যাক্টরী খুলতে, জমিজমা রেখে চাষ-আবাদ করতে, চাকরী করতে, ওকালতি করতে, ডাক্তারী করতে। বৎসরের পর বৎসর কত কষ্টে কত উপায়ে টাকা পয়সা রোজগার করে' বসবাস করতে। কিন্তু আজ সহসা জাপানী বোমার ভয়ে জীবনের সমস্ত অর্জিত ধন ফেলে রেখে পালাতে পারে না; ঐশ্বর্য্যের মায়া সবাইকে জড়িত করেছে যেন। কিন্তু তবু জীবনে বেঁচে থাকতে হ'লে এসব ঘরবাড়ী, ধনৈশ্বর্য্য, টাকা-পয়সা, ব্যবসা-বাণিজ্য সব কিছু পরিত্যাগ করে' এদেশ ছেড়ে পালাতে হবে, কিন্তু তবু কেউ পালাচ্ছে না। ঐশ্বর্য্যের অতল মোহে সবাই মুহ্যমান, সবাই ভাবে যখন বোমা-পড়ে-পড়ে অবস্থা হবে তখনই সরে' পড়া যাবে, কিন্তু তখন সরে পড়ার যে সময় থাকবে না, এখনই যে সেজন্য তৈরী হওয়া দরকার সে কথা ভেবে ভেবে সকলেই চঞ্চল, অস্থির ও উন্মাদপ্রায় হয়ে পড়েছে।

সমস্ত শহর ব্যাপী এমন একটা ধ্বংসের ছায়াপাত হয়েছে—কি যেন একটা মহামারীর গভীর আতঙ্ক সকলের হৃদয় জুড়ে বসে আছে। সরে' পড়তে হয় এখনি সরে' পড়ো—এ কথা সকলের মুখে, এমন কি গভর্ণমেন্ট পর্য্যন্ত ঘোষণা করে' সকলকে নিরাপদ স্থানে যেতে বলছে এবং চারিদিক থেকে গভর্ণমেন্ট সে ব্যবস্থাও করছে। যত বড় বড় চারতলা-পাঁচতলা বাড়ী আছে সে বাড়ীর বাসিন্দা তুলে দিয়ে সেখানে সৈন্যদের থাকার স্থান করে' দেওয়া হচ্ছে। সিভিল পপুলেশনের বাড়ী ঘরের কাছে কাছে ঘাঁটি তৈরী হচ্ছে, মেসিন গান বসানোর ব্যবস্থা হচ্ছে, মিলিটারী ব্যারাক তৈরী হচ্ছে, রাস্তার রাস্তায় ইঁটের গাঁথুনি-করা শেল্টার তৈরী হচ্ছে। বড় বড় অফিস ও বাড়ীগুলির

একতলার মেঝের নীচে ট্রেঞ্চ কাটবার ব্যবস্থা হচ্ছে। রাস্তায় রাস্তায় মিলিটারী বাসগুলি অহর্নিশ ছুটোছুটি করে' যুদ্ধের ব্যবস্থা করছে। ট্রামে বাসে ওঠবার সাধ্য নাই, লোকের ভিড় চতুর্গুণ বেড়ে গেছে। সকলের মনের মধ্যেই কি যেন একটা গভীর নীরব চাঞ্চল্য। মুখ চোখের দিকে চাওয়া যায় না; কি যেন একটা অসহ্য বেদনা সকলের বুকের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে আছে। লোকগুলি যেন কোথায় পালাতে চাচ্ছে। কোথায় গেলে যেন এ অসহ্য দুশ্চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পাবে; কিন্তু কোথায় যাবে? এ নিশ্চিহ্ন বোমার হাত থেকে মুক্তি পেতে হ'লে একমাত্র পথ রয়েছে দেশে চলে যাওয়া। কারণ ভারতবর্ষে যুদ্ধ গড়াতে এখনো অনেক দেরী। জাপান যদি যুদ্ধে নামে তবে ব্রহ্মদেশই আগে দখল করবে, পরে সম্ভব হ'লে ভারতবর্ষ। কাজেই পালাতে হ'লে ভারতীয়দের পক্ষে স্বদেশে চলে যাওয়াই উচিৎ। কিন্তু সে দেশ কি সামনে যে, মনে করা মাত্রই পৌঁছানো যায়। বঙ্গোপসাগরের মত একটা সমুদ্র পার হয়ে দেশে পৌঁছাতে হবে। কিন্তু জাহাজ কোথায়? সব জাহাজ এখন যুদ্ধের দরকারে নোঙর ফেলে চুপ করে' বসে আছে। সপ্তাহে মাত্র একখানা জাহাজ ছাড়ে, কার সাধ্য তার টিকিট পায়। জাহাজের বারো আনা অংশ সৈন্যদের জন্য রিজার্ভ থাকে। দেশে যেতে হ'লেও মহা দুশ্চিন্তায় পড়তে হয়। এই অবস্থায় নিরুপায় মানুষগুলি গভীর হতাশায় মৃত্যুই শ্রেয়ঃ ভাবে। কেহ কেহ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থান—যেখানে বোমার কোনো ভয় নাই সেখানে যাওয়াই স্থির করে। রেঙ্গুনের অধিকাংশ লোকই সে ব্যবস্থা করছে। স্ত্রী, পুত্র, ছেলে, মেয়ে সব শহর ছেড়ে বাইরে পাঠানোর ব্যবস্থা করছে। ট্রেণ, ট্রাম, বাসে সেজন্য লোকের ভিড় বেড়ে গেছে। লোক শহর ছেড়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু বাইরে থাকায় ভয়ানক

অসুবিধা, অসুখ বিসুখ এবং বন্দী গুণ্ডাদের ভয়ানক অত্যাচার। সেখানে এর মধ্যেই কোন কোন স্থানে লুঠপাট আরম্ভ হয়ে গেছে, অথচ এদিকে জাপান এখনো যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই। আজ করে কি কাল করে এমন অবস্থা। সাইরেনের পর সাইরেন বাজছে, অবশ্য পরীক্ষা-মূলক; কিন্তু শীঘ্র বোমা পড়বার সম্ভাবনা নাই। এ সব ভেবে বাইরে যারা চলে গেছে তারা আবার শহরে ফিরে আসছে। বাইরে এত চোর ডাকাত ও নানা ভয় ভাবনার মধ্যে আর কতদিন থাকা যায়? এমনি করে' আবার আস্তে আস্তে শহরে লোক ফিরে আসতে লাগলো। শহর আবার লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠলো। লোকের সাহস যেন আবার বেড়ে গেলো। বলতে লাগলো—বোমা পড়ে পড়ুক, শহর ছেড়ে আর কোথাও যাচ্ছি না। যখন বোমা পড়বে তখন দেখা যাবে। এদিকে কিন্তু যুদ্ধের আয়োজন দিন দিন বেড়েই চলেছে। ভারতবর্ষ থেকে জাহাজ ভর্তি সৈন্য এনে সিঙ্গাপুরে পাঠানো হচ্ছে। সৈন্যগুলি মাঠে-প্রান্তরে, বনে-জঙ্গলে বসে বসে অপেক্ষা করছে। চেহারা দেখলে মনে হয় অন্নজলের সঙ্গে বহুদিন এদের কোন সম্বন্ধ নাই। শুধু জীর্ণ কঙ্কাল মূর্ত্তি। না খেতে পেয়ে এরা যুদ্ধে নাম দিয়েছে। কারণ ভারতবর্ষে এর মধ্যেই দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়ে গেছে, হাজার হাজার লোক এখন থেকেই না খেয়ে মরতে সুরু করেছে। এ ভারতীয় লোকগুলি সৈন্য হয়েছে শুধু দুর্ভিক্ষ-বেদনায়। দেখলে বিশ্বাস হয় না যে, এদের দেহে কোন শক্তি সামর্থ্য আছে। এর মধ্যে অধিকাংশই কৃষক সম্প্রদায়ের দল; যুদ্ধের নামে যাদের বুক থর থর করে' কাঁপে তারাই আজ পেটের দায়ে সৈন্য সেজে সিংগাপুর চলেছে রেঙ্গুনের বনে-জঙ্গলে কিছুদিন বন্য পশুর মতো বিশ্রাম করে'। আর শ্বেতাঙ্গ সৈন্য যারা তারা মদ, মাংস আর মেয়েমানুষ নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করছে শহরের চারতলা পাঁচতলা বাড়ীগুলি দখল করে'। সে সব

বাড়ীর সিভিল পপুলেশন বর্ম্মী হোক ভারতীয় হোক—তাদের জীবন দিয়ে; আজ ঐ শ্বেত-সৈন্যদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কাছে তাদের কোন মূল্য নাই। বনে প্রান্তরে পড়ে থাকা ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মুহ্যমান এই ভারতীয় নূতন সৈন্যদের দিকে চাইলে মায়া হয়। করুণ কণ্ঠে বলতে ইচ্ছে করে—পরের জন্য এদেশে মরতে এলে কেন? ভারতের দুর্দ্দিনে ভারত রক্ষা করবে কে?

আজ প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে অল্ ক্লিয়ার বাজলো। সজল জীবনের দিকে চেয়ে বললো, এতক্ষণ কোনদিন সাইরেন থাকে না, আজ প্রায় ঘণ্টাখানেক পর ক্লিয়ার দিলো। ব্যাপার কি জীবন? আজকের কাগজ দেখেছো? জাপান ওয়ার ডিক্লেয়ার করেছে নাকি?

জীবন বললো, না, এখনো ব্রিটিশের সঙ্গে মীমাংসার কথা চলছে। ব্রিটিশ কোনো মীমাংসার কথাই গ্রাহ্য করে না; বোধ হয় দু'এক-দিনের মধ্যে যুদ্ধ বাধবে। কি করবেন, তার আগেই দেশে চলে যাবেন নাকি?

—স্ত্রী পুত্রের দুশ্চিন্তা তো আমার নেই যে, স্ত্রী পুত্র এখন সময় থাকতে পার করঁতে না পারলে পরে মহা বিপদ হবে। তুমি নতুন বিয়ে করে' এসেছো। নূতন জীবন, নূতন প্রেম, কাব্যে লেখা নূতন চিঠি—তোমার চলে যাওয়াই উচিৎ।

জীবন বললো, কিন্তু সেদিন মাত্র এলাম এখন যাই কি করে'? বাবা হয়তো ভাববেন ছেলের কি আর ব্যবসায় মন আছে, দু'দিন না যেতেই বাড়ী এসে পড়লো। বাবা কি আর এ জীবন-মৃত্যুর কথা বুঝবেন? তিনি বুঝেন শুধু টাকা। নির্ম্মলা কিন্তু বারবার বলেছে, বাপ মার কথা শুনবে না, বোমা পড়ার আগেই চলে আসবে।

—কিন্তু এখন কার কথা শুনবো, বাপ মার না নির্ম্মলার?

—বাপ মার অবাধ্য কোনদিন হইনি! কিন্তু স্ত্রীর অবাধ্যই বা হই কি করে? এখন গেলে বহু টাকা ক্ষতি হয়ে যায়, বাবা ভয়ানক চটে যাবেন।

—কিন্তু নির্মলা হেসে কাছে দাঁড়ালে?

—তখন সব ভুলে যেতে পারবো, তবু আর ক'টা দিন দেখি। বাবা বুঝুন যে, ব্যবসার জন্ম আমার কেমন আগ্রহ। যুদ্ধ একবার বাধুক তখন আমায় আর রাখে কে!

—তুমি এত ভীতু? বোমার ভয়ে বৌয়ের কাছে পালাবে?

—বোমার নীচে দাঁড়িয়ে বীরত্ব দেখাবার কোন মানে হয়? মৃত্যুকে এভাবে ইচ্ছে করে' বরণ করে' সাম্রাজ্য লাভ করার চেয়ে স্ত্রীর প্রেমে জয়ী হয়ে বেঁচে থাকা অনেক ভালো।

সজল হেসে বললো, থামো বলছি, স্ত্রীকে ভালবাসে সবাই, এর ভিতর অভিনবত্বের কিছুই নেই বরং এ অতি পুরানো কথা। যে তোমার স্ত্রী নয় তাকে ভাল বাসতে পারাটাই অভিনবত্ব।

জীবন গম্ভীর হয়ে বললো, পরস্ত্রীকে ভালবাসা? তার সঙ্গে প্রেমে পড়া? তারপর যৌনসম্বন্ধ? সে তো মহাপাপ।

সজল বললো, সৃজনশক্তির অপর নামই যৌনসংযোগ। এতে অন্যায়ের বা পাপের কি আছে? এ যুদ্ধে যখন পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে এবং কোটী কোটী লোক বিনাশ হবে, তখন এ বিলুপ্ত মানব বংশের স্থান পূরণ করবার জন্ম গভর্ণমেণ্ট হয় তো আইন করে' দেবে—যে নারী তোমার স্ত্রী নয় তার কাছে তুমি স্বামীত্বের দাবী করতে পারো।

জীবন বললো, গভর্ণমেণ্ট হয় তো সে কাজ করতেও পারে, কিন্তু আমি তার আগে I'll kill my wife ; because I love her.

দু' মাস পর। হঠাৎ কানাই এসে বললো, সজলদা, এর একটা ব্যবস্থা করতে হবে। সত্যিই এর একটা ব্যবস্থা না ক'রলে চলবে না।

তাড়া সবাই সমান দিই, একজনে উঁচুতে শুয়ে বেশ আরামে নাক ডেকে ঘুমোবে আর আমরা সারা রাত জেগে মরবো—এ হ'তে পারে না। কাল রাত্রিতে একটুও ঘুমোতে পারি নি। হাওয়া একদম পাইনি। হাওয়া পাবো কি করে? ঘরের মাঝখানে এত উঁচু করে দু' তিনটে চৌকি দিয়ে মহাজনী গদি পাতলে বাকী সব ঘরে বাতাস লাগতে পারে? ললিতবাবুকে আজ বলতে হবে তার গদি ভেঙে ফেলতে, সবাই মেঝের উপর বিছানা পেতে ঘুমাবো; সবার গায়েই সমান বাতাস লাগবে। তিনি কাঠের ব্যবসা করে' বড়লোক হয়েছেন। বেশ তো ভিন্ন বাড়ী নিয়ে থাকুন—লাইট, ফ্যান, খাট, চৌকি, পালঙ্ক যা কিছু সাজসরঞ্জাম নিয়ে আরামে বাস করুন; কিন্তু মেসে তা হ'তে পারবে না! সকলের সমান অধিকার।

সজল বললো, আজ রাত্রেই এর একটা ব্যবস্থা করবো।

রেঙ্গুনের বাড়ীগুলিই সব এক রকম। দু'খানা মাত্র ঘর—সোজা লম্বালম্বি ভাবে। পিছনের ঘরখানা একটু ছোট, তাতে রান্নাবান্না ও খাওয়া দাওয়া হয়। সামনের ঘরখানা বেশ বড়; সেখানা থাকা এবং শোবার জন্য। ললিতবাবু এ ঘরখানার ঠিক মাঝখানে তিন চারটে চৌকি একত্র লাগালাগি করে তার ওপর একখানা সতরঞ্চি আর বিছানার চাদর পেতে মহাজনী গদি তৈরি করেছেন। এ গদির উপর ছোট একটা কাঠের হাত বাক্স—সিন্দুর ও চন্দন ফোঁটায় চারিদিক রঞ্জিত। সামনের দিকটায় লাল মলাটের লম্বা মহাজনী খাতাগুলা থাক করে' সাজানো। বাক্সের সামনে ডান পাশে একটা পিতলের থালার উপর কালো কালির তিনটে দোয়াত, গোটা দুই উড, পেন্‌সিল, একটা নিবের কলম আর একটা খাগকের। আর ব্লটিং পেপারের পরিবর্তে কিছু পুটুলী বাঁধা বালি। এখানে দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টা বসে ললিতবাবু হিসাব লিখেন আর ক্লান্ত হ'লে পিছনের মোটা

বালিশটার উপর গা ঢেলে দিয়ে বসেন। সারাদিন এখানে বসে লেখা-পড়া করেন এবং রাত্রে এ গদির উপরই তোষক পেতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিছানা করে' নাক ডেকে ঘুমান। সজল, কানাই আর জীবন ঠিক এই গদির ও-পাশে মেঝের উপর বিছানা পেতে ঘুমায় এবং এ গদি থাকার দরুণ একটু বাতাসও এরা পায় না, গরমে ছটফট করে। আজ এরা তিনজনে মিলে পরামর্শ করলে যে, এ গদি ভেঙে দিতে হবে। ললিতবাবুকেও নীচের মেঝের উপর তাদের মত বিছানা পেতে শুতে হবে। সকলের সমান ভাড়া, সমান অধিকার।

রাত্রি বেলা এ নিয়ে কথা উঠলো। সজল হাসতে হাসতে বললো, ললিতবাবু, কিছু মনে করবেন না, সত্যিই রাত্রে ঘুমানো যায় না। এক তো ছাড়পোকার কামড় তার উপর ভয়ানক গরম। আমরা একটুও বাতাস পাই না। আপনার গদিটা একটু ডান দিকে সরিয়ে নিলে জায়গাটা বেশ ফাঁকা হয় আর বাতাসও আমরা পাই।

কথাটা শুনে ললিতবাবু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। চাকর সারদাকে ডেকে তামাক দিতে বললেন। ললিতবাবু তামাক বেশী খান না, যখনই মনের অবস্থা খারাপ হয়ে ওঠে তখনই বসে বসে টানেন আর ধোঁয়াগুলি নানা ভঙ্গী করে' মুখ থেকে বা'র করেন। তামাক সেজে দিতে সামনে যদি কেউ না থাকে তবে নিজের ক্ষুব্ধ মনের অবস্থা প্রকাশ করবার জন্য নিজের গামছা দিয়ে গদিটা বার বার ঝাড়তে আরম্ভ করে' দেন। আজও সারদা কাঁচুমাচু করে' সমুখে এসে দাঁড়িয়ে যখন বললো, বাবু, তামাক নেই। তখন ললিতবাবু নিজের গামছা দিয়ে গদিটা ঝেড়ে ফেলতে লাগলেন। গদির পাশে দেয়ালের গায় প্রকাণ্ড একটা ফাটল, তার মধ্যে কপোত-দম্পতী বাসা করেছে। তারি দু'একটা কুটো গদির উপর এসে পড়েছে। কপোত দু'টী তখনো বাসায় বসে ঘন ঘন চঞ্চু চুম্বন করছে, আর বাক্-বাকুম্ স্বরে প্রণয়-নিবেদন করছে।

ললিতবাবু সেদিকে মাথা তুলে চেয়ে বললেন, all corruptions. তারপর একটু থেমে বললেন, তোমরা যুবক মানুষ, এ বয়সে ঘুমাতে না পারলে আর ঘুমাবে কখন? আগে দেহ ঠাণ্ডা কর, মন ঠাণ্ডা কর, সহজেই ঘুম আসবে। বলে নিজেই একটু হাসলেন। তোমাদের মতো বয়সে পথে ঘাটে ধূলো বালিতে পড়ে ঘুমিয়েছি। এখানে এ চারতলার উপরেও যদি তোমাদের ঘুম না আসে তবে আমি তার কি করবো?

কানাই বললো, হাসি তামাসার কথা নয় ললিতবাবু, কথাটা একটু বিবেচনা করে' দেখবেন। সত্যিই গদিটা একটু সরিয়ে পাতলে ভালো হয়। গদির সামনের ঐ আল্‌মারী তিনটে একটু এদিকে সরিয়ে গদিটা এখানে পাততে পারেন।

—কিন্তু আল্‌মারী আমার হাতের সামনে থাকাই দরকার। গদিতে বসে বসে যেন ওটা খোলা যায়। টাকা পয়সা, পত্রাপত্র সব হাতের সামনে চাই। আজ তেরো বছর যাবৎ এ বাড়ীতে আছি এবং ঠিক এ ভাবেই ওগুলো আছে; এখন একটু উনিশ-বিশ হ'লেই আমার কাজের অসুবিধা হবে। তা ছাড়া ওদিকে আল্‌মারীগুলি সরাবোইবা কি করে'? যেখানে আল্‌মারী সরাতে বলছো, সেখানে একবার চেয়ে দেখতো? জায়গা রয়েছে কোথায়? তোমাদের ট্রাঙ্ক, সুটকেশ, আলনা। একধারে আবার তোমাদের বিছানাপত্র তুলে রাখবার জায়গা। আর এক পাশে আবার সজলবাবুর বইয়ের পাহাড়; কোথায় যে কি রাখি?

জীবন চটে উঠে বললো, সে-সব আমরা বুঝি না ললিতবাবু, আমরা সমান ভাড়া দিচ্ছি সমান অধিকার নিয়ে থাকবো।

ললিতবাবু অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ লোক। প্রশ্নে যখন ঠেকে পড়েন তখন হাসতে থাকেন। জীবনের কথার উত্তরে আগে খুব হাসলেন।

তারপর বললেন, সমান অধিকারের কথা যে বলছো—তা বেশ ভালো কথা, বেশ তুমিও যেমন আমিও তেমন—বেশ ভালো আইডিয়া। কিন্তু তোমরা ছেলেমানুষ—সমান অধিকারের মানে তোমরা বুঝবে কি? We are all equal বলতে সহজ, কিন্তু সেই মন্ত্র জপ করলে কি আর সংসার চলে? তুমি আমি বিভিন্ন আছি বলেই সংসারটা এত সুন্দর রূপে চলছে।

কানাই এবার একটু গরম হয়ে বললো, আপনি কি তাহ'লে বলতে চান যে, আপনার ঐ ক্যাপিটেলিস্টিক্ আইডিয়া নিয়ে আপনি গদির ওপর ঘুমোবেন আর আমরা নীচে মেঝের ওপর ছট্ফট্ করবো?

—ক্যাপিটেলিস্টিক আইডিয়া শুধু আমার হবে কেন? তোমরাও সেই আইডিয়া নিয়ে উপরে উঠতে চেষ্টা করো। আজই চৌকি এনে গদি পেতে আমার সমান উপরে উঠে এসো। তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আমাকে টেনে নীচে নামিয়ে কি হবে শুনি? তার চেয়ে তোমরা আমার মতো ওপরে শোবার ব্যবস্থা করো।—কি বল সজল? তুমি তো সকলের চেয়ে বেশী লেখাপড়া শিখেছো, তুমিই কথাটা ওদের ভাল করে' বুঝিয়ে বলো। গদি আমি কিছুতেই সরাতে পারি না। ইচ্ছে হয় তোমরা এখানে থাকো আর যাও। তেরো বছর একা ছিলাম এ বাড়ীতে। আজ দু' বছর হ'ল তোমরা এসেছো, তাও অনেক অনুরোধ করে'। এখন বলছো, সমান অধিকার চাই। আগে ক্ষমতা লাভ করো, পরে সমান অধিকারের দাবী জানাবে।

এমন সময় সাইরেন বাজলো। সকলে মিলে তাড়াতাড়ি ললিত-বাবুর গদীর নীচে উপুর হয়ে ঢুকে চুপ করে' শুয়ে পড়লো। ললিত-বাবুও গদীর নীচে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, মৃত্যুধ্বনি অহর্নিশি, এখনও তোমরা সমান অধিকার নিয়ে করছো ঝগড়া। সমান অধিকারের

উপরে দু' একজন থাকা দরকার। বিপদের সময় তার গদির নীচে তবু যেন একটু আশ্রয় মিলে। শেল্‌টার—শেল্‌টার, বুঝলে?

—কে? সজল ঠাকুরপো?—এতদিন পর মনে পড়লো? সেই কবে একদিন এসেছিলে।

—সময় পাই নি বৌদি।

—সংসার নেই যার তার আবার সময়ের অভাব? যখন খুসী আসতে পারো, মুক্ত স্বাধীন জীব তুমি আর আমরা গৃহকোণে বন্দী।

—তাইতো তোমরা নারীর জাত এত সুন্দর, বিশ্ববাঞ্ছিতা। ঘরের মেয়ে পত্রের আবরণে ঢাকা পবিত্র কমলের মতো। বিকশিত তনুগন্ধে পুরুষ আত্মা মুগ্ধ—দেবতার দুয়ারে নির্মল অর্ঘ্য তোমরা। যে মেয়ে গৃহ-আবরণের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে তার দিকে চাইলে মনে হয় পুষ্প যেন বৃন্তহীন। ছিন্ন চ্যুত, সর্ব্ব কমনীয়তা হীন, উচ্ছৃঙ্খল তার মুখের হাসি, উগ্র তার নয়নের চাহনি, চঞ্চল তার চরণের গতি।

—বাইরের মেয়েদের সম্বন্ধে তোমার এতো বিশ্রী ধারণা কেন?

—সুশ্রী ধারণা করতে গিয়ে পদে পদে বাধা পেয়েছি। তাদের ট্রাম বাসে ওঠা-নামার সময় তাদের চিত্তে দেখেছি পুরুষ আত্মার জন্য আকুল বিষাক্ত ক্রন্দন। সারাদিন পর সন্ধ্যাবেলা তারা ঘরে ফিরে গিয়ে দেখে যে, তাদের নারী অঙ্গ যতটা ক্ষত না হয়েছে তার চেয়ে অধিক ক্ষত হয়েছে তাদের নারী মন। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের কাজে তাদের এসেছে অবহেলা, তুচ্ছ তাচ্ছল্য। ঘরের লোকের কাছে তারা হারিয়েছে স্নেহ, প্রীতি, মায়া মমতা। কিন্তু তোমাকে দেখলে বৌদি কি মনে হয় জানো?—মনে হয় তুমি যেন গৃহের অনন্ত ঐশ্বর্য্য, অনন্ত মাধুরী, তোমার চরণ স্পর্শে যেন গৃহের ধূলি হয় সোনা। সোজা কথায় তোমার

এ ঘরখানা দেখলেই বুঝতে পারি—ঘরের নারী কত সুন্দর। কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তোমার ঘরের এ সামান্য আসবাব পত্র। কি মায়াময় তোমার মুখের হাসি। কি স্নিগ্ধ শীতল তোমার নয়নের চাহনি। তোমাকে এবং তোমার এই ঘর-দুয়ার দেখলে মন প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

সিন্ধু এতক্ষণ পর হেসে বললো, ছাই পরিষ্কার আমার ঘর দোর। এ ঘর ছেড়ে দু'দিন পর চলে যাবো অন্য ঘরে। তাই আর ঘর দোর তেমন পরিষ্কার রাখতে ইচ্ছে করে না। ভাড়া দিয়ে থাকি, মাস মাস ভাড়া দিই এইতো সম্বন্ধ। পরের ঘর আর যত্ন করে লাভ কি? একতলা বাড়ী। ও-পাশে বাড়ীওয়ালা নিজে থাকে আর এক পাশে আমরা। ভাড়া দিয়ে থাকি তবু রোজ রোজ তার কত কথা শুনতে হয়। একটু কিছু দোষ ত্রুটী পেলেই অনেক কথা শুনিয়ে গালাগালি করে। টাকা হ'লে ঘরের অভাব? দু' ঘরে মিলে একটা জলের ট্যাঙ্ক—তারাও স্বামী স্ত্রী আর একটি ছেলে; আমরাও স্বামী স্ত্রী আর একটি ছেলে। তবুও তারা বলে আমরা নাকি বেশী জল খরচ করি। আমরা নাকি ট্যাঙ্কটা পরিষ্কার রাখি না। ট্যাঙ্কের চারপাশে নাকি আবর্জনা জমিয়ে রাখি।—আমাকে নোংরা বলবে এমন লোক দুনিয়ায় জন্মে নি। কি করবো, তবু সহ্য করে' থাকি। এত সহ্য করা সত্ত্বেও তারা কাল নোটিশ দিয়েছে ঘর ছেড়ে দিতে। একটা ঘর দেখে দেবে ঠাকুরপো।

সঞ্জয় বললো, সবাই তো ঘর বাড়ী ছেড়ে পালাচ্ছে আর তুমি ঘর দেখতে বলছো?

—কোথায় পালাবো? পালানো মানে তো দেশে চলে যাওয়া। কিন্তু শুনেছি দেশে দুর্ভিক্ষ, লোক না খেয়ে মরছে; না খেয়ে মরার চেয়ে এখানে বোমায় মরা ভালো। তা ছাড়া দেশে নাকি আবার

হিন্দু মুসলমানে মনের মিল নেই, দিনরাত মারামারি লেগেই আছে। এক বিপদ ছেড়ে আর এক বিপদে কে পড়তে চায়? এ-অবস্থায় দেশে যাওয়া যায় না। আচ্ছা ঠাকুরপো, আমাদের দেশে কি ভালো মানুষ নেই? অন্ততঃ একজন হিন্দু আর একজন মুসলমান—যারা এ বিবাদ মিটাতে পারে? এই দুটো বিরাট জাতি বিচ্ছিন্ন হ'লে মহাভারতও যে ভেঙেচুরে শতধা হয়ে যাবে। এই সামান্য কথাটা কোন হিন্দু কোন মুসলমান বোঝে না? গান্ধী জিন্না হাতে হাত মিলাতে পারে না? দেশে গেলে এই এক অশান্তি আবার এখানেও মাথার উপরে হয়তো জাপানী বোমা। যুদ্ধ যুদ্ধ করে' সারা পৃথিবীটা একেবারে ধ্বংসের পথে চলেছে। কোথাও কি শান্তি আছে? মানুষের হয়েছে চারদিক থেকে মরণ। আর মানুষই বা বলি কাকে—সব হয়েছে দস্যু দানব। প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক মানুষের কাছে যেন চির শত্রু। এ শত্রুর রাজ্যে বাস করে' সুখ আছে? পালাবো কোথায়? যেখানে যাবো সেখানেই মানুষ শত্রু।

সজল বললো, তা হ'লে থেকেই যাও। জাপানীর বোমা যদি পড়তে সুরু করে তখন না হয় দেখা যাবে।

—বল কি? সত্যিই বোমা পড়বে?

—ঠিক বলা যায় না, মাথার ওপর নাও পড়তে পারে; তবে পড়বে নিশ্চয়ই। বলে সজল হাসতে লাগলো।

—সিন্ধু একটু ভয় পেয়ে বললো, হাসছো কেন? বিপদ আপদের কথা নিয়ে হাসি তামাসা করতে নেই। জীবনে কোনদিন বোমা দেখি নি, আর কোনদিন দেখিও না যেন। সবে মাত্র একটি ছেলের মা হয়েছি, খোকার দিকে চাইলে আমার মন আকুল আনন্দে ভরে' ওঠে। কাজেই এখন জাপানী বোমায় মরতে চাই না। বেঁচে থাকতে চাই।

সজল বললো, জননী হয়েছো, বেশ ভালো কথা বৌদি। কিন্তু একটা কথা বলে সাবধান করে দিচ্ছি যে, অধিক সন্তানের জননী হ'তে যেওনা, তাহ'লে নিজের জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হারাবে; তার ওপর দেশের রাজশক্তি সেই ছেলেগুলির দিকে শ্যেনদৃষ্টিতে চেয়ে থাকবে। বয়োপ্রাপ্ত হ'লেই তাদের রক্তের প্রয়োজন হবে আর একটা বিরাট সংগ্রামের জন্য। এ রণমত্ত রক্তপিপাসু রাষ্ট্রজগতে নবজাত শিশুদের ভবিষ্যৎ জীবন চালিত হবে রক্তময় সৈনিক বেশে। তাদের বুকের রক্ত দিতে হবে রাষ্ট্রের আদেশে। যে ক'দিন বেঁচে থাকবে—খেতে হবে তাদের কাঁচা মাংস, কাঁচা রক্ত—দিতেও হবে কাঁচা রক্ত রণাঙ্গনে। সেই মানুষের, সেই শিশুর জননীর হয়ে লাভ কি তোমার?

সিন্ধু ভয়-বিহ্বল বুকে নিদ্রিত খোকাকে বুকে তুলে ধরে অধীর আকুল চুম্বনে খোকার মুখে মাতৃ হৃদয়-ধারা ঢেলে দিয়ে বললো, এই সংগ্রামময় পৃথিবী ছাড়া আর কোথাও কোন দেশ নেই ঠাকুরপো?

সজল বললো, বর্ত্তমানে সে দেশ নেই বটে, কিন্তু সে দেশ নিশ্চয়ই নতুন তৈরী হবে। যখন আমরা বর্ত্তমান পৃথিবীর সব লোক মরে যাবো এমনি প্রবল সংগ্রামে, প্রবল দুর্ভিক্ষে, প্রবল বন্যায়, প্রবল মহামারীতে; তখন সে দেশ নতুন সৃষ্টি হবে। সে দেশের প্রত্যেকটি মানুষের ঐশ্বর্য্য থাকবে রাজার মত, সুখ শান্তি থাকবে দেবতার মত। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছে পরিচয় দেবে ত্যাগের, গ্রহণের নয়। দিয়ে আনন্দ, নিয়ে নয়। হিংসা দ্বেষ বিবর্জ্জিত ধরা হবে ধন্য। রাজ্য হবে নগণ্য, শুধু মানুষই হবে গণ্য, মান্য, বাঞ্ছিত, পূজিত—রাজ্যও নয় রাজনীতিও নয়। মানুষই হবে সবার উপরে শ্রেষ্ঠ।

·

সজল ছাত্রীর পড়ার ঘরে ঢুকে দেখে—কেউ নেই। কারণ? মুক্তা পড়ুক বা না পড়ুক এ সময়ে সে এ ঘরে উপস্থিত

থাকে। সজল আজ দেখে ঘরে কেউ নেই। সজল ডাকলো, মুক্তা, পড়তে এসো। কোথায় ?

সামনের বারান্দা থেকে উত্তর এলো—এই যে মাষ্টারমশাই, —এখানে আমি। সজল বারান্দায় গিয়ে দেখে মুক্তা এক সাজি বকুল ফুল নিয়ে মালা গাঁথছে। সজল কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বললো, একটু বসুন। মালা গাঁথা এখুনি হয়ে যাবে। দেখছেন না কি তাড়াতাড়ি গাঁথছি। সুন্দর তাজা সদ্য ফোটা ফুলগুলি; আকুল গন্ধভরা ফুলগুলি দেখে সজলের লোভ হলো। সে একটা ফুল ধরতে গেলো, মুক্তা বাধা দিয়ে বলে উঠলো, ফুল ছোঁবেন না, ফুল ছোঁবেন না।

সজল বাধা পেয়ে বললো, কেন ?

মুক্তা বললো, আপনি স্নান করেছেন ?—স্নান না করে' ফুল ছুঁতে নেই।

—তুমি স্নান করেছো ? তুমি ফুল ছুঁয়েছো যে ?

—আমি মেয়েছেলে, মেয়েদের ফুল ছুঁতে কোন দোষ নেই।

সজল হেসে বললো, বেশ, কিন্তু এ ফুল পেলে কোথায় ? এখানে তো বকুল গাছ নেই ?

—আপনি জানেন না, আমাদের যে বাগান-বাড়ী আছে। আমাদের বাগানে অনেক ফুল; যুঁই, মালতী, পারুল, বকুল, পদ্ম, রজনীগন্ধা আরও কত আছে।

—তোমাদের বাগান-বাড়ী কোথায় ?

—আপনি কিছু জানেন না, কিছু চেনেন না। খিনাংজং চেনেন ? সেখানে আমাদের বাগান। রেলওয়ে ব্রীজ পার হয়ে গেলেই প্রকাণ্ড মাঠ, মাঠের ওপর দিয়ে মোটর চলার রাস্তা আছে। দু'দিকে সবুজ ধানের মাঠ, বহুদূর পর্য্যন্ত, কি চমৎকার! আচ্ছা, চাষাদের এত ধান, তবে ওরা পেট ভরে' খেতে পায় না কেন ?

—ওরা কি খেতে পায়, খাই আমরা। যে ভাত খেয়ে তোমরা আমরা সবাই বাঁচি।

মুক্তা বললো, না, আমরা সেই ধানের ভাত খাই না; বড়বাজারে আমাদের চালের গুদাম আছে। সেখান থেকে বাবা চাল আনেন, আমরা সে চাল খাই।

—ঐ মাঠের ধানই চাল হয়ে তোমাদের গুদামে আসে।

—তবে ঐ ধানক্ষেতগুলি কি আমাদের ?

—না, চাষাদের।

—ওদের ধান আমাদের গুদামে কেন ?

—তোমার বাবা বড়লোক। বড়লোক যারা তারা সবাই কৃষকদের ঠকিয়ে সোনার ধান সোনার দামে না কিনে অতি অল্প দামে কিনে বেশী দামে বিক্রী করে। তোমার বাবা এমনি করেই এত বড়লোক হয়েছেন, বুঝলে ?

মুক্তা যেন সত্য সত্যই মলিন হয়ে উঠলো। কি যেন একটা বেদনা তার চোখের চাহনিতে ভেসে উঠলো। বললো, বাবা তাহ'লে ভয়ানক অন্যায় করেন ?

—থাক, সেকথা তুমি এখন বুঝবে না; বড় হ'লে বুঝতে চেষ্টা করবে। এখন পড়বে চলো।

—কেন আমি বেশ বড় হয়েছি। এগারো পার হয়ে বারোতে পড়েছি। গরীব চাষীদের ঠকিয়ে আমার বাবার এত টাকা হয়েছে কেন বুঝবো না, বেশ বুঝি। আপনি বলুন, বাবা আর কি কি অন্যায় কাজ করেন ?

—না, আর কোন অপরাধ তাঁর নেই। গরীবের ধনে তিনি ধনী —এই মাত্র অপরাধ।

—এই সব খাটপালঙ্ক, চেয়ার টেবিল, মাছের টাক এই সবই কি গরীব চাষীদের ঠকিয়ে ?

সজল মুক্তার গলার হার দেখিয়ে বললো, এই মুক্তার হার তাদেরো হ'তে পারতো। কিন্তু আজ তারা সর্ব্বহারা।

বারো বৎসরের মুক্তা। কচি মন, কচি প্রাণ। এ প্রাণে যে বীজ ছড়ানো যায় সে বীজই দিন দিন নানা ফুলে ফলে, রসে গন্ধে অঙ্কুরিত হ'তে থাকে। সজলের এ কথাগুলি মুক্তার মনেও অজানা ভবিষ্যতের জন্য কি এক বীজ রোপন ক'রে রাখলো।

সজল বললো, আজ তাহ'লে আর পড়বে না, শুধু মালাই গাঁথবে? এতগুলি ফুল কতক্ষণে গাঁথবে? রেখে দাও, পড়তে চলো।

মুক্তার এক সূতো মালা গাঁথা হয়ে গেছে, আর এক সূতোর অর্দ্ধেক প্রায় শেষ হয়েছে সে। বললো, থাক, আর গাঁথবো না। আপনি মাথাটা একটু নুইয়ে দিন তো? আপনার গলায় এ মালাটা পরিয়ে দিই।

—ছিঃ, একথা বলতে নেই মুক্তা, আমার গলায় মালা দেবে কেন?

—বা! আপনি যে মাষ্টারমশায়, আমার শিক্ষক।

—তা হোক্, কিন্তু তোমার হাতের মালা যে দেবতার যোগ্য। ওই যে পরমহংসদেবের ছবি রয়েছে মালাটা ওই ছবিতে পরিয়ে দিয়ে প্রণাম করো।

মুক্তা ঠাকুর রামকৃষ্ণের ছবিতে মালা পরিয়ে সভক্তি চিত্তে প্রণাম করে' এসে পড়তে বস্‌লো। তারপর বললো, এখন থেকে আপনি যা বল্‌বেন তাই শুনবো।

—বেশ, লক্ষ্মী মেয়ে। এবার থেকে মনোযোগ দিয়ে পড়বে তাহ'লে, কেমন? এখন তা'হ'লে পড়া সুরু করো।

মুক্তা এবার তাড়াতাড়ি সুটকেশ থেকে বই বা'র করে' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গল্পটা নির্ভুল ও অনর্গল পড়ে ফেল্‌লো। খানিকক্ষন পরে বল্‌লো, আজ এই অবধিই থাক্, কাল বানানগুলো সব ঠিক কর্‌বো।—

যদি না পারি তবে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকবো।—এই বলে' বুড়ো এক টুকরো হাসি আন্‌লো মুখে।

সজলও স্মিতহাস্যে বল্‌লো, এক মিনিটের মধ্যে অত লক্ষ্মী হয়ে গেলে। যাক্, পড়ায় না পারলেও তোমাকে এক পায়ে দাঁড়াতে হবে না।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মেসে কেউ নেই, শুধু সাম্বলা রান্না করছে। সজল মেসে একা আর সব বেরিয়ে গেছে। ব্ল্যাক্ আউটের রাত—এ অন্ধকারে বেরুতে ইচ্ছে করে না। বিশ্বময় যুদ্ধ, বিশ্বময় অন্ধকার—আলো যেন পৃথিবী থেকে নিভে গেছে। সজল ছাদে উঠে গেলো। ছাদেই একটু বেড়ানো যাক্। পাশাপাশি মেস ও বাসা। ছাদে ওঠবারও একই সিঁড়ি। সজল ছাদে উঠে দেখে পাখীও ছাদের ওপর একা একা পায়চারি করছে। সজলের ইচ্ছে হ'লো নীচে নেমে যায়। কী যেন একটা গোপন লজ্জা এসে তাকে লজ্জিত করে' তুল্‌লো। সত্য সত্যই সে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতে পাখী ডেকে বল্‌লো, কে? সজলদা? একি নেমে যাচ্ছেন কেন? আসুন না, ছাদে বেশ হাওয়া আছে।

সজল আবার উঠে এলো। বল্‌লো, রাস্তায় একা একা বেড়াতে ভালো লাগে না, তাই ওপরে এলাম।

—আমার কিন্তু একা একা থাকতেই ভালো লাগে। বিশেষ করে' মনের মধ্যে যখন অনেক কথা এসে ভিড় করে।

সজল একটু হাসির রেখা টেনে বল্‌লো, গোপন কথা নিশ্চয়ই। মনের যা কিছু গোপন—ধরো, গোপন কথা, গোপন ব্যথা—সব কিছু গোপন বিষয়ই বোধ হয় মনটাকে নিয়ে যায় নির্জন স্থানে। নয় কি? তাই এই নির্জন ছাদে এসেছো?

পাখী হেসে বল্‌লো, গোপন কথা আর গোপন ব্যথা—এ দুটোর একটাও আমার নেই। তবে অনেক কথা আছে যা ভাববার জন্য একটু নির্জ্জনতা দরকার।

—কি কথা, শুনতে পারি কি?

—নিশ্চয়ই। আমার মনটা আকাশের তারার মতো নির্ম্মল, উজ্জ্বল; অন্ধকারের কোন বাধা বন্ধ নেই। দূর থেকেও স্পষ্ট দেখা যায়, বুঝা যায়।

—কিন্তু কাছে থেকেই মনের কথাগুলো শুনতে চাই, আপত্তি আছে কিছু?

—না, আপত্তি কিছু নেই। আজ ক'দিন ধরে' ভাবছি কলেজ থেকে নামটা কাটিয়ে দিই, বি. এ. পাশ করে' কি হবে?—বি. এ. পাশ করা মেয়ে বাংলা দেশে বি. এ. পাশ করা স্বামী পাচ্ছে না। যুদ্ধের বাজারে ম্যাট্রিক পাশ-না-করা ছেলেরাই হঠাৎ বড় বড় চাকরী পেয়ে বড় বড় পাশওয়ালা মেয়েগুলোকে বিয়ে করে' ফেলছে, এ আমার অসহ্য! তা' ছাড়া বাবার গত বছরই গেছে রিটায়ার করবার টাইম, শুধু আমার জন্যই রিটায়ার্ড হচ্ছেন না। তিনি বলেন, তোর পরীক্ষা হয়ে গেলেই রিটায়ার করবো। দরকার কি আমার বি. এ. পাশ করে? জাপান যুদ্ধে নামবেই এবং রেঙ্গুন শহরেও বোমা পড়বে, তখন হয় তো বাবা আমাকে নিয়ে বিপদে পড়বেন। তার চেয়ে সময় থাকতে দেশে সরে' পড়া ভালো নয় কি?

সমর বল্‌লো, এই তোমার মনের গোপন কথা? বোমার ভয় করছো? বোমা পড়বে টার্গেট লক্ষ্য করে'—তোমার ভয় কি?

—আমিও হয় তো কারো টার্গেট হয়ে যেতে পারি, হয় তো এর মধ্যেই হয়ে গেছি। বলা যায় না—কার মনের কি গোপন উদ্দেশ্য? বলেই পাখী একটু হাসলো। তারপর আবার বল্‌লো, কিন্তু সে কথা

হচ্ছে না—নিজের এই দেহ কারো টার্গেট্ হোক্ বা নাই হোক্ সেজন্য ভাব্ছি না ; ভাবছি বাবার জন্য। বুড়ো মানুষ, বিপদের সমুখে পড়া ঠিক নয়, দেশে চলে যাওয়াই ভালো। কিন্তু বাবা সে-কথা মোটেই শুনছেন না। তিনি বলেন, বোমা আবার পড়বে নাকি! আমাদের ব্রিটিশ-বাহিনীর কাছে দাঁড়াতে পারে এমন কোন যোদ্ধা জাত এ বিশ্বে নেই। তা' ছাড়া এখন রিটায়ারও করতে দেবে না। যুদ্ধের সময় লোকের দরকার হবে। সজলদা, এবার আপনি একটা অ্যাপ্লাই করে' যুদ্ধের চাকরী নিন না, সহজেই মেজর ক্যাপ্টেন হয়ে যাবেন।

সজল হেসে বল্লো, এতো ছোট চাকরী নিয়ে জাপানী মেরে লাভ কি? একেবারে চীফ কম্যাণ্ডারের পদে নিযুক্ত করলে না-হয় অ্যাপ্লাই করতাম।

পাখী বল্লো, ওরে বাবা! বীর পুরুষের কথা শোন! একটা মেয়ের সঙ্গে দু'দণ্ড নির্জ্জনে দাঁড়িয়ে কথা বল্বার সাহস নেই, ভয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে যেতে চায় তিনি হবেন আবার একটা রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডার!

সজল বল্লো, বোমার চেয়েও যে মেয়েরা ভীষণ ভয়াবহ। কম্যাণ্ডার সেজে বোমার সমুখে দাঁড়ানো সহজ কিন্তু নির্জ্জন কোণে একটি মেয়ের কাছে দাঁড়ানো একশো কম্যাণ্ডারেরও কাজ নয়।

পাখী বল্লো, সত্যিই কি তাই! সত্যি সত্যিই যদি পুরুষেরা মেয়েদের ভয় করে চল্তো, সম্মান করতে জানতো, সম্ভ্রমে মেয়েদের কাছে দাঁড়িয়ে নতশিরে কথা বলতে শিখতো তবে এই পৃথিবীটা হ'তো একটা শান্তির স্থান। ধরা হ'তে মুছে যেতো যুদ্ধ কলহ ; মানব মানবে হ'তো শুধু মিলনের পরিচয়। কিন্তু পুরুষের দরবারে মেয়েরা আজ লাঞ্ছিতা, পীড়িতা, বিক্রীতা—তাদের দেহ নিয়ে চলছে ছিনিমিনি খেলা।

সজল একটু গম্ভীর হয়ে বল্লো, এ-কথা আমি বিশ্বাস করছে

পারছি না—অন্ততঃ ভারতের নারী চিরদিনই পুরুষের কাছে ভক্তি, সম্মান আর পূজা পেয়ে আসছে।

—কিন্তু সে ভারত আজ আর নেই। সে চিরন্তন সত্য সুন্দর শক্তিশালী ভারতের কথা আজ আর তুলবেন না—ভারত আজ অন্তহীন দুর্বলতায় উঠছে বসছে। ভারতের নারী আজ পণ্যের দরে বিক্রী হচ্ছে। সংগ্রাম-মত্ত পৃথিবীর বুকে নারীর স্থান আজ সৈন্ত-শিবিরে। লক্ষ লক্ষ বিদেশী সৈন্তের উচ্ছৃঙ্খল কামতপ্ত বুকে আজ শত শত নারী চোখের জলে ভাসছে। সৈন্তের রেশন রূপে আজ বিক্রী হচ্ছে দেশ বিদেশের নারী-দেহ। ধ্বংসের পৃথিবীতে নারীই হচ্ছে সকলের আগে ধ্বংস। সৃষ্টিকে রক্ষা করবে কে?

সজল বললো, তোমার মতো নিষ্কলঙ্ক পবিত্র ভারত নারী যার দু'টী নয়নের দৃষ্টিতে অনন্ত উদার আকাশ, আদি সৃষ্টির জীবন্ত নির্মল আলো, যার বুকে অনন্ত সুধা-সমুদ্র, তোমরাই করবে সৃষ্টিরক্ষা; তোমরাই ধ্বংসের পৃথিবীতে ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে গড়ে' তুলবে নতুন পৃথিবী, নতুন মানুষ।

পাখী হেসে বললো, এ কথার পর আপনাকে পুরস্কার না দিয়ে পারছি না।

—কি পুরস্কার?

—খোঁপার ফুল। বলে' পাখী নিজের খোঁপায় পরা শ্বেত পদ্মটি তুলে এনে সজলকে দিলো।

সজল ফুলটা নাকের কাছে তুলে ধরে বললো, একি আমায় অর্ঘ্য দিলে নাকি?

—হ্যাঁ, বাঞ্ছিত হৃদয়ের সুরভিত পূজার অর্ঘ্য।

সজল পদ্মটা ছিঁড়ে দু'ভাগ করে' আধখানা পাখীর খোঁপায় গুঁজে দিলো।

পাখী বল্‌লো, ছিঃ, একি করছেন? এমন সুন্দর ফুলটা ছিঁড়ে ফেলে সুন্দরের অযোগ্য করে' ফেল্‌লেন যে? ওটা যে সুন্দরেরই যোগ্য।

—যতক্ষণ পাশে কোন সুন্দরীর পরিচয় না থাকে ততক্ষণ ও ফুলের কোন মর্য্যাদা নেই।

পাখীর মুখখানা চাপল্যের হাসিতে ভরে' উঠ্‌লো। বল্‌লো, সত্যি!

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সত্যি নয় তো কি! এই পৃথিবীটা পুরুষ আর প্রকৃতির পরস্পর আত্ম-বিনিময়েই এতো সুন্দর। একের সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করবার জন্য অপরের প্রয়োজন, নয়তো সুন্দরকে সার্থকমণ্ডিত করবে কে?

পাখী একটু হেসে বল্‌লো, বাব্বা, অতো বড়ো তাত্ত্বিক দৃষ্টির গভীরতা আমার নেই, একটু সহজ করে'ই বলুন না।

সজলও হেসে বল্‌লো, সহজ করে' বুঝতে হ'লে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই বুঝতে চেষ্টা করো, আজ থাক্‌। এই বলে' সজল সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালো। পাখীও সঙ্গে সঙ্গে নেমে গেলো।

সজল ছাদ থেকে নেমে এসে সারদাকে ডেকে বল্‌লো, বাজারের হিসেবটা দিয়ে'যা, ওটা লিখে ফেলি। কি কি এনেছিস্ বল?

সারদা একটা কাগজের পুঁটুলি সজলের কাছে রেখে বল্‌লো, এই নিন্ হিসেব।

সজল অবাক্ দৃষ্টিতে সারদার দিকে চেয়ে বল্‌লো, কাগজের পুরিয়া নিয়ে কি হবে? চাইছি বাজারের হিসেব, তাই দে।

—তাই তো দিলুম বাবু, খুলে' দেখুন না। এর ভেতরেই সব আছে।

সজল পুরিয়াটা খুলে' আরো অবাক্ হয়ে গেলো। বল্‌লো, এসব তরকারীর টুকরো কিসের?—কুমড়ো, লাউ, বেগুন, ডাঁটা, পিঁয়াজ, মাছের আঁশ; এ সব কি?

—এই তো হিসেব বাবু, আমার সব মনে থাকে না ছাই। সেই কোন্ সকালে বাজার করি বিকেল পর্যান্ত কি সব মনে থাকে বাবু। তাই যা যা এনেছি তার একটু একটু নমুনা রেখে দিয়েছি। আপনি লিখুন, আমি বলে বলে যাই। বলে' সারদা কাগজের ভিতর থেকে তরকারীর টুকরোগুলি বার করে' সজলের সামনে রেখে বল্লো, লিখুন, আমি বলছি।

সজল হেসে বল্লো, এই তোর বুদ্ধি! সকাল বেলা বাজার করে' এ বেলাতেই ভুলে মেরে দিয়েছিস। বল হতভাগা, বল।

সারদা একটা কুমড়োর টুকরো দেখিয়ে বল্লো, লিখুন—কুমড়ো এক আনা।

সজল লিখলো, কুমড়ো এক আনা।

সারদা লাউয়ের টুকরো নিয়ে বল্লো, লাউ চার আনা।

—লাউ চার আনা।

ডাঁটার টুকরো ধরে' বল্লো, ডাঁটা ছ' পয়সা।

—ডাঁটা ছ' পয়সা।

সারদা এমনি করে'ই সজলকে সমস্ত হিসাব লিখিয়ে দিলো।

সজল বললো, মোট তাহ'লে খরচ হয়েছে তোর তিন টাকা এগারো পয়সা। তোকে দিয়েছিলাম চার টাকা। বাকী পয়সা কত আছে দেখি?

সারদা কোঁচার গিঁঠ খুলে বাকী পয়সা সজলের সমুখে ছড়িয়ে দিলো। তারপর সেগুলো এক আনা, দু' আনা করে' গুণে বল্লো, তেরো আনা এক পয়সা আছে বাবু।

সজল হেসে বল্লো, ঠিক আছে, যা, হিসেব মিলে গেছে।

সারদা হেসে বল্লো, মাথা থেকে একটা বোঝা নামলো বাবু। হিসেব জিনিষটা আমি মোটেই বুঝি না।

আজ সজলের সিন্ধু বৌদির বাসায় খাওয়ার কথা। মেসের খাওয়া একেবারে একঘেয়ে হয়ে গেছে। ভাত আর মুখে তুলতে ইচ্ছে করে না। মাঝে মাঝে এমনি কেউ খেতে বললে সেদিন বেশ পেট ভরে' খাওয়া যায়। মুখ বদ্‌লানো হয় এবং রুচিরও পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু এই সুদূর প্রবাসে রোজ রোজ নিমন্ত্রণ করে' কে খাওয়াবে? তার আত্মীয়স্বজনও এখানে কেউ নেই যে, আদর-যত্ন করে' নিমন্ত্রণ করবে। একমাত্র সিন্ধু বৌদি পাশাপাশি গ্রামের মানুষ, এই দূর-প্রবাসে তারাই এখন নিতান্ত আপনার জন; আত্মীয়ের চেয়েও বেশী। সজল আজ সেখানে যেতেই সিন্ধু বৌদি বল্‌লো, ঠাকুরপো, তোমার আর সময় হয় না, সেই কোন সময় রান্না করে' বসে আছি, বেলা বাজলো একটা, তোমার আর দেখা নেই। ভুলে গিয়েছিলে নিশ্চয়ই!

—তোমার নিমন্ত্রণ কি ভোলবার কথা বৌদি!

—থাক্ থাক্, ঢের হয়েছে। যাও, এখন স্নানটা সেরে এসো দেখি, বেলা অনেক হয়েছে। বলেই সিন্ধু বৌদি তাড়াতাড়ি তেলের শিশিটা এনে সজলের হাতে দিলো।

—একি বৌদি, এ যে সর্ষের তেল—এতে যে মাথা জ্বালা করবে। কোন সুগন্ধি তেল টেল নেই?

সিন্ধু বল্‌লো, এককালে সবই ছিলো ঠাকুরপো। এখন ছেলের মা হয়ে বুড়ী হ'তে চল্‌লাম, এখন কি আর ও-সব ভালো লাগে। সে একদিন ছিলো যখন সুগন্ধি দামী তেল, স্নো, পাউডার ছাড়া চলতে পারি নি। আর তা'ছাড়া কত দামী দামী মিহি শাড়ী ব্লাউজ পরে' বাইরে বাইরে কত জায়গায় যে বেড়িয়েছি তার ঠিক নেই। কিন্তু তোমার দাদার একদিনের একটি মাত্র কথায় সব ছেড়ে দিয়েছি। সে কি বলে জানো?—বলে বর্ত্তমান কালের মেয়েরা দু' জগতের—ঘরের আর বাইরের।

সজল একটু হেসে বললো, যথা—?

—যথা, নারী ঘরে আসল রূপে বিরাজ করে—যে রূপে তার ফুটে ওঠে শান্ত স্নিগ্ধ হৃদয়ের কোমল বৃত্তির প্রকৃত পরিচয়। কিন্তু যখন সে বাইরে পাঁচজনের প্রকাশ্যে বা'র হয় তখন নানা প্রসাধনে সাজে রূপসী। সর্বাঙ্গে জ্বলে তার কৃত্রিম রূপের আগুন, সে আগুনে জ্বালাতে চায় তৃষ্ণার্ত পুরুষের হৃদয়।

সজল মাথায় তেল দিতে দিতেই বললো, এর পর থেকেই বুঝি সব প্রসাধন ছেড়ে দিয়েছেন?

সিন্ধু বললো, প্রসাধন তো ছেড়েছিই তার সঙ্গে বাইরে বেরুনাও বন্ধ করেছি। কি জানো ঠাকুরপো, এবার ঠিক করেছি, ট্রাম বাসের লোকগুলো ভদ্র না হওয়া পর্যন্ত আর বাইরে যাবো না।

সজল একটু বিস্মিত হয়ে বললো, তার মানে?

সিন্ধু বললো, সে এক লজ্জার কথা। সেদিন আমি একা, তোমার দাদা সঙ্গে ছিলো না। তখন খোকা হয়নি—হবার লক্ষণ মাত্র আমার দেহ লাবণ্যে ধরা পড়েছে। এ-সময়েই নাকি আমার রূপ যৌবন তোমার দাদার মতে খুব ভয়াবহের কারণ হয়ে উঠেছিলো। আমার গা থেকে নাকি একটা আগুনের জ্যোতিঃ বেরুতো। সেই জ্যোতিঃ দেখে তোমার দাদা ঠাট্টা করে' কবিতার ছন্দ মিলিয়ে বলতো,—'তব এ অনল কোথা হ'তে পেলে দেবী বল—' আমিও ছাড়বার পাত্রী নই, তার এই কথা শুনে খুশী হয়ে রাগের ভাণ করে বলতাম, আমার এই দেহের অনল, খোকার অঙ্গে ঝলমল করবে। আমার কথাতেও তখন কাব্যের ছোঁয়াচ ছিলো—আমি তো আর একেবারে নিরক্ষরা নই গো—ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়ার পর তো আমার বিয়ে হ'লো। লেখাপড়া যা শিখেছি, তাতে ও-রকম দু'টো চারটে কাব্যের ছড়া আমিও লিখতে বলতে পারতুম। এখন অবশ্য সব ভুলে যাচ্ছি। কিন্তু যাক্ সে-কথা,

কি বল্‌তে কি বলে যাচ্ছি। তোমার দাদা সঙ্গে নেই—ট্রামে উঠে রেঙ্গুন থেকে কালা বস্তি যাচ্ছি। সন্ধ্যে হয়ে গেছে—ট্রামের যে সীট্‌টায় গিয়ে বসে'ছি, ঠিক তার পিছনের সীটটায় আর একজন ভদ্রলোক বসেছেন। অবশ্য তার আচার ব্যবহারে তাকে ভদ্রলোক বলা যায় না, অত্যন্ত অসভ্য, লোকটার বয়স বেশী নয়—হঠাৎ দেখি কিনা লোকটা ইতরের মতো আমার পিঠের আঁচলটা ধরে' আস্তে আস্তে টানছে। আমি তো ভয়ে এতোটুকু হয়ে গেলাম। আবার একটু সাহস নিয়ে ভাবলাম, পা থেকে স্যাণ্ডেলটা খুলে' এক ঘা বসিয়ে দিই, কিন্তু লজ্জা এসে এমন বাধা দিলো যে ট্রাম ভর্ত্তি লোকের সমুখে তা আর পারলাম না। কিন্তু লোকটা ক্রমশঃই অসভ্যতার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে দেখে পিছনে তাকিয়ে তাকে এক ধমক্ লাগিয়ে বল্‌লাম, এ কি! লোকটা নিতান্ত নির্লজ্জের মতো বলে ফেল্‌লো—মন পরীক্ষা করছি, আপনার এই আধুনিক সাজ-পোষাক দেখে একেবারে চার্ম্‌ড্ হয়ে গেছি। তখন সহসা তোমার দাদার কথা মনে পড়লো—তার কথা তো মিথ্যা নয়, পুরুষ জাতটা মেয়েদের সূক্ষ্ম মিহি সৌখিন অঙ্গ-আবরণের মোহেই পড়ে বেশী। সত্যই সেদিন আমার পরণে ছিলো একখানা অতি মিহি তাঁতের মেঘছায়া সাড়ী। যাক্, তারপর তাড়াতাড়ি ট্রাম থেকে নেমে একটা রিক্সা করে' চলে এলাম। রিক্সাওয়ালাটা কিন্তু অচঞ্চল চিত্তে আমায় বাড়ী পৌঁছিয়ে গেলো। ভাড়া দেবার সময় মা বলে সম্বোধন করে' আরও এক আনা বখ্‌শিষ চাইলো। আমি খুশী হ'য়ে তাকে দু' আনা বখশিষ দিলাম। ভাবলাম—সভ্য কে? —রিক্সাওয়ালা, না ট্রামের ঐ শিক্ষিত ভদ্রলোক? যাক্—অনেক কথা বলে' ফেল্‌লাম ঠাকুরপো, এখন স্নান করে এসো, বেলা অনেক হয়েছে।

সজল গামছাখানা হাতে করে' স্নান করতে গেলো।

—রেলের গার্ডদের কি খাওয়া-দাওয়ার সময় আছে ঠাকুরপো, হয়তো বেলা তিনটের সময় এসে হাজির হবেন। আর আজ এ ক'দিন যাবত তাঁর মনটাও অত্যন্ত খারাপ যাচ্ছে। আমাকে নিয়েই নাকি তাঁর যতো দুর্ভাবনা। তুমি কিন্তু বেশ আছো ঠাকুরপো, বিয়ে-থা করোনি, কোনো ঝামেলাই তোমাকে বইতে হয় না। পুরুষের কাছে স্ত্রী এক বড় জ্বালা!

এমন সময় ফণিবাবু এসে উপস্থিত হ'লেন। পোষাক খুলতে খুলতে তিনি সজলকে বললেন, কিরে সজল, কখন এলি? ভালো আছিস্ তো? তোকে তো আর খুঁজেই পাওয়া না, কোথায় যে মাঝে মাঝে ডুব মারিস! যাক্, এসেছিস ভালোই করেছিস। একটা কাজ করতে পারবি সজল?

—কি কাজ দাদা?

—তোর বৌদিকে নিয়ে তুই দেশে চলে যা। যুদ্ধ বোধ হয় লাগবেই। আজকের কাগজের হেডিংগুলো বড় খারাপ। এখন শীগগির সরে' পড়াই দরকার। আমি তো আর চাকরী ছেড়ে যেতে চাইলেও যেতে পারবো না। তোর বৌদিকে যে ভাবেই হোক দেশে পাঠিয়ে দেবো।

সজল বললো, সে কথা তো আপনাকে অনেকবার বলেছি যে, সময় থাকতে বৌদিকে বাড়ী পাঠিয়ে দিন।

শিপ্রা বাধা দিয়ে বললো, তুমি চাকরী ছেড়ে যেতে পারবে না বলছো, আমিই বা তোমায় ছেড়ে যাই কি করে? তোমাকে ফেলে আমি কিছুতেই যাবো না। যেতে হয় দু'জনেই যাবো।

ফণিবাবু বিরক্তির সুরে বললো, কথা বোঝ না কেন? তোমাকে এখানে থাকবার দরকার দেখছি না কিছু। আমি একটা মেসে গিয়ে উঠবো, খাওয়াদাওয়ার কোন অসুবিধা হবে না। তাই বলছি, দেশে

যাও, একটা বিপদ ঘটলে কে তোমায় দেখবে? আমি থাকি লাইনে লাইনে—দু' তিন দিন পরে হয়তো একদিন আসবো, এর মধ্যে হয়তো অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে। হয়তো এসে দেখবো তুমি নেই, খোকা নেই; এমন কি ঘরদোরের চিহ্নমাত্রও নেই। বোমা কি একটা সামান্ত জিনিষ মনে করো। যেখানে পড়ে সেখানে পুকুর হয়ে যায়!

—পুকুর হোক বা সাগর হোক, তোমাকে একা ফেলে আমি কিছুতেই যাবো না। মরতে হয় এক সঙ্গেই মরবো।

ফণিবাবু সজলের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন, তারপর বল্লেন, শোন্ তোর বৌদির কথা—আমাকে ফেলে উনি কিছুতেই যাবেন না—একেবারে সতী সাবিত্রী! থাকো, মরতে চাও মরো। ওই কচি বাচ্চাটার জন্তই যত ভাবনা। সত্যিই সজল, খোকাটার জন্ত বড্ড মায়া লাগে! আমার বারো আনা মন খোকার জন্তেই পড়ে থাকে। লাইনে ডিউটীতে যখন যাই, তখন হাজারবার খোকার কথাই আমার মনে পড়ে। আগে কিন্তু এমন হ'তো না। তখন তোর বৌদিকেই বার বার মনে পড়তো। বলেই ফণিবাবু একটু হেসে ফেললেন। তারপর একটু থেমে বললেন, যাক্ সে কথা—তোর বৌদি যখন দেশে যাবেই না—এখানেই না-হয় কিছুদিন থাক। দেখা যাক্ কি হয়। তুই কিন্তু খবর নিবি সব সময়। আমি বাইরে বাইরে ঘুরি, দ্বিতীয় লোক নেই যে খবর নেবে।

—আচ্ছা দাদা, তাই হবে। বলে সজল বেরিয়ে গেলো।

মেসে ফিরে এলো সজল। এসেই দেখে জীবন একাগ্র মনে একখানা সবুজ রঙের কাগজে লেখা চিঠি পড়ছে। সজল চিঠিটা দেখেই হেসে বল্লো, কিহে, সেই চিঠিটার জবাব পেয়েছো বুঝি?

জীবন চিঠিখানা পড়তেই বল্লো, হ্যাঁ।

—দেখতে পারি ?

—অনায়াসে। বউ ভয়ানক ক্ষেপে গেছে। পড়ে দেখুন সজলদা।

এই বলে জীবন চিঠিটা সজলের হাতে দিলো। সজল পড়তে লাগলো :

ওগো হৃদয়ের প্রিয়তম,

এতো দূরদেশে থেকে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে তুমি কোন বর্মী মেয়ের প্রেমে পড়েছো। নইলে নিজের স্ত্রী সম্বন্ধে এতো উদাসীন আর নির্লিপ্ত কেন ? আমার সখ করে' কবিতার চিঠি লিখে আমার দেহ-সৌন্দর্যের বর্ণনা করা হয়েছে। সেদিন যখন আমি ঘুমিয়েছিলাম তখন আমার বুকের আঁচলটা একটু সরে' গিয়েছিলো। আমার সেই বুক দেখে তোমার স্বর্গের কথা মনে পড়লো নিমিষের মধ্যে দেবাত্মা লাভ করে'। একেবারে নিষ্কলঙ্ক সন্ন্যাসী মন নিয়ে সসম্ভ্রমে দূরে দাঁড়িয়ে আমার নগ্ন বুকের কমল কোরক দু'টিকে নতশিরে পূজা করলে তুমি ! আশ্চর্য ! স্ত্রীর অঙ্গ-সৌন্দর্যের প্রতি তোমার এতো ভক্তিশ্রদ্ধা দেখে আমার ভীষণ ভয় হচ্ছে। অত বড় নিষ্কাম প্রেমের কল্পনা এমন দুরন্ত যৌবন-বয়সী স্ত্রীকে নিয়ে করো না—আমার এই যৌবন রক্ত-প্রভাতের প্রতিটি শিরা-উপশিরা একটি শিশুর জন্য দিবারাত্রি হাহাকার করছে। আমার এ নারীপ্রাণ মাতৃত্বের গৌরবে গরবিনী হ'তে চায়। আমার বুকের তৃষার্ত বেদনা তোমারই তরুণ তীরে মূর্চ্ছিত হচ্ছে। এ-কথা সত্যি জেনো প্রিয়তম, আমার এ যৌবন তোমার নিস্পৃহতায় অবহেলিত হবার নয়—তাকে সঠিক সময়ে ভোগ করতে না-পারার বেদনা একদিন হয়তো তোমাকে আঘাত করবে। আমার মিনতি—বাড়ী এসো. ভালো আছি। প্রীতিচুম্বন নাও। ইতি—

তোমারই নীলু

সজল চিঠিখানা জীবনের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললে, তুমি না বলেছিলে তোমার স্ত্রীর মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা নেই। বলেছিলে, স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম হবে নিষ্কাম, পবিত্র, কামনার গন্ধলেশহীন।

জীবন বললো, ভেবেছিলাম তাই।

সজল বললো, আর কিছু ভাববার দরকার নেই ভাই, এখন কাল-বিলম্ব না করে' একখানা দেশের টিকিট কাটো, বুঝলে ?

জীবন একটু চিন্তিত হয়ে বল্‌লো, কিন্তু সজলদা, এখন গেলে যে প্রায় হাজার দশেক টাকা একেবারে মাঠে মারা যায়। গুদামে এখনো বহুত টাকার কাঠ মজুত রয়েছে—এ গুলোর একটা ছিল্লে না করে' যাই কি করে'? আর জাহাজও পাচ্ছি না যে, তাতে বুক করবো।

—এ রকম চিঠির কাছে তোমার দশ হাজার টাকা তুচ্ছ হে জীবন, ও-সব না ভেবে কালই তুমি বাড়ী যাবার ব্যবস্থা করো।

জীবন পরদিনই জাহাজে উঠলো।

শরতের শান্ত শুভ্র উষার মতো মুক্তা আজ সজলের সমুখে এসে দাঁড়ালো। পরণে তার কারুকার্য্যশোভিত নীল শাড়ী। তার আঁচল আর পাড়ে ফুল আর নক্ষত্রের দ্যুতি ঝলমল করছে। কাণে তার মুক্তার দুল, হেমকান্তি কণ্ঠে দুল্‌ছে মুক্তার মালা। অপূর্ব্ব মানিয়েছে আজ মুক্তাকে। সজল মুগ্ধ হ'লো তার এই প্রসাধন-পারিপাট্যে। আজ সে দুরন্ত মুক্তাকে দেখতে পেলো শান্ত রূপে। আজ সে ধীর, স্থির, নম্র ও লাজনতা। সজলের মন বিস্ময়-পুলকে ভরে' উঠলো। মুক্তা পড়তে বস্‌লো। বললো, আজ বানান আর মানেগুলো মুখস্থ করে' ফেলেছি মাষ্টারমশায়, একবার ধরুন না।

সজল প্রত্যেকটি প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর পেয়ে খুশী হ'লো।

মুক্তা বইগুলো গুছিয়ে রেখে একখানা খাতা বা'র করে' বল্‌লো, হাতরাইটিং দেখুন।

সজল হাতের লেখা দেখে খুসী হ'লো। বল্‌লো, তোমার গলার মুক্তার মতো হয়েছে লেখাগুলি।

মুক্তা ভয়চকিত কণ্ঠে বল্‌লো, ওকথা বল্‌বেন না মাষ্টারমশায়, ওকথা বল্‌লে আমার বড্ড ভয় হয়। এই হারটার দিকে চাইলেই ভয়ে আমার গা শিউরে' ওঠে।

—ভয় হচ্ছে! কেন! সজলের কণ্ঠে বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠলো।

—আজ শেষ রাত্রে একটা ভীষণ দুঃস্বপ্ন দেখেছি মাষ্টারমশায়। দেখেছি—আমাদের এ বাড়ীটার ওপর বোমা পড়েছে সমস্ত বাড়ীঘর ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। আমাদের এই বহুমূল্য আসবাবপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আমার এই মুক্তার হারটা ছিঁড়ে পড়ে গেছে। দেখলাম—লক্ষ লক্ষ ক্ষুধিত চাষী মজুর সেই হারের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে চীৎকার করছে। বলছে: ওটা আমাদের, আমাদের রক্ত আর জীবন দিয়েই ওই হার তৈরী হয়েছে। মাষ্টারমশায়, এই হারটায় কি তবে ঐ কুলীমজুরদের অভিশাপ লেগেছে? এটার মধ্যে কি ওদের কোন বেদনার ইতিহাস লুকানো রয়েছে?

স্বপ্নের কথা শুনে সজল কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলো। সে মনে মনে ভাবলো: এ কি সত্য? কোনো অজানা দেবতা মুক্তার অন্তরে বসে' একথা বলছে না তো! সজল সস্নেহে মুক্তার হাতখানি নিজের মুষ্টিতে ধরে' মনে মনে বললো, এই সরল বালিকার বুকে জেগে উঠুক দুর্গত আর বঞ্চিতদের বেদনা, জেগে উঠুক তাদের দুঃখমোচনের প্রেরণা।

মুক্তা বললো, মাষ্টারমশায়, সবাই বড়লোক হয় না কেন? বেশীর ভাগ লোকই দেখছি কুলীমজুর।

সজল বললো, বড়লোকরাই ওদের বড়লোক হ'তে দেয় না; ওদের সকল রকমে বঞ্চিত করে' রেখেছে।

মুক্তা ধীরে ধীরে গম্ভীর হ'য়ে উঠলো। কি যেন একটা বেদনার ছায়া ওর মুখে এসে পড়লো। তারপর করুণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো, কি করলে এ-সব চাষীমজুর বড়লোক হ'তে পারে?

সজল বললো, মজুরদের কথা ছেড়েই দিলাম। এই চাষীরা, যারা জমির মালিক, যারা ধান উৎপাদন করে, তাদের থেকে তোমাদের মত যে সমস্ত ধনী লক্ষ লক্ষ মণ ধান কিনে এনে গুদামে বোঝাই করে'

তারপর চড়া দামে সেগুলো বিক্রী করে' বহু টাকা লাভ করছে। সেই লাভের সামান্য অংশও যদি ওরা পায় তবেই তো ওরা বাঁচতে পারে, তবেই তো ওদের মুখে ফুটে উঠতে পারে ঐশ্বর্যের হাসি। কিন্তু কোন বড়লোকই নিজের স্বার্থ একটুকু ত্যাগ করে' গরীব চাষীদের তুলে' ধরে না। মুক্তার কচি কোমল হাতখানি তখনো সজলের হাতের মুঠোয় বন্দী। সজল উত্তেজনার আবেগে মুক্তার মুষ্টিবদ্ধ হাতটায় একটু চাপ দিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বললো, এমনি করে' বড়লোকরা গলা টিপে মারছে কুলীমজুরদের।

মুক্তা বললো, ইচ্ছে হয় এই হারটা ছুঁড়ে ফেলে দিই ওই সব কুলী-মজুরদের সামনে।

সজল এবার মুক্তার হাতের আঙুলের অগ্রভাগে স্নেহচুম্বন দিয়ে হাতটা ছেড়ে দিলো। তারপর বললো, আমার এ চুম্বনের স্নেহধারায় জেগে ওঠো তুমি, সারা অন্তর দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করো কুলীমজুরদের ব্যথা। এই আশীষ-চুম্বন জীবনে ভুলো না কখনো।

মুক্তার মা, জমিদার-পত্নী পাশের ঘরে ছিলেন। সেই ঘরে পর্দার আড়ালে চুপ করে' দাঁড়িয়েছিলেন। সজলের এই আশীষ-চুম্বন দেখে তিনি জ্বলে' উঠলেন। মাষ্টারমশায় কি আজকাল পড়ান—না বসে' বসে' শুধু গল্প করেন? তা ছাড়া এ-সব কি? মেয়ের হাতের ওপর অমন করে' চুমো খাওয়া কেন? কাজ নেই অত পড়িয়ে। তীক্ষ্ণ ও ঝাঁঝালো কণ্ঠে মেয়েকে ডেকে তিনি বললেন, ও-সব কি গল্প হচ্ছে শুনি?

—ভালো গল্প মা!

—ছালো গল্প—তোমার মুণ্ডু!

—তুমি কি তা বুঝবে মা, আমাদের মতো বড় বড় ব্যবসায়ী আর মিল-মালিকরা দেশের কুলীমজুর, চাষীদের ঠকিয়েই তো বড়লোক।

—থাক থাক, হতভাগী মেয়ে, আর বল্‌তে হবে না। তোমার ঐ দয়াময় মাষ্টারটিকে বলে' দাও—তিনি যেন আর এ বাড়ীতে পা না ফেলেন। তারপর সজলের দিকে রুক্ষ দৃষ্টিতে চেয়ে বল্‌লেন, আপনার আর পড়িয়ে কাজ নেই, এক্ষুণি বেরিয়ে যান। একটুও কি লজ্জাবোধ হ'ল না আপনার আমার মেয়ের গা স্পর্শ করতে ?

সজল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লো, আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন। বেশ, আমি চলে যাচ্ছি, কিন্তু যাবার আগে একটা কথা বলে যাচ্ছি : এই যে বিপুল ঐশ্বর্য্য, এই বিরাট প্রাসাদতুল্য বাড়ী, এই যে মহামূল্য আসবাবপত্র—দু'দিন বাদে হয়তো এ-সব ধূলিসাৎ হবে। আপনারা বড়লোক, অর্থের অহঙ্কারে মনুষ্যত্ববোধ আপনাদের নেই; সেজন্যই মানুষ কর্‌তে চেয়েছিলাম আপনার মেয়েকে। যেখানে মানুষ নেই কেউ সেখানে কাউকে মানুষ করা কঠিন। 'এই বলে' সজল ক্ষণকাল বিলম্ব না করে' দ্রুতপদে নীচে নেমে গেলো।

মুক্তা পিছন থেকে ব্যস্তভাবে ডাকলো, মাষ্টারমশায়…… মাষ্টারমশায়,……মাষ্টারমশায়……

সেদিন রাত্রিতে সজলের চোখে ঘুম এলো না। তার জাগ্রত চোখ দু'টিতে কতকগুলি ছায়াস্বপ্নের ভিড় জমেছে যেন। কি যেন একটা অবসাদ সারা দেহে, কি যেন একটা দুঃসহ বেদনা তার বুকে। এ জীবনটা আজ তার কাছে শত নৈরাশ্যের অন্ধকার ঘেরা। শত চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে তার জীবনের ইপ্সিত কল্পনার জালগুলি। পদে পদে পাচ্ছে সে আজ বাধা। তার গতিপথ হয়ে এসেছে দুর্লঙ্ঘ্য। তাই সে আজ তার অনাগত ভবিষ্যৎটাকে দেখতে পেলো এক বিরাট অন্ধকারের মধ্যে। এতদিন মুক্তা ছিল তার সাথী। আদর্শ ছিল মুক্তার জীবন গঠন।

জীবন সেখানেই সুন্দর যেখানে পূর্ণতা লাভ করে মানুষ। মানব ধর্মের একটা বৃহৎ দিক হচ্ছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। সজলেরও

জীবনের আদর্শ সে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে' নূতন জীবন, নূতন সমাজ, নূতন মানুষ, নূতন দেশ গঠন করে। সজলের ভীষণ বীতস্পৃহা জন্মেছে এই ধনিকসম্প্রদায়ের ওপর। ধনিকের অজস্র টাকা, কিন্তু মনুষ্যত্ব বোধ তাদের কম। তাদের মনুষ্যত্বের অভাবেই দেশময় আজ এত দুর্ভিক্ষ, এত হাহাকার, এত অনাচার চলেছে। এরা টাকার ওপর বসে' আরো টাকার স্বপ্ন দেখে। এদের প্রাণের রক্ত যেন টাকার সঙ্গে মিশে এক হয়ে কঠিন হয়ে গেছে। দেশের দুর্গতদের, দেশের পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র অশিক্ষিত লোকদের যেন এরা পশু অপেক্ষাও ঘৃণা করে। তাদের প্রতি এদের কোন দরদ নাই, মায়া-মমতা নাই। অথচ অবহেলিত, শত দুঃখ-যন্ত্রণা-লাঞ্ছিত কোটি কোটি মানবসন্তানই দেশের মেরুদণ্ড। এ সকলকে উপেক্ষা করে' দূরে সরিয়ে রেখে দেশের কল্যাণ হ'তে পারে না। যেখানে দেশের এই নিম্নশ্রেণীর লোক দলিত, পীড়িত, সেখানে সমস্ত দেশই দলিত, পীড়িত। সে দেশের উন্নতি, সে দেশের স্বাধীনতা-স্বপ্ন সকলই বৃথা, সকলই অর্থশূন্য; অন্ধকারে হাত বাড়ানোর মত। সজল এই দুর্নীতির প্রতিকার চায়। সে চায় এই ধনিক-সম্প্রদায় আর দরিদ্রসম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যপ্রতিষ্ঠা করতে। সজল এই উদ্দেশ্য নিয়েই ধনীকন্যা মুক্তার চরিত্র দিয়েই চেয়েছিলো ধনীদের বিরুদ্ধে একটা বিপ্লব আনতে। মুক্তা ধনীকন্যা। কতকগুলো খানকলের মালিক তার পিতা। উপেন চৌধুরীর সমস্ত সম্পত্তিরই ভবিষ্যৎ অধিকারিণী হবে এই মুক্তা। সজলের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ ছিল সহজ ও সুগম। কিন্তু আজ একি হ'লো! মুক্তা তাকে ছেড়ে চলে গেলো! একি স্বপ্ন! না জীবনের উৎকট পরিহাস! সারাটা রাত সজল বিনিদ্র কাটালো।

রাত্রি ভোর হ'লো। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে প্রভাতের রক্ত সূর্য্য ঢাকা পড়েছে। চতুর্দ্দিক ব্যাপী ঘন অন্ধকার। একটু একটু বৃষ্টিও পড়ছে।

একটু একটু ঠাণ্ডা বাতাসও বইছে। বিছানা ছেড়ে উঠ্‌তে ইচ্ছে করে না—আজকের এ বাদ্‌লা দিনটা সজলের মনের সঙ্গে মিল খেয়েছে যেন। আজ তার মনের কোণেও ভীষণ মেঘ জমেছে। মনের আশেপাশে চারিদিক্‌ ঘিরে এমনি অন্ধকার, এমনি একটু বাদল-ঘন-বেদনা আজ তার মনের আকাশ জুড়ে। বাহির বিশ্বের ঐ পাতলা অন্ধকার ভরা সিক্ত আকাশের দিকে চেয়ে সজলের মনটা আজ ভারী হয়ে ভিজে উঠ্‌ছে যেন। ঐ আকাশের মেঘলোকের কোন মায়াপুরে তার মনের বাঞ্ছিত কি যেন হারিয়ে গেছে, খুঁজে খুঁজে সে ক্লান্ত। কিন্তু যা গেছে তা যেন আর ফিরে পাবার আশা নেই। ষাট টাকা বেতনের চাকরী গেছে—সেজন্য তার দুঃখ নেই। নিঃস্বের আবার টাকার প্রয়োজন কি? কিন্তু মুক্তা গেছে—তার জীবনের নূতন স্বপ্ন, নূতন আদর্শ, জগতে বেঁচে থাকার নূতন আনন্দ, সবই যেন তার সঙ্গে চলে গেছে।

একটা গভীর অবসাদে সজলের সমস্ত দেহমন নুয়ে পড়লো। বিছানা ছেড়ে আজ আর উঠ্‌তে ইচ্ছে করেনা। গায়ের চাদরটা টেনে আপাদমস্তক ভালো করে' ঢেকে সজল আবার ঘুমোতে চেষ্টা করলো। কিন্তু ঘুম তার চোখে নেই; আছে শুধু চোখ ভরা জেগে-দেখা ছায়া-স্বপ্ন। এ জীবনটা কি শুধু ছায়া? শুধু স্বপ্ন? কোন কিছু সত্তাকে কি বেষ্টন করে' ধরে' থাকতে পারে না? ধন নয়, মান নয়, রাজ্য নয়, ঐশ্বর্য্য নয়; শুধু একটু মানুষের জন্য মানুষের অনুকম্পা; শুধু একটু মানুষের জন্য হাসি, আনন্দ, ভালোবাসা।

পাশের ঘর থেকে পড়ার কণ্ঠস্বর আসছে। পাখী উঠে পড়তে বসেছে। সে খুব সকালে ওঠে। রাত থাক্‌তেই আলো জ্বেলে পড়তে বসে। ভোর সাতটা অবধি পড়াশুনা করে' আবার বাসার চাকরকে রান্নার কাজে সাহায্য করে। ন'টার মধ্যে বাবা অফিসে যায়। পাখীর মা নেই, অনেক কাল হ'ল পরলোকের পথে পাড়ি দিয়েছেন। তাই

পাখীকেই সংসারের যাবতীয় কাজ দেখে শুনে করতে হয়। সজল শুয়ে শুয়ে অবসাদগ্রস্ত মনে পাখীর পড়া শুনতে লাগলো। কি বই পড়ছে স্পষ্ট বোঝা যায় না, কিন্তু কণ্ঠস্বর কানে আসছে। কানে আসতেই সজলের মন কি যেন এক অপূর্ব আনন্দে ভরে' ওঠে। পাখীর কণ্ঠস্বর কি মধুর! সে মধুর স্বর সজলের অন্তরে প্রবেশ করে' তার সারা দেহে একটা পুলক-শিহরণ জাগিয়ে তোলে। কি মায়াময় পাখীর কণ্ঠস্বর! সজলের অলস অবশ প্রাণে যেন একটা বিদ্যুতের পরশ লাগে। পাখীর মুখখানি আরো সুন্দর, আরো মধুর! সজলের কল্পিত দৃষ্টিতে পাখীর সুন্দর মুখখানা ভেসে উঠলো। মুখখানা শতবার ভেবেও তার তৃপ্তি নেই। নিজের বুকের মধ্যে সে মুখখানা লুকিয়ে রাখতে চায় অহর্নিশি। পাখীকে নিয়ে আরো কত রঙীন বাসনা সজলের জেগে ওঠে। সে যে চাদরটা মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলো তার মধ্যে সে গড়ে' তোলে কত রাজপ্রাসাদ, স্বর্গরাজ্য। যেন সত্য সত্যই পাখী আজ তার রিক্ত বুকে এসে ধরা দিয়েছে। তার অধরোষ্ঠ স্পর্শ করছে সজলের অধর, কপোলে কপোল। সমস্ত মুখমণ্ডলে চুম্বনের অজস্র ধারা। সত্যই যেন আজ দু'টী রিক্ত হৃদয় বাসা বেঁধেছে ইন্দ্রলোকে!

সারাটী দিন অশ্রান্ত ভাবে মুষলধারায় বৃষ্টি হ'লো। সজল মেসে বসে' বসে' আজ বর্ষার কবিতা লিখলো। কিন্তু কিছুতেই যেন শান্তি পাচ্ছে না। তার সমস্ত তনুমনে আজ আষাঢ় মেঘের মেলা। আজ যেন আষাঢ়ের গান গাইতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে মহাকবির মেঘদূত আবৃত্তি করতে।

সন্ধ্যার সময় ললিতবাবু কোথায় একটু দরকারী কাজে বেরিয়েছেন। কানাই সেই যে দশটায় অফিস গেছে এখনো ফেরে নি। সারদাও তার এক মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেছে। এদিকে সন্ধ্যাটা ঘনিয়ে এলো। মেসে ইলেকট্রিক নেই, হ্যারিকেনটা কোথায়

আছে কে জানে। সজলের বাতি জ্বালতে ইচ্ছে করে না—অন্ধকারই তার ভালো লাগে। কিন্তু ললিতবাবুর গদিতে মাটির প্রদীপ সন্ধ্যাবেলা রোজই জ্বালাতে হয়, ধূপধুনো দিতে হয়, রাধাকৃষ্ণের নাম নিয়ে ধ্বনি তুলতে হয়—ওই ধ্বনিই নাকি ব্যবসায়ীর মূলধন। কিন্তু ললিতবাবু মেসে নাই, কে তুলবে নামের ধ্বনি আর কেই বা জ্বালাবে মাটির প্রদীপ? সজলের মন ও দেহ অবসন্ন। বালিশের ওপর কনুই ভর করে' শুয়ে আছে সে; কিছু ভালো লাগে না তার।

মেসের দরোজাটা একটু খোলা। পাখী দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাক্‌লো, সারদা, এখনো সন্ধ্যে দাওনি? ঘরটা যে একেবারে পাষাণপুরী! বাবুরা বুঝি কেউ নেই? এই বলে' সে দরোজা ঠেলে ঘরে ঢুক্‌লো। তারপর রান্নাঘরের দিকে চেয়ে আবার ডাক্‌লো, সারদা! কারও সাড়া শব্দ নাই।

সজল চুপ করে' আছে। কিন্তু একটা ভীষণ ঝড় তার দেহ মন কাঁপিয়ে তুলছে যেন। কণ্ঠ রুদ্ধ, বক্ষ স্পন্দিত, রোমাঞ্চিত। পাখী! একা! এই মেসের ঘরে! এমন অন্ধকারে! এমন বাদল ঘন অন্ধকারের মধ্যে প্রস্ফুটিত জ্যোতিঃর স্বর্গ!

পাখী সারদাকে আরও দু'একবার ডাক্‌লো। কিন্তু কোথায় সারদা, কেউ নাই। তারপর নিজেই বল্‌তে লাগলো, এ মেসটা হয়েছে একেবারে লক্ষীছাড়া! যেমন চাকর তেমনি বাবুরা। ঘরটা খোলা রেখে সব বেরিয়ে গেছে! আর সারদাই বা কেমন! আমাকেও তো বলে' যেতে পারতো—সন্ধ্যেবেলা ঘরের বাতিটা জ্বেলে দিতে। সজলদা'ই বা কোথায় গেলেন! সমস্ত ঘরটার জন্য মায়া শুধু ওই একটা লোকের জন্য। পাখী এবার একটু নীরব হয়ে ভাবলো সজলের কথা: সজলদা'কে বড়ো ভালো লাগে। ভালো লাগে তার বাহুলা-সজ্জার সান্নিধ্য। ইচ্ছে করে এই ঘন অন্ধকারে তারই প্রেমের

আলোকে আশ্রয় নিতে। পুরুষের প্রেম, ভালবাসা ও আশ্রয় এ কোন নারী না চায়? সজলদা'র মুখখানা সোহাগ করে' বুকে চেপে ধরে' ঘোমটা টেনে বলতে ইচ্ছে করে:

"ওগো বর ওগো বঁধু
এই যে নবীনা বুদ্ধি-বিহীনা
এ-তব বালিকা-বধূ।

পাখী এই মাত্র তাদের ঘরে বাতিটা জ্বালিয়ে এসেছে। তার হাতে দিয়াশলাই। একটা কাঠি জ্বালতেই নিভে গেলো। মনে মনে বিরক্ত হয়ে সে বললো, এদের কোথায় হ্যারিকেন, কোথায় মাটির প্রদীপ কে জানে? আবার আর একটা কাঠি জ্বাললো। কাঠিটা হাতের আড়ালে নিয়ে মাটির প্রদীপটা খুঁজতে লাগলো। অন্ধকার ঘরে হাতের কাছের জিনিষও খুঁজে পাওয়া যায় না। পাখীর বাঁ-দিকে সজলের বিছানার কাছে দেয়াল ঘেঁষে মাটির প্রদীপটা। পাখী প্রদীপটা জ্বালতেই সমস্ত ঘর আলোকিত হ'য়ে উঠলো।

সজল তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে পাখীর একটা হাত চেপে ধরে' হাসতে হাসতে বল্লো, এই লক্ষ্মীছাড়া মেসে আজ স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীর আবির্ভাব যে!

পাখী তাড়াতাড়ি ছুটে পালাতে চাইলো। সজল সমুখে এসে পথ-রোধ করে' দাঁড়িয়ে বললো, রাতের অন্ধকারে নির্জন ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে অত কি বল্‌ছিলে?

"লুকানো প্রাণের প্রেম পবিত্র সে কতো,
আঁধার হৃদয়তলে মানিকের মত জ্বলে
আলোতে দেখায় কালো কলঙ্কের মতো।"

মনে নেই রবীন্দ্রনাথ?

পাখী বললো, ছেড়ে দিন বলছি; সত্যিই আমি ভুল করেছি, আমায় ক্ষমা করুন।

—কথা তোমার নেই, শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে।

—যা খুসী শাস্তি দিন তবে।

সজল দু'হাতে পাখীর দু'টী আরক্ত কপোল চেপে ধরে' চোখে চোখ মিলিয়ে বললো :

"সমাজ সংসার মিছে সব
কেবল আঁখি দিয়ে
আঁখির সুধা পিয়ে,
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব।"

তারপর সজল আবার বললো, তোমার ঐ চোখের অনন্ত সুধা, প্রাণের অনন্ত অনুভূতি আর নির্জ্জনে দু'টি হৃদয় এমনি এক হয়ে মিশে যাওয়া, এর পর আর কিছু আছে কি? সমাজ, সংসার?

পাখী সজলের বুকে মুখ রেখে' সমস্ত গা এলিয়ে দিলো তার গায়ে। তারপর বললো, আমার সমস্ত সমাজ, সমস্ত সংসার, সমস্ত বিশ্ব তোমার এই বুকে; এর বাইরে যা কিছু সব মিথ্যা। শুধু সত্য এই প্রেম, এই ভালোবাসা।

—আর তোমার এই অধর-সুধা! বলে' সজল পাখীর অধরোষ্ঠে একটি চুম্বন এঁকে দিলো।

চকিতচকিতা হরিণীর মতো পাখী সহসা বললো, এখন শীগ্‌গির সরে' পড়ো; সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শোনা যাচ্ছে, বোধ হয় ললিতবাবু এলেন। এই বলে' পাখী তাড়াতাড়ি তাদের ঘরে ঢুকে পড়লো।

ললিতবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন। তাঁকে দেখে মনে হ'লো সন্তস্ত্রাস্ত। বাইরের অশ্রান্ত বৃষ্টিতে তাঁর সমস্ত জামা কাপড় ভিজে চপ্ চপ্ করছে।

সজল বললো, একটা রিক্সা করলেই তো পারতেন, জামা কাপড় সব ভিজে গেছে যে?

ললিতবাবু পায়ের জুতো জোড়া খুলে' আবার জুতো জুটো কাৎ করে'

তা থেকে প্রায় সেরখানেক জল ফেলে বললেন, কোনো রিক্সাওয়ালা আট আনার কম চাইলে না; এইটুকু রাস্তা আট আনা! যেন মগের মুল্লুক পেয়েছে! তা' ছাড়া এ আট আনার পয়সাই বা দেব কোত্থেকে? টাকা পয়সা কিছু কি আর রইলো? যা' উপার্জ্জন করেছিলাম এই তেরো বছরে সব গেলো। আজও মালগুলো জাহাজে তুলতে পারলাম না; এর মধ্যেই সব কুলী পালিয়েছে; যুদ্ধের এখনও পর্যন্ত দেখা নেই, শুধু মাঝে মাঝে সাইরেণ; এতেই ভয় পেয়ে সব ব্যাটা পালাচ্ছে! তোদের আবার জীবনের মূল্য কিরে! না হয় মরবি।

সজল বললো, এখন ভেবে দেখুন, আপনার ব্যবসায় লাভের কিছুটা অংশ এ কুলীরা পেতে পারে কিনা? যাদের একদিনের কাজের অভাবে আপনার হাজার হাজার টাকা ক্ষতি হ'তে পারে, তারা কার্যতঃ, আপনার ব্যবসায় অংশীদারী। আপনার টাকা আছে, বড় বড় ব্যবসা খুলে' বসতে পারেন; কিন্তু সে ব্যবসার প্রাণ টাকা নয়—ঐ কুলীমজুরের কায়িক শ্রম। ব্যবসার প্রকৃত মূলধন এই কুলীদের দেহের শক্তি।

ললিতবাবু জামা কাপড় ছেড়ে বললেন, তোমার বুদ্ধি বিবেচনা দেখছি একটু বেশী রকম মোটা। ছোটলোকদের নিজের টাকার অংশ দিয়ে আমার সমান করে' তুলবো! এ কারো সহ্য হয়? এ কুলীমজুরদের সঙ্গে সমান হয়ে বাস করার চেয়ে মরণ ভালো; আমার মান-সম্ভ্রম, ঐশ্বর্য্য, আমার আভিজাত্য, প্রতিপত্তি যতদিন অক্ষুণ্ণ থাকবে ততদিন আমি পূর্ণ-শক্তিশালী মানুষ। এ ছাড়া মানুষের বেঁচে থাকার আর কি সার্থকতা আছে? সেই প্রকৃত মানুষ, যে অন্যান্য দশজনের চেয়ে একটু ওপরে বাস করে।

সজল বললো, কিন্তু এ কুলীদের কায়িক পরিশ্রমের ফলেই যে আজ আপনার ধন, মান, এই ঐশ্বর্য্য, এই আভিজাত্য; তাদের বাদ দিয়ে আপনার এ অস্তিত্বের কথা ভেবে দেখুন দেখি? তারা যদি আপনার

লাভের অংশ কিছু পেতো তবে বোঝার নীচে দাঁড়িয়েও আপনার মাল তারা জাহাজে তুলে দিতো।

ললিতবাবু একটু চিন্তিত হয়ে বললেন, তা দিতো হয়তো; কিন্তু কুলীমজুর সকলেই যদি বড়লোক হয় তবে বড়লোকের মূল্য থাকে না।

সজল বললো, কিন্তু আপনাদের মতো বড়লোকের মূল্য বাড়ালে দেশের উন্নতি না হয়ে বরং অবনতিই হবে বেশী। দেশে দরিদ্রের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলবে। দেশ হবে চির দরিদ্র, চির দুর্ভিক্ষপীড়িত।

ললিতবাবু বৃষ্টিতে ভিজে এখন শীতে কাঁপছেন। সারদা তাড়াতাড়ি তামাক দিয়ে গেলো। ললিতবাবু গদির ওপর আসন করে' বসে' চোখ বুঁজে তামাক টানতে টানতে অনেকক্ষণ কি ভেবে তারপর বললেন, সত্যিই সজল, দেশটার কথা সময় সময় ভাবি; এ কুলীমজুরদের কথাও ভাবি। দেশে দুঃখ-দারিদ্র্য চির ব্যাধির মত দাঁড়িয়েছে। সবই বুঝি। কিন্তু যে বুঝতে চেয়েছে, দেশের জন্য কিছু করতে চেয়েছে, সেইই পদে পদে লাঞ্ছিত হয়েছে দেশের রাষ্ট্রের কাছে। তা'ছাড়া তুমি যা করবে আর দশজন করবে তার ঠিক উল্টো। দশজন এসে তোমার বিরুদ্ধেই দাঁড়িয়ে তোমাকে উৎপীড়িত করে' তুলবে। দেশের লোকেরা নানা মতের। এক মত, এক বুদ্ধি যদি সকলের থাকতো তবে দেশের এ দুর্দশা এতদিনে শেষ হ'ত। আমাদের দেশে জনমত বলে' কোন মত নেই; জনমত ছাড়া দেশ কোনদিন শক্তিশালী হ'তে পারে? আজ ভাবছি: জীবন ভরে' বর্মাদেশ থেকে কাঠের ব্যবসা করে' লক্ষ লক্ষ টাকা উপায় করেছি। শুধু টাকাই উপায় করেছি, দেশের দিকে একবারও চেয়ে দেখিনি। আজ এ জীবন-সন্ধ্যায় ভেবে দেখছি যে, কাল হয়তো জাপান এসে সমস্ত রেঙ্গুন শহর দখল করে' বসবে। তখন কোথায় থাকবে আমার টাকা আর কোথাইবা থাকবো আমি? অনেকদিন ভেবেছি যে, আর কেন? দেশের দৈন্যতা ঘোচাবার জন্য, কুলীমজুর আর

দুর্গতদের দুর্দশা ঘোচাবার জন্ত মস্ত বড় একটা অ্যাসোসিয়েশন টোসোসিয়েশন দিই। কিন্তু পর মুহূর্তেই আবার মনে হয়েছে—না, ধন-দৌলত, ঐশ্বর্য এর মধ্যেই জীবনের সার্থকতা। এ ধন ত্যাগ করতে আছে? এমনি এ জীবনের মোহ; এমনি এ জীবন ছাড়ার পাছে ধাওয়া। পারি না সজল, পারি না। টাকা পয়সার মায়া ত্যাগ করে' দেশের জন্ত মানুষ হ'তে পারি না। পঞ্চাশ বছর আগে থেকেই টাকা পয়সা নিয়ে মরে' রয়েছি।

এর পর প্রায় ছ'মাস কেটে গেছে। সজলের দিন আর যায় না। এদিকে বোমাও পড়ে পড়ে করে' পড়ছে না। জাপান যুদ্ধ-ঘোষণা করে' বোমা ফেলে একটা প্রলয় কাণ্ড করলেও মন্দ হ'ত না। এমন একটা সন্দেহজনক আবহাওয়ার মধ্যে আর কতদিন থাকা যায়? যাদের চাকরী আছে, ব্যবসা-বাণিজ্য আছে, কাজকর্ম আছে, তাদের দিন এ বোমা-পড়ে-পড়ে দুশ্চিন্তার ভিতর দিয়েই এক রকম কেটে যাচ্ছে। বোমা হয়তো শেষ পর্যন্ত পড়বেই না—এই ধারণায় এক রকম নানা কাজের উৎসাহের মধ্য দিয়ে সকলের দিন কাটছে; কিন্তু সজলের দিন আর কাটে না। বেকার জীবনের অভিশাপে ভরা তার এই দিনগুলি। ভালো একটা টিউশনী ছিল, তা'তে মেসের খরচ অনায়াসে চলে' যেতো; সামান্ত কারণে টিউশনিটাও গেলো। বড় আদরের মুক্তাও কাছ থেকে সরে' পড়লো। চারিদিকেই জীবনের ব্যর্থতার সুর। মেসে এক মাসের টাকা বাকী পড়ে গেছে। ললিতবাবু লোকটা নেহাৎ খারাপ নন; ভদ্র শিক্ষিত লোকের জন্ত তাঁর বেশ উদারতা আছে। সজলকে তিনি একদিন বললেন, টাকা পয়সার সঙ্গে বিদ্যার কোন সম্বন্ধ নেই। নিজে ম্যাট্রিকও পাশ করিনি, ছোটবেলা থেকে শিখে এসেছি ব্যবসা-বাণিজ্যের ফন্দি। টাকা উপায়ের নানা রকম মিথ্যা প্রবঞ্চনা। তাই

লাখ টাকার মালিক হয়েছি। কিন্তু তবু তোমার মতো একজন উচ্চ শিক্ষিত লোকের সঙ্গলাভ আমার মনের ও প্রাণের একান্ত কামনা। তোমাকে অন্তরে অন্তরে খুবই ভালোবাসি। তোমার বিদ্যা অক্ষয়, অমর। কিন্তু আমার এ টাকা পয়সা হয়তো আর দু'একদিনের। তুমি জীবন বিপন্ন করে' আর এ রেঙ্গুন শহরে থেকো না, দেশে চলে' যাও দেশে যা বাকী পড়েছে, সেজন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। তা' ছাড়া তোমার মনের কল্পনাগুলি শুনতে বেশ ভালো লাগে। এসব কল্পনা হয়তো কোন'দিন কাযকরী হ'তে পারে। তোমার ঐ সমৃদ্ধ মন নিয়ে বেঁচে থাকাই উচিত। বোমার ভয় থেকে সরে' পড়ো। কিন্তু সজলের আর সরে' পড়া হয় না। সরে' পড়বেই বা কোথায়? বেকার-জীবনের ভার দেশেও যেমন বিদেশেও তেমন। দেশে গিয়ে তবে লাভ কি? এখানে তবু ভিক্ষু বৌদি আছেন; দিনের কতকটা সময় তাঁর সঙ্গে গল্প করে' কাটানো যায়। তারপর আছে পাপী। অন্তরের অনেকখানি সে দখল করে' বসে' আছে। এ কর্মহীন ব্যর্থ জীবনের মাঝেও সজল আজকাল যেন কি একটা মধুর ছন্দ খুঁজে পায়। কি যেন একটা আনন্দ-ময় ছবি দিনরাত তার চোখের ওপর ভাসতে থাকে। জীবনের পরিপূর্ণতা কি শুধু অর্থ আর ঐশ্বর্যে? যে পুরুষ নারীর পবিত্র ভালোবাসা পেয়েছে তার কাছে পৃথিবীর সমস্ত ধন, সমস্ত ঐশ্বর্য তুচ্ছ। সে পুরুষের জীবন একটা অবিনশ্বর ঐশ্বর্যে ভরা। সে ধনী, সে রাজা।

সত্য সত্যই হঠাৎ একদিন জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করলো এবং সঙ্গে সঙ্গে বেলা দশটার সময় রেঙ্গুন শহরে বোমা পড়লো। নিমিষের মধ্যে সমস্ত শহরে হয়ে গেলো প্রলয় কাণ্ড। বাড়ী ঘরগুলো জ্বলতে লাগলো; শহর হ'লো অগ্নিময়। সমস্ত আকাশ ধূমায়িত। পথে ঘাটে অগণিত

পড়েছে। অনিত্য হ'লো সমস্ত সংসার, অনিত্য ধন-ঐশ্বর্য, অনিত্য এ মানবজীবন; শুধু ধ্বংসের ধূলি চোখের সামনে। পৃথিবীর শিক্ষা ও সভ্যতার স্নিগ্ধ শীতল আলো নিভে গেলো। আজ সমস্ত মানবসমাজ এক বিরাট অন্ধকারের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেললো।

সেই ভোরবেলা ললিতবাবু বেরিয়ে গেছেন, মালগুলি আজ যে ভাবেই হোক তিনি জাহাজে তুলে দিয়ে আসবেন। ললিতবাবু এখনো মেসে ফেরেন নি। নদীর দিকে হোয়ার্ফ লক্ষ্য করেই বোমা-বৃষ্টি বেশী রকম হয়েছে। সজল ললিতবাবুর আশা ছেড়ে দিলো। কানাই অফিসে কাজ করে আর খদ্দরের বিছানার চাদর ফেরি করে। অফিস থেকে সাতদিনের ছুটি নিয়ে সে বাইরে চলে' গেছে চাদর বিক্রী করতে। মেসের চাকর সারদা ভোরবেলা বাজার করে' এসে সজলের কাছে হিসাব দিতে গিয়ে দেখে—বাজারের তরকারীওয়ালাকে এক আনার পয়সা বেশী দিয়ে এসেছে। সে পয়সা আদায় করতে সারদা আবার বাজারে গেছে। তারও ফেরবার আশা নাই, বাজারের মধ্যেও বোমা পড়েছে। সজল মেসে একা। পাশের ঘরে পাখীও একা। দশ বারোদিন হ'ল তার বাবা মিঃ দে মেমিও বদলী হয়েছেন। তিনি সেখান থেকে সজলকে চিঠি লিখেছেন :

প্রিয় সজলবাবু,

আমার পত্রখানা পাওয়া মাত্র আপনি পাখীকে নিয়ে ক'লকাতা চলে যাবেন। এখানে বাসা করা হবে না। সমস্ত ব্রহ্মদেশে শীঘ্রই একটা প্রলয় কাণ্ড হবে। এ অবস্থায় বাসা করতে নেই। তা'ছাড়া আমাকে হয়তো অফিসের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হবে। আপনি ওকে নিয়ে ক'লকাতা চলে' যান—বেথুন কলেজে ওকে ভর্তি ক'রে দেবেন। আশা করি ভাল আছেন। শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
মিঃ দে

বোমা যখন পড়তে আরম্ভ করলো, সজল দৌড়ে পাখীদের ঘরে ঢুকে পাখীর হাত ধরে' টেনে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে একতলায় মুদির দোকানে ঢুকলো। চারতলা বাড়ী, একতলা পর্য্যন্ত বোমা পড়তে পারবে না। কিন্তু মেসিন গানের ভয় আছে। তাড়াতাড়ি দোকানের দরোজা বন্ধ করে' দিয়ে সজল, পাখী আর দোকানী ভিতরের দিকে দেয়াল ঘেঁষে বসে' রইলো।

দ্রুম...দ্রুম...দ্রুম... পাশেই হয়তো বোমা পড়লো। সমস্ত বাড়ীটা থর থর করে' কাঁপছে। পাখী কানে আঙুল দিয়ে সজলের কোলে মুখ গুঁজে উপুর হয়ে পড়ে রইলো। সামনের দরজা হঠাৎ একটা ভীষণ আঘাতে যেন খুলে' গেলো। মনে হচ্ছে ভূমিকম্প। সমুখের রাস্তা দিয়ে হাজার হাজার লোক দৌড়ে লেকের ধারে যাচ্ছে।

সহসা মুদিওয়ালা চালের বস্তার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় নেমে লোকের সঙ্গে দৌড়োতে লাগলো। সজলও পাখীকে নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়লো। মনে হ'লো: বাড়ীর ছাদটা যেন ভেঙ্গে পড়বে। রাস্তায় নেমে পাখী আর সজল দৌড়োতে লাগলো, কিন্তু দৌড়ানো কি যায়? রাস্তায় লোকের ভিড় ঠেলেও অগ্রসর হওয়া যায় না। তার ওপর মেসিন গানের শব্দে পা থর থর করে' কাঁপছে। লোকগুলো আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ে' যায় আবার উঠে দৌড়োয়; কিন্তু একটুকুও যেন এগুতে পারছে না। বুক দুরু দুরু করে, হাঁপাতে হাঁপাতে আবার দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। মনে হচ্ছে—নদীর পাড় থেকে বম্ করতে করতে এদিকেই যেন আসছে। আবার দৌড়োতে থাকে, আবার আছাড় খেয়ে পড়ে যায়। মনে হচ্ছে—বোমা মাথার ওপরেই পড়ে গেছে বোধ হয়। জীবিত আছে না মরে' গেছে সহজে বুঝা যায় না! কানের ভিতর শোঁ শোঁ শব্দ; চোখের সামনে মরু-মরীচিকা! নিশীথ রাত্রে স্বপ্নে

আকাশে উড়ে চলার মতো সজল আর পাখী যেন উড়ে উড়ে এগুতে লাগলো। তারা শহর পেরিয়ে এসে পড়লো রেলওয়ে ষ্টেশনে। ঠিক ষ্টেশনে নয়, ষ্টেশনটা একটু বাঁ-দিকে। এদিকে রেলের লোহার লাইনগুলো স্তূপাকারে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সোজা পথে যেতে পারলে রাস্তাটা অনেকখানি শর্টকাট্ হয়। লোকগুলো এখন সোজা রাস্তা দিয়েই ছুটে পালাচ্ছে। হোক লোহার কাঁটার বেড়া; হাজার হাজার লোক এগিয়ে রেলের লাইনগুলো ক্রশ করে' পার হ'তে লাগলো। কেউ কেউ লাইনে পা ঠেকে উপুর হয়ে পড়ে গিয়ে হাত পা ভেঙে ফেললো। ভাঙা পা নিয়েই আবার খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগুতে লাগলো। পা ভেঙে গেলেও ক্ষতি নাই তবু বাঁচতে হবে, তবু দৌড়োতে হবে। মনে হ'লো: লক্ষ লক্ষ সুসভ্য লোক আজ হঠাৎ কোন দৈত্যদানব দ্বারা পিছন দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে প্রাণের ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াচ্ছে। সজল আর পাখী হাত ধরাধরি করে' দৌড়ে রেলওয়ে লাইনগুলো পার হয়ে এসে একটা মসজিদের পাশের আমবাগানের ভিতর দিয়ে নানা জঙ্গলাকীর্ণ পথ পার হয়ে লেকের ধারে এসে অবসন্ন ও ক্লান্ত দেহে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লো।

বেলা তিনটার সময় অল ক্লিয়ার সাইরেন বাজলো। লক্ষ লোকের ভিড় লেকের ধারে; অল ক্লিয়ার দেবার পরও কেউ সহজে ঘরে ফিরে যাচ্ছে না। কোথায় যাবে? ঘর কি আছে? দাউ দাউ করে' জ্বলছে যেন সমস্ত শহর। মানুষ সভ্য শহর ছেড়ে বাস করতে লাগলো ঝোপে-জঙ্গলে, গাছতলায়।

সিন্ধু বৌদির বাসা লেকের ধারেই। একতলা একখানা কাঠের বাড়ী, দু'খানা ঘর। সজল পাখীকে নিয়ে সিন্ধু বৌদির বাসায় গেলো। সামনের দরোজাটা একেবারে খোলা। সজল ঢুকে দেখে সামনের ঘরে কেউ নেই। সজল ডাকলো, বৌদি! কোন সাড়াশব্দ নেই। সজল

এগিয়ে গিয়ে পিছনের ঘরে ঢুকে দেখে বৌদি মূর্চ্ছিতা। কাঠের মেঝের ওপর পড়ে আছে। খোকা বৌদির দু'টী বাহুর আড়ালে ঘুমন্ত অবস্থায়। সজল সিন্ধুর মাথা ধরে' ঝাঁকুনি দিয়ে ডাকলো, বৌদি! কোন সাড়া নেই। পাখী তাড়াতাড়ি তাঁর হাত ছাড়িয়ে খোকাকে কোলে তুলে' নিলো। সিন্ধুর হাত দু'খানি মুক্ত হয়ে শুয়ে পড়ে রইলো মেঝের ওপর।

অনেকক্ষণ জল বাতাস দেবার পর সিন্ধু বৌদি চোখ মেলে চাইলো। তারপর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে বললো, ঠাকুরপো, কখন এলে? এখানে আর এক মুহূর্ত্ত থাকার দরকার নেই, শীগগির আমাকে নিয়ে চলো। তোমার দাদা প্রোম থেকে তার করেছেন, তিনি আজ কিছুদিন হলো প্রোম বদলি হয়েছেন। শীগগির আমাকে সেখানে নিয়ে চলো। তারপর পাখীর দিকে চেয়ে বললো, এ মেয়েটি কে? এও তোমার সঙ্গ ধরেছে বুঝি? বেশ তা' হ'লে চলো—কালই এখান থেকে চলে' যাই। এ ডাকাতের রাজত্বে আর এক মুহূর্ত্তও থাকবো না। মানুষের ওপর ফেলে বোমা! মেসে তোমার জিনিষ-পত্র যা' আছে সব নিয়ে এসো, কালই যাওয়া চাই।

সজল হেসে' বললো, সংসার যা'র নেই, তার কি আর জিনিষ-পত্রের মায়া থাকে? সম্বলের মধ্যে আমার আছে টিনের একটা ভাঙ্গা স্যুটকেশ—তার মধ্যে কয়েকখানা কবিতার খাতা, জীবনের অর্থশূন্য সম্বল। ও দিয়ে আর কি হবে; মেসেই পড়ে' থাক। জাপানীরা এসে দেখবে—বাঙালীরা কল্পনার রাজ্যে উড়ে বেড়ায়, আকাশে বাঁধে নীড়। সেই নীড়ে রেখে যায় দার্শনিক তত্ত্ব। বিদেশীরা এসে সেই তত্ত্ব থেকে খুঁজে বা'র করে সূক্ষ্ম সত্য। গড়ে তোলে flying bomb, বাঙালী শুধু হাঁ করে' আকাশের দিকে চেয়ে থাকে ভয়-কাতর দৃষ্টিতে। 'তা' ছাড়া এতক্ষণে মেসের জিনিষ-পত্র সব লুঠ হয়ে গেছে। দরোজা বন্ধ করে' আসার সময় কি আর পেয়েছি? বোমা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছি

একে নিয়ে। এর নাম পাখী, আমাদের পাশের ঘরে থাকে। এর বাবা আছে মেদিওতে। একে ক'লকাতা পৌঁছে দেবার জন্ত চিঠি লিখেছেন। কিন্তু এখন ভাবছি, কোন দিক সামলাই! আপনার দিক না এর দিক? দু'দিকেই দুটি নারীর বিরাট প্রশ্ন! মাঝখানে আমি দিশেহারা!

সিন্থু বললো, নারীর প্রশ্ন চিরকালই বিরাট কিন্তু মীমাংসা সহজ। ক'লকাতার জাহাজ মাসখানেক ধরে' ঠিক মতো যাচ্ছেনা; হয়তো আজ থেকে একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। তা' ছাড়া আজকাল জাহাজে কে যায়? সমুদ্র ভর্তি সাব্‌মেরিন। তার চেয়ে সবাই মিলে প্রোম চলে' যাই, পরে যা হয় হবে।

বিকেল বেলার দিকে পাখী বললো, সজলদা, টাকা পয়সা সঙ্গে কিছুই আনিনি, তুমি তো নিঃসম্বল। পথে ঘাটে টাকা পয়সার দরকার। আমার পড়ার টেবিলের ড্রয়ারে পাঁচশো টাকা আছে। এই নাও চাবি, শীগ্‌গির যাও; ড্রয়ার খুলে' টাকা নিয়ে এসো। দরোজা খোলা রেখেই বেরিয়ে পড়েছি, শীগ্‌গির যাও।

সজল চাবি নিয়ে শহরে গেলো। ট্রাম, বাস সব বন্ধ। ট্রাম লাইনের ধারে এখনো হাজার হাজার লোক। শহর ছেড়ে শহরের বাইরে যাবার জন্ত সবাই ব্যস্ত। কিন্তু ট্রাম লাইনের তার ছিঁড়ে গেছে। কোন কোন জায়গায় আগুন জ্বলছে। লোকের যাতায়াত একেবারে বন্ধ। পায়ে হেঁটে যে যতদূর পারছে চলে' যাচ্ছে। সজল হেঁটেই শহরে এসে ঢুকলো। অসংখ্য মৃতদেহ শহরের রাস্তায়। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে চারতলায় উঠে আগে পাখীর ড্রয়ার খুলে' টাকা বার করে' পকেটে রেখে তারপর নিজের মেসে ঢুকলো। ঘরে কেউ নাই। ললিতবাবু বা সায়রা কেউ নাই। মেসের ছাদটা সেদিন সাগে উড়ে গেছে! জিনিষ পত্র সব ভেঙে চুরে' পড়ে আছে। ললিতবাবুর আলমিরার কাঁচের গ্লাসটা ভেঙে চুরমার

হয়ে গেছে। গদির ওপরের হাতবাক্সটা গদি থেকে মেঝেতে ভেঙ্গে পড়ে আছে। সজলের ভাঙা সুটকেশটা এখনো অবিকল আছে। সজল সুটকেশটা খুলে' কবিতার খাতা ক'খানার দিকে চাইলো। বেকার-জীবনের একমাত্র সম্বল এ ক'খানা খাতা। জীবনের এ ব্যথা আজ বয়ে' নিয়ে লাভ নাই, থাক এখানেই। সজল একবার মেসটার মেঝের দিকে চেয়ে দেখলো, ললিতবাবুর হাজার রকম আসবাব-পত্র পড়ে' রয়েছে। জামা, জুতা, কাপড় আরো কত কিছু। ললিতবাবু জীবিত না মৃত কে জানে? হায় রে জীবন! তোমার এই ঐশ্বর্য্য, এই আসবাব-পত্র, ধনদৌলত, এমনি একদিন অকাতরে ফেলে দিয়ে চলে' যেতে হয়। সজল তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে' নীচে নেমে এলো। রাস্তায় নেমে আবার ভাবলো: মুক্তাদের একটা খবর নেবার কথা। সে এখন আর মুক্তাকে পড়ায় না। মুক্তার মা তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন, কিন্তু মুক্তার তো কোন দোষ নেই। মুক্তাকে তার ভালো লাগে। চমৎকার মেয়ে! কয়েকদিনের মধ্যেই ওর চরিত্রে একটা পরিবর্ত্তনের রেখাপাত করেছে। ভাগ্যদোষে সব গেলো। ওকে গড়ে' তুলতে পারলেনা মনের মতো করে'। ওর জন্য সত্যই প্রাণটা কাঁদে। আজকের এই বোমায় বেঁচে আছে তো! নদীর ধারেই বোমা বেশী পড়েছে, ওদের বাড়ীটা ও-দিকেই। সজলের বুকটা যেন কি এক অজানা শঙ্কায় কেঁপে উঠলো। মনে হলো, মুক্তা নাই। সজল ছুটে চললো মুক্তাদের বাড়ীর দিকে। রাস্তায় লোকজন নাই। সব শহর ছেড়ে এর মধ্যেই চলে গেছে। দিনের বেলাও রাস্তা দিয়ে হাঁটতে ভয় করে। সমস্ত শহরটা যেন একটা শ্মশানপুরী। রাস্তার পাশের গাছগুলির ডালপালা সব পুড়ে' নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ফুট-পাতের ওপর অনেক লোক মরে' রয়েছে। মনে হয় নিদ্রিত। গায়ে কোন আঘাত নাই। হয় তো বোমার শকে হার্টফেল করেছে। শঙ্কা-

জড়িত প্রাণে সজল ছুটে গিয়ে মুক্তাদের বাড়ীতে উঠলো। চারতলা বাড়ী। সিঁড়ি বেয়ে' ওপরে উঠে দেখে—মুক্তাদের ঘরের দরোজা খোলা। সজল তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে পড়লো। এ ঘরেই মুক্তাকে সে পড়াতো। ঘরে ঢুকতেই সজলের বুকটা কেঁপে উঠলো। সব জিনিষপত্র ভেঙে ওলট পালট হয়ে রয়েছে। আলমিরার কাঁচ একখানাও গোটা নাই ; ভেঙে মেঝের ওপর পড়ে রয়েছে। দেবদেবীর মূর্তিগুলি আলমিরা থেকে পড়ে গেছে। ঘর ছড়ানো নানা দেবতা। সজল হেসে উঠলো। বোমার কাছে আজ তেত্রিশ কোটী দেবতাও তুচ্ছ। সব দেবতাই আজ ধূলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে! মাছের ট্যাংকটাও ভেঙে গেছে। জলে সমস্ত ঘরটা ভিজে। রঙীন মাছগুলি মৃত অবস্থায় অক্ষত দেহে পড়ে রয়েছে। সামনের দিকের দেয়ালটা ভেঙে গেছে। ইট-সুরকি স্তূপাকারে পড়ে' রয়েছে। সজলের গা যেন আতঙ্কে শিউরে উঠলো। সজল ডাকলো, মুক্তা! মুক্তা! সজলের কণ্ঠস্বর সারা বাড়ীতে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগলো। ইচ্ছা হ'লো, দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসে। আবার ডাকলো, মুক্তা! মুক্তা! কারো কোন শব্দ নাই। নিঝুম, নীরব শ্মশানের মতো সারা বাড়ীটা। সজল দৌড়ে ভিতরের ঘরে ঢুকলো। মুক্তা, মুক্তা বলে' ডাকতে লাগলো। কিন্তু কোথায় মুক্তা? সজল পরপর তিন চারখানা ঘরের ভিতরে ঢুকলো। বিরাট হলের মত একটা ঘর, চারদিকে সাজানো আসবাব-পত্র, খাট পালঙ্ক, আলমিরা, ড্রেসিং টেবিল, শ্বেত পাথরের টেবিল, কুশন চেয়ার। সজল স্ব ঘরগুলি খুঁজে খুঁজে দেখতে লাগলো। একটা বিরাট রাজপুরীর অনন্ত ঐশ্বর্যের মধ্যে যেন সজল রাজকন্যা খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু রাজপুরী শূন্য, শ্মশান। সজল চীৎকার করে' উঠলো মুক্তা নাই। সজল দৌড়ে বেরিয়ে এলো। আসবার সময় দেখে : মুক্তার সেই মুক্তাহার শ্বেত-পাথরের মেঝের ওপর পড়ে' আছে। অন্ধকার ঘরটায় মুক্তার হারটা যেন চকমক করে' জলছে।

সজল স্তম্ভিত হয়ে মুক্তার হারের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। তারপর ক্ষিপ্ত উন্মাদের মতো হার ছড়াটি দু' হাতে মুঠি করে' তুলে নিয়ে নিজের বুকে চেপে ধরলো। একি চুরি? না মুক্তার স্মৃতিরঞ্জিত অমূল্য ঐশ্বর্য? সজল নীচে এসে একতলা ঘরের লোহা-ব্যবসায়ী গুজরাটী ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলো, ওপরের বাড়ীওয়ালা উপেন চৌধুরী, তার স্ত্রী, তার মেয়ে মুক্তা—এরা সব কোথায়?

গুজরাটী ভদ্রলোক সজলের দিকে চেয়ে বললো, কে, মাষ্টারবাবু? আপনাকেও অনেকদিন দেখিনি। সে যাক্, কিন্তু আপনি বুঝি কিছুই জানেন না? না জানবারই কথা। কে কার খবর রাখে, আজকের এমন শ্মশান করা দিনে। মুক্তার বাবা মেসিন গানে গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে মারা গেছেন। মুক্তা আর তার মা এইমাত্র জেটির দিকে গেলো। শুনলাম, জাহাজে দেশে চলে যাচ্ছে।

সজল আর এক মুহূর্ত দেরী না করে' জেটির দিকে দৌড়োতে লাগলো। যদি একবার ওদের সঙ্গে দেখা হয়! নিকটেই জেটি। সেখানে গিয়ে দেখে—লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড়। ক'লকাতাগামী দু'খানা জাহাজ প্যাসেঞ্জারে ভর্ত্তি। জাহাজ প্রায় ছাড়ে ছাড়ে। জাহাজের সিঁড়ি তোলবার সময় প্রায় হয়ে এসেছে। কিন্তু ওঠাতেও পারছে না। সিঁড়ির ওপর আরো অনেক প্যাসেঞ্জার জাহাজে ওঠবার জন্ম ঠেলাঠেলি ক'রছে। ওঠবার জন্ম সকলেই ব্যস্ত, কিন্তু তাদের পুলিশ উঠতে দিচ্ছে না। জাহাজে আর তিলধারণের স্থান নেই। যারা উঠেছে, তারাও যেন নেমে আসতে পারলে বাঁচে। সজল সিঁড়ি দিয়ে লোকের ভিড় ঠেলে জাহাজে ওঠবার শত চেষ্টা করলো কিন্তু কা'র সাধ্য ওঠে! তিন চারজন পুলিশ লাঠি দিয়ে তাড়াতে লাগলো। সজল অশ্রুসিক্ত চোখে নেমে এলো।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, সজল ঘরে ফিরে এলো। পাখীর হাতে পাঁচশো টাকা দিলো।

সিন্ধু বৌদি বললো, তুমি তাড়াতাড়ি এক বালতি জল আর এক সের আলু এনে দাও। ঘরে এক ফোঁটা জল নেই ; রান্নারও কিছু নেই। আগে খেয়েদেয়ে একটু সুস্থির হয়ে নেয়া যাক্।

ঘরটা অন্ধকার দেখে পাখী সুইচ্ টিপতে গেলো কিন্তু কারেন্ট বন্ধ। পাখী বললো, এখন উপায়, কারেন্ট নেই যে!

সিন্ধু বৌদি বললো, মোম বাতি আছে, জেলে দিচ্ছি। বলে' দু' তিনটে মোম একত্র জেলে দিলো। সজল রাস্তায় জল আর আলু আনতে গেলো। সামনেই জলের কল, কিন্তু এক ফোঁটা জল নেই ; সাপ্লাই বন্ধ। থাক জল, আলুটা কিনে নিয়ে যাই ; বলে' সজল আলুর দোকানে গেলো, কিন্তু দোকান বন্ধ। দোকানের ভিতর লোক আছে, কথা শোনা যায়। সজল ডেকে বললো, আলু আছে? উত্তর এলো—না। সজল বললো—ডাল আছে। উত্তর এলো—আছে, দু'টাকা সের।

এক টাকা দিয়ে আধ সের ডাল কিনে সজল চলে এলো। সিন্ধু বললো, কিন্তু জল ছাড়া রান্না হবে কি করে? সজল জলের অন্য কোন উপায় না দেখে সোজা বালতি হাতে লেকে চলে' গেলো। তখন রাত হয়ে গেছে। প্রলয়ের অন্ধকার, কিন্তু লেকের ধারে যেন দিবালোক! সকলে রান্না করছে। প্রায় হাজারখানেক উনুন জ্বলছে সেখানে। কিন্তু উনুনের আগুনের দিকে চাইলে মনে হয় একটা শ্মশানভূমিতে যেন অসংখ্য চিতা জ্বলছে। মানব সভ্যতা যেন আজ শ্মশান রূপে দেখা দিয়েছে সর্ব্বত্র। সজল জল নিয়ে এলো। ডাল, ভাত রান্না হ'লো। সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া সেরে এক ঘরেই এক বিছানায় সকলের শোবার ব্যবস্থা হ'লো। সজল বললো, বৌদি, আমার বিছানাটা

আলাদা করে' পাতলে হ'তো না? মেয়েদের সঙ্গে একত্র শোয়ার অভ্যাস নেই; সারা রাত হয়তো ঘুমই হবে না।

সিন্ধু বললো, একজনের জেগে থাকা দরকার। রাত্রে সাইরেন বাজলে শুনতে হবে তো? সেজন্য তুমি না-হয় জেগেই থেকো। যদি বল বরং আমার বিছানা পৃথক করে' পাততে পারি। তুমি আর পাখী এক বিছানায় শোও। পাখী যে কে বুঝতে আর আমার বাকী নেই। একদিন এর কথাই বলেছিলে যে, তুমি একটি মেয়েকে ভালোবাসো। তাকে উপভোগ করতে চাও। বিশ্বব্যাপী জ্বলছে প্রলয়-বহ্নি। তুমিও না হয় এ প্রলয়-বহ্নির মাঝে আর একটু ইন্ধন যোগাও।

সজল বললো, না বৌদি, তুমি আমাকে ক্ষমা ক'রো, আজ ভেবে দেখছি—বিশ্বব্যাপী এই যে ধ্বংসের স্রোত বয়ে চলছে, তার মূল কারণ উচ্ছৃঙ্খল মানব-চরিত্র, বাসনা কামনার অগ্নিশিখা যে মুহূর্ত্তে মানব বক্ষে প্রবল সে মুহূর্ত্তেই মানুষ ও মনুষ্য সমাজ ছুটে চলে ধ্বংসের পথে। আমার দেহের অন্ধ মোহ আজ আর নেই। সেই অনল তৃষ্ণা যেন নিভে গেছে। চোখের সামনে আজ শুধু পাখীর কল্যাণময়ী ছবিই যেন দেখছি। পাখীকে আজ ভালবাসি সন্তানের জননীরূপে, সৃষ্টির সঙ্কিত আয়োজনরূপে। শুধু কামনা চরিতার্থ ক'রবার জন্য নয়।

সিন্ধু বৌদি হেসে বললো, এইতো লক্ষ্মী ছেলের মতো কথা: তা হ'লে ওকে বিয়ে করো না কেন দিন-ক্ষণ দেখে, পুরুত ডেকে… ?

সজল বললো, পুরুত ডেকে, পণ্ডিত সাক্ষী রেখে বিয়ে করার কোন প্রয়োজন আছে কি? আমরা দু'জনে যখন অন্তবিনিময়ে এক হয়ে গেছি, তার ওপরে কি শাস্ত্র-মন্ত্রের দরকার আছে বলতে চাও? বৌদি, তুমিই হবে আমাদের মিলনের মন্ত্রদাত্রী। তুমিই আমাদের দু'জনের হাতে হাত মিলিয়ে দেবে। ঘটা করে' লোক দেখিয়ে বিয়ের দিন-ক্ষণ দেখার সময় আজ আর নেই; মাথার ওপর বোমা কাঁপছে।

পাশের ঘর থেকে পাখী সজলের সব কথা শুনতে পেলো। প্রথমে তার ভয়ানক লজ্জা হ'লো। সজলের ওপর রাগও হ'লো। নিজেদের প্রাণের গোপন খবর অপরের কাছে কে বলে? ধ'রেই যখন ফেলেছে তখন আর লজ্জা করে' লাভ নেই। সে সমুখে এসে হেসে বললো, হাঁ সিন্ধুদি, আমাদের মিলনের সাক্ষী হবে তুমি। পতিব্রতা নারীই জগতের শ্রেষ্ঠ মন্ত্রদাত্রী। তুমিই আমাদের হাতে হাত মিলিয়ে দাও। আমি ওঁকে প্রণাম করে' পদধূলি নিই।

সিন্ধু বললো, আচ্ছা, তাই হোক। আমি বলছি, তোমাদের এ বিবাহ পরম পবিত্র, সত্য ও সুন্দর। বলে' সিন্ধু দু'জনের হাত একত্র মিলিয়ে দিলো। পরে পাখী ও সজল সিন্ধুর পদধূলি নিলো।

সজল বললো, এখন চলো, ঘুম পেয়েছে ভয়ানক; বাসর-শয্যা বৌদি আগেই করে' রেখেছেন।

সজল পাখীর গলায় সেই মুক্তার মালাটি পরিয়ে দিয়ে বললো, এ মুক্তার হার সম্বন্ধে আপাততঃ আমাকে কোনো প্রশ্ন করো না, সময় হ'লে ব'লবো, কার হারে তোমাকে সাজালাম। আমার জীবনে আজ দু'টী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য এসে মিলেছে: একটি তুমি, অপরটি এ মুক্তার হার।

পাখী প্রথমে একটু বিস্মিত হ'লো, পরে কি যেন আশঙ্কায় কেঁপে উঠলো। সে ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে বললো, আমি মরে' গেলে তুমি এ হারের মালিককে বিয়ে ক'রো: মনে হয় সে তোমাকে আমার চেয়েও ভালোবাসে।

সজল পাখীকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললো, ছিঃ, অমন কথা বলতে নেই; তোমার চেয়ে কেউ আমাকে বেশী ভালোবাসে না পাখি!

•

রাত্রি ভোর হ'তেই গ্রামে যাবার ব্যবস্থা সুরু হ'লো। সিন্ধু বৌদি সমস্ত জিনিষপত্র গুছিয়ে বাঁধতে লাগলো। ট্রাংক, সুটকেস, বিছানাপত্র,

থালা ঘটিবাটী, ফ্লাস্ক, চায়ের সরঞ্জাম ইত্যাদি সংসারের যাবতীয় জিনিষপত্র। জিনিষপত্র বেঁধে ঘরের মেঝের এনে সব একত্র করে' বাঁধতে লাগলো। পুরাতন ঘর ভেঙে এ যেন নূতন ঘর বাঁধবার অগ্রভয়া আয়োজন। সিন্ধুর চোখে মর্মনিঃসৃত অশ্রু! কি যেন এক দৈত্যের তাড়নায় তাকে আজ ঘর ভেঙে চ'লে যেতে হচ্ছে। সংগ্রামমত্ত দেশে মানুষের ঘরবাড়ী হাল্কা বালুর তীরে গড়া যেন; নিমিষে নিমিষে ভেঙে পড়ে তার সমস্ত বাঁধ। ভাঙা-গড়ার বিপুল বেদনায় প্রতি মুহূর্তে ভিজে ওঠে ছু'টী চোখ। সিন্ধুর সিক্ত চোখের কোণে ভেসে উঠলো মানব-সভ্যতার কঙ্কাল-ছায়াঘন অন্ধকার। ভোরবেলা উঠেই সজল চলে' গেছে ষ্টেশনে। অসম্ভব ভিড় ষ্টেশনে। বোমার তাড়নায় হাজার হাজার লোক ষ্টেশনে এসে জমায়েত হয়েছে। সবাই ট্রামের গাড়ীর জন্ত অপেক্ষা করছে; ট্রাম থেকে পায়ে হেঁটে দেশে চলে যাবে। কিন্তু ষ্টেশনে গাড়ী নাই। এখনই ট্রামের গাড়ী ছাড়বার সময়, কিন্তু গাড়ী কোথায় বোমা-বিধ্বস্ত হ'য়ে প'ড়ে আছে কে জানে? ষ্টেশন মাষ্টার অফিস ঘর থেকে প্লাট্‌ফর্মে অনবরত আসা-যাওয়া করছেন। কি যেন একটা বিপদের আশঙ্কায় তিনি অস্থির হয়ে পড়েছেন। গাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করলে বলেন—গাড়ী নেই, চ'লে যাও সব ষ্টেশন ছেড়ে। বিকেলবেলার দিকে শোনা গেলো, ট্রামের গাড়ী চারটার সময় ছাড়বে। সজল আবার বিকেলে ষ্টেশনে গেলো। গিয়ে দেখে এবারের অবস্থা আরো খারাপ; প্রায় তিন চারশো লোক! কেউ গাড়ীর জানালা ধরে', কেউ গাড়ীর হাতল ধরে' ঝুলে' রয়েছে। যারা গাড়ীর ভিতরে ঢুকেছে তারা ঠেলাঠেলি, মারামারি, কান্নাকাটি করে' সমস্ত ষ্টেশনে আর একটি কুরুক্ষেত্র বাধিয়েছে। পুলিশ বেপরোয়া লাঠি চালাচ্ছে, কিন্তু তবু কেউ গাড়ীর এতোটুকু জায়গা ছেড়ে আসতে রাজী নয়। এর পর ছু' চারদিনের মধ্যে হয় তো ট্রামের গাড়ী আর

নাও থাকতে পারে, কাজেই পুলিশের তাড়না এখন তুচ্ছ। যাই হোক যেতেই যেতে হবে। শুধু নিজের জীবনটা বাঁচাতে পারলেই হয়। লোকের ট্রাংক, সুটকেশ, মালপত্র সব ষ্টেশনে পড়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে লুটপাট হচ্ছে, কিন্তু সেদিকে কারো লক্ষ্য নেই। বোমার ভয়ে ত্রস্ত মানব আজ মর্ত্যের সমস্ত মায়াময় বিষয়-সম্পত্তি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে।

এমনি করে' যাওয়া অসম্ভব। সজল ষ্টেশন থেকে ফিরে এলো। ট্যাক্সী খুঁজলো, প্রাইভেট্ কার খুঁজলো, বাস্ খুঁজলো, নৌকা খুঁজলো—কোথাও কিছু মিললো না। জলে স্থলের সব যানবাহন আজ বন্ধ। এ পৃথিবীর যাতায়তের গতি যেন সহসা কোথায় কি এক বিরাট বাধায় থেমে গেছে। এখন উপায়! আজকেই চলে' যেতে হবে—কাল পঁচিশে ডিসেম্বর। ভীষণ রব উঠেছে—কাল অবিরল অগ্নিবৃষ্টি হবে; কাল বড়দিন। তা ছাড়া শহরের সমস্ত দোকান, হল, রেস্তোঁরা, অফিস, কাছারী সব বন্ধ। চাল, ডাল কিছুই কিনতে পাওয়া যাচ্ছে না। এখানে তো বেশীদিন দেরী করলে না খেয়ে মরতে হবে। যে ভাবেই হোক আজই শহর ত্যাগ করতে হবে। অতঃপর সজল একখানা লরীর সাহায্য নিলো। তাও খালি লড়ী নয়, কতগুলি ওষুধের বাক্স বোঝাই। তার সঙ্গে চার পাঁচজন কুলী আর ড্রাইভার; লড়ীখানা প্রোম শহরেই যাবে।

সজল অনেক মিনতি করে' একশো টাকা দিয়ে ড্রাইভারকে রাজী করালে। সিন্ধু বৌদির সমস্ত মালপত্র বাসায় পড়ে রইলো। লরীতে জায়গা নেই, ওষুধের বাক্সে ভর্তি। সবাই মিলে লরীতে উঠলো। সজল বললো, ওষুধের বাক্সগুলো শক্ত করে' ধরে' বসো বৌদি!

ড্রাইভার গাড়ী ছাড়লো। সমস্ত গাড়ীটায় একটা ঝাঁকুনি লাগলো। সিন্ধু বৌদি কাঁপতে কাঁপতে পরে শক্ত হয়ে বসলো। খোকা পার্বতীর কোলে। লরীখানা তুফান মেলের মতো ছুটলো প্রোম শহরের দিকে।

পিচ্ ঢালা পরিষ্কার মসৃণ রাস্তা। একশো পঁচাত্তর মাইল। রাত্রি আটটায় এসে প্রোমে পৌঁছলো। ফণিবাবু বাসায় নেই, লাইন ডিউটিতে বেরিয়ে গেছেন।

বাসার চাকর রামনাথ রান্না করলো। খেয়ে শু'তে শু'তে রাত অনেক হয়ে গেলো। এক শয্যায় নব-দম্পতি—পাখী আর সজল। পাখী বললো, সত্যিই বিয়ের আগে আমাদের দু'জনের ভালোবাসার মধ্যে যেন একটু দুর্ব্বলতা ছিলো। আজ তোমাকে যে চোখে দেখছি, তখন কিন্তু সে চোখে দেখিনি। তোমাকে হারিয়ে ফেলবার ভয়েই, হয়তো ভেবেছি—একবার যদি পেতাম, এমনি একটি রাজ-শয্যায়…।

সজল বললো, তখন আমিও তোমার যৌবন-মুকুলিত দেহের দিকে চেয়ে মনে মনে মহাপাপ করেছি। কিন্তু আজ কি মনে হয় জানো—ও দেহ শুধু কামনার দীপশিখা নয়, ও পুরুষ-আত্মার পুণ্য তীর্থস্থান। ও দেহে বিরাজ করছে সৃষ্টির প্রথম উষা-উৎসব। ওই দেহ স্পর্শে পুরুষ-আত্মা শতধা বিভক্ত হয়ে পবিত্র জীবশিশু রূপে ধরায় শতবার জন্মগ্রহণ করে। তুমি জননী। তোমার অঙ্গ—সৃজনের লীলাস্থল।

পাখী বললো, সত্যিই স্বামী স্ত্রীর বন্ধন কত পবিত্র। কিন্তু আজ আমার ভয় করছে—পাছে তোমাকে হারিয়ে ফেলি। শুনেছি, দুর্গম পথ পেঁরিয়ে যেতে হবে আমাদের বাংলা দেশে—সে পথ নাকি ভীষণ। জন মানবহীন; শুধু ঘন বন আর দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়-পর্ব্বত। সে পথে গেলে মানুষ বাঁচে? সে পথে মানুষ যেতে পারে?

সজল বললো, সে পথে মানুষ যেতে পারে না। কিন্তু ভারতীয়েরা যেতে পারে। হাজার হাজার ভারতীয় শিশু পুত্র কন্যা নিয়ে আজ সে পথেই ছুটে পালাচ্ছে। জলপথে ভীষণ সন্দেহ আছে। একটি মাত্র গিরিপথ সংগ্রাম-বিধ্বস্ত—ঘরছাড়া নিঃসহায় ভারতীয়দের জন্য। ভারতবাসীর স্থান আজ বনে-জঙ্গলে, গিরিগুহায়, অতল অন্ধকারে।

যুদ্ধ ওদের—ঘন অরণ্যবাস আমাদের। বোমা ওদের—গৃহহীন-বেদনা মৃত্যু আমাদের। তুমি মরণকে ভয় করছো পাখী? মৃত্যু, ধ্বংস, এতো ভারতবাসীরই বংশপরম্পরা দাবী। ভারতবাসী কি কখনো বাঁচতে জানে?

পাখী অনেকক্ষণ চুপ করে' থেকে শেষে একটা গভীর নিশ্বাস টেনে বললো, War is a great crime। চলো, আমরা এ দেশ ছেড়ে সেই দেশে চলে যাই, যেখানে যুদ্ধ নেই, মানুষের রক্তপিপাসী মূর্ত্তি নেই; যেখানে ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই; বিরহ বিচ্ছেদ নেই, আছে শুধু মানুষে মানুষে প্রেম-সুন্দর পবিত্র মূর্ত্তি।

পরদিন ফণিবাবু এলেন। তাঁর চেহারায় প্রকট হয়েছে ব্যস্ততার এক প্রতিমূর্ত্তি। তিনি ব্যস্ত ও ক্রুতকণ্ঠে বললেন, আর এক মুহূর্ত্তও দেরী করো না। আজই চলে যাও, এই শহর নিরাপদ নয়। আমি যেতে পারবো না, ডিউটী দিতেই হবে; ট্রেণ বন্ধ থাকতে পারে না। হাঁা, সজল গেলো কোথায়?

সিন্ধু স্মিত হাসির রেখা টেনে বললো, পাশের ঘরে বৌয়ের সঙ্গে গল্প করছে—

—তার মানে?

—তার মানে, একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়েছিলো। ভাবলাম: এতো প্রেম নয়, পিপাসা। তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দিলাম, কলঙ্ক রেরুবার আগে। বলেই সিন্ধু ফণিবাবুকে একরকম টেনে নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে বললো, দেখো, মেয়েটা কি সুন্দরী! যেতেই সজল ও পাখী ফণিবাবুর পায়ের ধূলো নিলো।

ফণিবাবু অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললেন, তোকে শক্ত ছেলে বলে জানতাম। জানতাম তুই বিয়ে করবি না। দেহের প্রতি রক্তবিন্দু তুই দান করবি দেশের সর্ব্বহারাদের জন্ত। দরিদ্র কুলীমজুর আর কৃষকদের

জন্ত দিনরাত কাঁদবে তোর প্রাণ। তোকে ছোটবেলা থেকে চিনি—স্কুলে যখন পড়তি, কতবার দেখেছি চাষাদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে সারারাত তোকে কাটাতে। তাদের সঙ্গে কত কি পরামর্শ করেছিস। ভাবতাম, ছেলেটার প্রাণ আছে। তোকে নারীর মোহ পেয়েছে। জীবনের সে আদর্শ আর ঠিক রাখতে পারলি না।

সজল অত্যন্ত ক্ষুণ্ণস্বরে বললো, কেন, বিয়ে করলে কি আদর্শ নষ্ট হয়ে যায়?

—তোর মতো নিঃস্ব আর গরীবের পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক। স্ত্রী পুত্র কি সামান্ত কথা? জীবনের প্রতি মুহূর্তই তাদের অন্তহীন ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পরের ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা ভাববার আর সময় থাকে না।

—কিন্তু নিঃস্ব জীবনের আদর্শের পথে নারীই ঐশ্বর্য্যময় পরম পাথেয় বলে জানি।

—বেশ তাই হোক, কিন্তু যে দুর্গম গিরিপথে এখন যাত্রা করতে চাইছো, সেপথের পাথেয় আছে তো সঙ্গে? বলে ফণিবাবু একটু হাসলেন।

—সজল নীরব।

—তা জানি, টাকা তোর নেই। এই এক হাজার দিচ্ছি, রেখে দে তোর কাছে।

সেদিনই বেলা ছ'টোর সময় সবাই মিলে গ্রাম নদী পার হয়ে দুর্গম পথের উদ্দেশ্যে পথ ধরলো।

পেশীবহুল বলিষ্ঠ দেহ রামনাথ। তার মাথায় চাল, ডাল আর খোকার হর্লিকস্। সিন্ধু ফণিবাবুর জন্ত বার বার চোখ মুছলো। সিক্তকণ্ঠে বললো, হায় ভগবান, যুদ্ধ কি জগতের নারীর চোখে এমনি বয়ে আনে জল। লক্ষ লক্ষ সৈন্তের স্ত্রী পুত্রের অশ্রুসিক্ত মুখ সিন্ধুর চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

বঙ্গোপসাগর। জাহাজে তিল ধরবার স্থান নাই। উঠতে বসতে কারো মাথায়, কারো হাতে, কারো গায়ে পা লাগে। কিন্তু সেজন্য কারো ভ্রূক্ষেপ নেই। অন্য সময় হ'লে হয়তো গালাগালি করতো। কিন্তু আজ কারো মুখে কোন শব্দ নাই; নীরব, নিস্তেজ দেহ-মন সকলের। যেখানে যে পড়ে আছে পড়েই আছে। একটুকু নড়বার শক্তি কারো নাই। দেখলে মনে হয় বহুদিনের রোগী। তার উপর আজ পাঁচদিন ভাতজল কারো মুখে পড়ে নি, সকলের মুখে চোখে মৃত্যুর কালো রেখা। জাহাজ বঙ্গোপসাগরের বুক বেয়ে চলেছে। প্রায় ছ হাজার ইভাকুইজ। পূর্ব্বে এ জাহাজ দু' হাজারের বেশী প্যাসেঞ্জার বহন করতো না; কিন্তু আজ আরো চার হাজার বেশী। আগে একজন প্যাসেঞ্জারের, বসবার যে জায়গা ছিলো আজ সেখানে তিনজনের জায়গা। কাজেই অন্ততঃ দু'জনকে কোনো রকম দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকা যায় কতক্ষণ? পা থরথর করে' কাঁপে, মাথায় টনটন করে। সর্ব্বাঙ্গ ভেঙে নুয়ে পড়ে। তার ওপর নিদারুণ ক্ষুধা। তার ওপর রয়েছে সাবমেরিনের ভয়। সমস্ত জাহাজখানা একটা ভয়ঙ্কর পরিণাম প্রতি মুহূর্ত্তে অপেক্ষা করছে। এ অবস্থায় লোকগুলো যে যেখানে আছে, সেখানেই আছে। শবদেহের মত; সর্ব্বাঙ্গ যেন হিমশীতল ও নিবিড় নিস্তব্ধ। কিন্তু নিস্তব্ধ হয়েই কি থাকা যায়, সমস্ত ডেকের ওপর দিয়ে বন্যার স্রোত চলছে। আকুল সমুদ্রের ব্যাকুল তরঙ্গে জাহাজটা যেন একবার ডুবছে আবার ভাসছে। লোকগুলো এখন সাবমেরিনের ভয়ে কাঁপছে। ক্ষুধায় ধুকছে। জলে ভিজে ভিজে শীতে কাঁপছে। তরঙ্গাঘাতে জাহাজখানাও ক্রমাগত দুলছে। একবার এ পাশ আবার ও পাশ। সাথে সাথে লোকগুলো গড়াগড়ি যাচ্ছে। এ লোকের সঙ্গে ও লোক মিশে যাচ্ছে। বাঙ্গালী, মান্দ্রাজী, মাড়োয়ারী, গুজরাটী, হিন্দু আর মুসলমান—এখন সব এক হয়ে গেছে। সবাই স্বাতন্ত্র্যহীন এক মহা মানবজাতি।

জাহাজে কলেরা দেখা দিয়েছে। যে মরেছে তাকে সমুদ্রে ফেলে দিচ্ছে। সমুদ্রে ডুবে গিয়ে সে যেন এ সংগ্রাম-দলিত বিশ্ব হ'তে অতল অনন্তে মিশে গিয়ে বেঁচে যাচ্ছে। অতল সমুদ্রের শান্তিময় নিবিড় নীরবতা বরং ভালো—পৃথিবীর এ সংগ্রাম-কোলাহল হ'তে।

মুক্তার মা মৃণালিনী দেবী বললেন, মুক্তা, দেখ্ তো আমার পাশে কে একটা লোক শুয়ে আছে? ওর গায়ের গন্ধটা বড্ড বিশ্রী। একটু সরে' বসতে বল।

পাশের লোকটি চট্টগ্রামের মুসলমান। সে বললো, সরে' বসবো কোথায় মা? দেখছেন না, আমার গায়ের ওপরে ক'জন? সরবার কি আর জায়গা আছে? আমি একটু নোংরা থাকি, তাই আমার গায়ে সামান্য গন্ধ।

মৃণালিনীর গা বমি বমি করছে, তার ওপর আজ পাঁচদিন অনাহার। জাহাজে রেশন নাই, মুখে এক ফোঁটা জলও এ পর্যান্ত পড়েনি। আর বসে থাকা যায় না—কোন রকম বিছানা পেতে তিনি শুয়ে পড়েছেন। পাশের মুসলমানটির দিকে একবার ফিরে চাইতেই তাঁর চোখ দু'টী জলে ভিজে উঠলো। সে অশ্রু-বেদনার ভিতর দিয়ে দেখতে পেলো রেঙ্গুনের পার্ক ষ্ট্রীটের ওপর তাঁদের বিরাট রাজভবন, সুসজ্জিত প্রশান্ত কক্ষ। কত কারুকার্য্যখচিত খাট-পালঙ্ক। পাশের দেয়ালে গোলাপী-আভা-বর্ষিত কোমল বিজলী আলোক। স্নিগ্ধ আলোর ঝরণা দুগ্ধফেননিভ শুভ্র সুরভিত শয্যায় বিচ্ছুরিত। এক পাশে শুয়ে মুক্তা, অপর পাশে তার স্বামী উপেনবাবু। কিন্তু আজ তার পাশে এ কে শুয়ে! একদিনের বোমা পাতে, একদিনের সংগ্রাম অত্যাচারে তার জীবনের ওপর দিয়ে বয়ে' চলছে যেন প্রচণ্ড পরিবর্ত্তন। রাজপুত্র স্বামী গেলো, রাজপ্রাসাদ গেলো, রাজশয্যা গেলো।

—মা, একটু জল দিতে পারো। গলা যে শুকিয়ে যাচ্ছে।

মার পাশে বসে মুক্তা। এ ক'দিনের উপবাসে ফুলের মত গায়ের রঙ শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। মুখ চোখের দিকে চাওয়া যায় না। সে কোমল কণ্ঠে বললো, মা, জল কোথায় পাবো, জাহাজের কলটা এখান থেকে অনেক দূরে। এই লোকের ভিড় ঠেলে আমি কি যেতে পারবো; আমার শরীর থর থর করে' কাঁপছে।

পাশে উপবিষ্ট মুসলমানটি এ কথা শুনে নিজের হাত মুখ ধোবার টিনের মগটা নিয়ে উঠে গেলো। জাহাজ অনবরত দুলছে, মুসলমানটি পা ঠিক রাখতে পারছে না। বার বার পড়ে' যাচ্ছে, কারো গায়ে পা লাগছে, কিন্তু গায়ে পা লাগা তখন কারো প্রশ্ন নয়। বড় প্রশ্ন তখন পেটের দারুণ ক্ষুধা। বড় প্রশ্ন সাবমেরিন। ভাবনা তখন অসীম কালো সমুদ্রের বুকে জীবন-বুদ্বুদের কথা।

মুসলমান ভদ্রলোকটি জল নিয়ে এসে মুক্তার হাতে দিয়ে বললো, তোমার মাকে জল দাও।

মৃণালিনী জল দেখে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, মরতে চলেছি মরবোই, এর হাতের জল! যার গায়ে এতো দুর্গন্ধ! তাও আবার টিনের মগে। এ জল কিছুতেই খাবো না। ছিলাম রাণী, এখন না হয় ভিখিরী হ'তে চলেছি, তা' বলে' কি যার তার জল খাবো?

মুক্তা জলের মগটি তুলে' ধরে' নিজেই একটু জল খেলো, দারুণ পিপাসায় তারও বুক শুকিয়ে গেছে। জল খেয়ে একটু তৃপ্তকণ্ঠে বললো, আঃ কি আরাম! কি শান্তি! তারপর বললো, মা, মাষ্টার-মশায় বলতেন—সব মানুষ সুন্দর। মানুষকে ঘৃণা করতে নেই, তুমিও আর দু' দিন না খেয়ে থাকো, দেখবে তোমার গায়েও দুর্গন্ধ জমে' উঠবে এর মতো। এরা কুলীমজুর শ্রেণীর লোক, ছোট জাত, চির দরিদ্র, চির রুগ্ন, না খেয়ে খেয়ে এদের শরীরে নানা ব্যাধি জম্মে, দুর্গন্ধ

জন্যে ; নইলে আসলে এরা সত্যি সত্যিই আমাদের মতো সুন্দর মানুষ, আমরা সবাই এক মানবজাতি, কেউ দুর্গন্ধযুক্ত নয়। এর হাতের জল তুমি অনায়াসে খেতে পারো মা, এ মুসলমান নয়, মানুষ।

মৃণালিনীর দু' চোখ জলে ভরে' উঠলো। তিনি বললেন, মাষ্টারমশায়ের ওপর অন্যায় ব্যবহার করেছি, ওকে তাড়িয়ে দেওয়াটা ঠিক হয়নি। লোকটার হৃদয় এত উঁচু তা' বুঝতে পারিনি। সত্যিই আজ আমরা এ বঙ্গোপসাগরের বুকে, সমাজহীন, সংসারহীন, রাষ্ট্রহীন এক পরম পবিত্র মানব জাতি। বলে' মুক্তার হাত থেকে জলের মগটা নিয়ে জল খেলেন। তারপর বললেন, মানুষই সত্য, জাতিটা একটা মিথ্যা সামাজিক আবরণ।

পর্ব্বতের পর পর্ব্বত, গুহার পর গুহা, অরণ্যের পর অরণ্য। অন্তহীন অন্ধকারাচ্ছন্ন একটুকু পার্ব্বত্য পথ সাপের মত এঁকেবেঁকে ঘুরে' গুহার অতল তলে নেমে গেছে, আবার সোজা হ'য়ে খাড়া ওপরে উঠে একটা গহন অরণ্যের ভিতর দিয়ে পার হয়ে গিয়ে আবার আর একটা পাহাড়ের গা ঘেঁষে পথ চলেছে কোন সুদূরে। পা আর চলছে না, পায়ে ব্যথা ধরে' গেছে, সর্ব্বাঙ্গ ব্যথায় নুয়ে পড়ছে যেন ; তবু পথ ফুরোয় না। মনে হয় এ পাহাড় পার হয়ে ওধারে গিয়ে পড়লেই এ পথের একটা কূল-কিনারা পাওয়া যাবে। এমন অনিশ্চিত অজানা গিরিপথে আর ক'দিন হাঁটা যায়। আজ সতেরো দিন গত হ'তে চললো এ পথে বেরিয়েছে ; কত পাহাড়, কত অরণ্য, কত গিরি-গহ্বর পিছনে পড়ে' রইলো কিন্তু তবু পথ ফুরোয় না। একটা পর্ব্বত পার হ'তে না হ'তেই আর একটা পর্ব্বত সম্মুখে দাঁড়ায়। একটা অরণ্যের অন্ধকার পিছে ফেলে আসতে না আসতেই আর একটা অরণ্য-অন্ধকার সামনে এসে ভয়াবহ কালো আবরণ নিয়ে দাঁড়ায়। এমনি করে' দিনের পর দিন গিরি

আর অরণ্য পথ অতিক্রম করে' চলতে হচ্ছে। পথের যেন শেষ নাই, এ পথের যেন আদি অন্ত নাই ;—একটানা চলে' গেছে কোন অন্তহীন সুদূরে। পথের প্রতি বাঁকে দাঁড়িয়ে বলতে ইচ্ছা হয়—আর কতদূর ? ঘন অরণ্য হ'তে শুধু মর্মরধ্বনি আসে। পথিকদল, হেঁটে চলো। নয় নিঃস্ব পথিক, ভয় পেয়ো না।—তোমাদের এ যাত্রাপথের শেষ আছে, কিন্তু বহুদূরে। এগিয়ে চলো সম্মুখপানে, অক্লান্ত গতিতে, অক্লান্ত হৃদয়ে। কিন্তু হৃদয়ে ক্লান্তি অবসাদ ঘনীভূত হয়ে আসছে, আর চরণ চলে না। পাখী পথের ওপর বসে' পড়ে' বললো, আর পারি না।

সজল সবার আগে চলেছে। মাথায় তার গুজরাটী টুপী, গায়ে পাঞ্জাবী, তার ওপরে জহর কোট, পরণে মোটা ধুতি, পায়ে ক্যানভাসের কালো পাম্‌সু। শিঙ্কু বৌদির ছেলেটি তার কোলের ওপর। পাখীর কথা শুনে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে কোল থেকে ছেলেটিকে পথের ওপর নামিয়ে কাতর মলিন চোখে পাখীর দিকে চাইলো। পাখী সজলের দিকে চেয়ে আবার বললো, আর পারি না। সজল শুধু নীরব। মনে মনে বললো—নিশ্চিত মরণ-পথের যাত্রী হয়েছি, না পারারই কথা। কেন ওকে এ পথে টেনে নিয়ে এলাম এ জনমানবহীন গিরি-অরণ্যের বুকে ? ও কি জানতো মানুষের পায়ে হাঁটার পথে থাকবে এত দুঃখ, এত বেদনা। মানুষ যে পথে পায়ে হাঁটে সে পথ থাকে সাধারণতঃ নম্র, স্নিগ্ধ, কোমল, ছায়াশীতল কিন্তু এ পথ কি মানুষের পথ ? এ পথে কি মানুষ চলে ? এ পথ শ্বাপদ-সঙ্কুল ; এ পথ অরণ্য কণ্টকাকীর্ণ, গিরি-বন্ধুর—এ পথে কেন ওকে নিয়ে এলাম ? কেন নিয়ে এলাম ওকে মরণের মুখে ? সজলের চোখে মুখে নানা প্রশ্ন জাগে।

রামনাথ মাথা থেকে চাল ডালের বোঝা নামিয়ে পথের পাশে পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে বসে' ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে বললো, বাবু, মাথার

বোঝা তো হাল্‌কা হয়ে গেছে; চাল ডাল যা আছে, আর দু' চারদিন হয়তো চলবে, তারপরে কি হবে? পথের কোন শেষ পেলেন কিছু? পথ চলতে চলতে পাহাড়ের ওপরে উঠে যখন পথের শেষ খুঁজতে গিয়ে চারদিকে তাকাই, তখন দেখি শুধু পাহাড় আর জঙ্গল। কোথাও যেন এর শেষ নেই বাবু! জেনে শুনে এমন পথে মরতে এলেন কেন? আর যে চল্‌তে পার্‌ছি না।

সজল বললো, আশায় বুক বাঁধো; এ পথেরও শেষ আছে।

সিন্ধু বৌদি অনেক পিছনে, তাঁর পা আর চলে না। পথশ্রমে ক্ষীণ হয়ে গেছে তার চেহারা, চরণের গতিও তদ্রূপ। হাঁটতে হাঁটতে বার বার পথের ওপর বসে' পড়েন। সজল তাঁর দিকে চেয়ে বললো, বৌদি, তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসো।

সিন্ধু কাতর কণ্ঠে বললো, আর পারি না ঠাকুরপো, আর পারি না—এ পথে এলে কেন?

সজল অপরাধীর মতো চুপ করে' থাকে। এর উত্তরে কোন কথা বলাও যেন অন্যায়। সেও কি জানে—এ পথ এমনি ভয়াবহ মৃত্যু-আশঙ্কায় ভরা।

দুর্জ্ঞেয়, দুর্গম, বন্ধুর গহন-অরণ্য-অন্ধকারে লুপ্ত চন্দ্র-সূর্য্য-তারা। সজল শুধু সমুখের চার পাশের গুহা, অরণ্য, গিরিশ্রেণীর দিকে চেয়ে নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ভাবে: মৃত্যুর রূপ পরা এ কি ভয়াবহ দৃশ্য! কোথায় এলাম? কোথায় চলছি? সজল শুষ্ক নেত্রে একবার চারদিকে চেয়ে দেখে, দৃষ্টি যেন তার আহত হয়ে বার বার ফিরে আসে। যেখানে পথের ওপর দাঁড়িয়েছে তার পাশে অতল গভীর গুহা। গুহার তলদেশে এতটুকু ছোট ছোট আগাছার বন; হয়তো বাঘ ভল্লুকের গুপ্ত আবাসস্থল। পাশ দিয়ে একটা ঝরণার রেখা, স্বচ্ছ শীতল জলের প্রবাহ সে ঝরণায় নাই, হয়তো কোনোদিন ছিলো, আজ

শুষ্ক বালুর তপ্ত উচ্ছ্বাসে ভরা। সূর্য্যের আলো গাছের ফাঁকে ফাঁকে নেমে এসে বালুর ওপরে পড়েছে; মনে হচ্ছে শুভ্র আগুন জ্বলছে সমস্ত ঝরণার পথরেখা দাহন করে'। সেদিকে চাইলে চক্ষু জ্বলে' যায়, চোখে জল আসে, ঝরণার দু'পাশে বন-জঙ্গল জ্বলে' পুড়ে' গেছে, আগুনে পোড়া ঘরবাড়ীর মতো কালো ভয়াবহ দৃশ্য। পথের ডান পাশের দৃশ্য আরো ভয়াবহ! বিশাল বন্ধুর উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী আকাশ ঠেকা, ঘাড় বাঁকা করে' অনেক ওপরের দিকে চেয়েও পাহাড়ের শিরোদেশ দেখা যায় না, দেখা যায় শুধু বিশালকায় বৃক্ষশ্রেণী: বিশালদেহী লতাগুল্ম, নাম-না-জানা বহু তরুলতার বন, পাহাড়ের গা বেয়ে ধূসর শিরোদেশ পর্য্যন্ত উঠে গেছে, কোথায় তার শেষ কে জানে? কিন্তু এ পাহাড়ের দৃশ্য আরো প্রাণ কাঁপানো। পাহাড়ের তরুলতাগুলোও রোদের তাপে পুড়ে' ছাই হ'য়ে গেছে। ডালপালাহীন তরুশ্রেণী পাহাড়ের গায় দাঁড়ানো মহা শ্মশানের আতঙ্কময় দৃশ্য। সত্যই কি মহাশ্মশানের লীলাভূমি এ পর্ব্বত-অরণ্যপ্রদেশ? এ মহাশ্মশানের ভিতর দিয়ে পথ বেয়ে যেতে হবে? সজলের বুকটা দুরু দুরু করে' ওঠে! মনে হয় আর এগিয়ে কাজ নেই, ফিরে চলে যাই রেঙ্গুন। কিন্তু পিছনে ফেলে-আসা পথও প্রায় শ'খানেক মাইল। এখন দেহে সে শক্তি-সামর্থ্য নেই, চরণের গতি এখন শিথিল, ধীর, মন্থর ব্যাধিপীড়িত রোগীর মত, কিন্তু সম্মুখের পথও আর কতদূর কে জানে? সজল যেন দিগন্তহীন শুষ্ক সাহারা অতিক্রম করছে। আজ সতেরো দিন যাবত এ গিরিপথ ধরে' চলছে, এ সতেরোদিনের মধ্যে সারা পথে কোথাও এতটুকু স্নিগ্ধ-শীতল ছায়া মিলে নাই, মিলেছে শুধু তৃষিত, ক্ষুধার্ত্ত পাষাণ পাহাড় আর তৃষিত ক্ষুধার্ত্ত লক্ষীছাড়া ঘন অরণ্য গিরি-গহ্বর। আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি সে কোনদিন দেখেনি কিন্তু আজ তার মনে হচ্ছে সমস্ত সাহারা প্রদেশ তার চরণতলে দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে। সজল ভাবলো—পৃথিবীময়

আজ একই ভস্মরাশ বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্বতে, সভ্য শহরে, সভ্য মানব সমাজে। শিক্ষা দীক্ষা, মানবসমাজ, মানব অনুষ্ঠান, ভদ্রতা, সভ্যতা, আচার, রীতিনীতি, জ্ঞান বিজ্ঞান, কৃষি শিল্পকলা সব যেন এক মহা ভস্মে পরিণত। সব যেন স্বপ্ন, মিথ্যা। মানুষ আজ মানুষের কাছে ঘৃণিত, অবহেলিত, অপমানিত। কিন্তু গড়ে' তুলতে হবে বাঞ্ছিত মানুষ, বাঞ্ছিত শিক্ষা, সভ্যতা ও সমাজ। সজল আবার নূতন আশায়, নবীন উৎসাহে মানবসমাজের নব রূপ-পরিকল্পনায় মেতে ওঠে! কি যেন গোপন আনন্দে বুকের রক্ত উষ্ণ হয়ে ওঠে! এ পথের অপরিমেয় বেদনার মাঝেই ফিরে পায় পথ চলার পরম আনন্দ। সিন্ধু এবং পাখীর দিকে নূতন দৃষ্টিতে চেয়ে বলে, ভয় নেই বৌদি, ভয় নেই পাখী,—আমরা যে পথে চলেছি এ পথ নূতনের পথ, এ পথ পার হয়ে নিজের দেশে গিয়ে গড়ে' তুলবো নূতন মানুষ, নূতন মানব-সভ্যতা, নূতন সমাজ। এ পথ আমাদের বেদনার নয়, মহা আনন্দের। তারপর রামনাথকে বললো, রামনাথ, শীগগির রান্নার আয়োজন করো, খাওয়া-দাওয়া করে' শরীর তাজা করে' নেবো, আর হাঁটা যাচ্ছে না।

রামনাথ বললো, কিন্তু জল কোথায়? রান্না করবো কি দিয়ে? আজ দু' দিন যাবত পথে জল নেই।

সজল স্তব্ধ, নীরব, নিস্পন্দ। সত্যই এখানে জল কোথায়? ঐ ঝরণাটা শুষ্ক, ওটা থেকে শুধু বালুর বহ্নি-নিশ্বাস আসছে। আজ দু' দিন ধরে' কারো মুখে এক ফোঁটা জল পড়েনি, খাওয়াদাওয়া তো দূরের কথা। ক্ষুধার চেয়ে অসহ্য তৃষ্ণা সকলের বুকে, বুকের ভিতর যেন জলন্ত সাহারা জলছে। এতক্ষণ সকলেই নীরবে তৃষ্ণা বেদনা সহ্য করে' ছিলো। মনে করেছিলো সামনে নিশ্চয় কোনো ঝরণা আছে, সেখানে জল পাওয়া যাবে, শুষ্ক মরু বক্ষ সিক্ত শীতল করা যাবে, রান্না

করে' খাওয়া যাবে; পরে আবার পথ চলবে। কিন্তু রামনাথ যেই বললো, জল কোথায় অমনি সকলের মুখ শুকিয়ে গেলো। ক্ষুধা সহ্য করা যায়, কিন্তু তৃষ্ণা মৃত্যু-দাহনে ভরা। সকলকে নীরব থাকতে দেখে রামনাথ নিজেই বললো, আচ্ছা আমি নীচে নেমে দেখে আসি, ঐ ঝরণাটার কোথাও এতটুকু জল পাওয়া যায় কিনা! বলে' রামনাথ রান্না করার টিনের হাঁড়িটা নিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে ধীরে ধীরে ঝরণার উদ্দেশ্যে নীচে নামতে লাগলো। নীচে নামবার কোন পথ নেই; শুধু বন-জঙ্গল, তরুলতা ও আগাছার শুক্‌নো ঝোপ। তারই ভিতর দিয়ে আঁকা-বাঁকা হয়ে শরীরের ভার ঠিক রেখে পথ করে' নিতে হচ্ছে। সোজা নীচের দিকে নামতে হচ্ছে। যত নীচের দিকে নামে ততই অন্ধকার বলে' মনে হ'লো; মনে হয় রামনাথ যেন কোন পাতালপুরীতে প্রবেশ করছে। হয়তো কোনো বিশাল গভীর গুহার অন্ধকার পথে সে নেমে যাচ্ছে; হয়তো সে গিরি-গহ্বরে বাঘ ভল্লুকের আবাস স্থান। কিন্তু রামনাথের সে জন্ম কোনো ভয় ভাবনা নেই। বাঘ আজ রামনাথের কাছে সামান্য অতি তুচ্ছ; জল পাওয়ার প্রশ্নই এখন বড়। জল পেতেই হবে। তৃষিত মরু বক্ষ শীতল করতেই হবে। তারপর আবার চলতে হবে পথ—এমনি ঘন অরণ্যের ভিতর দিয়ে পাষাণ-গিরি ভেদ করে'। তারা আজ যাত্রী; বিপদ-সঙ্কুল পথের যাত্রী। তারা পলাতক পথিক। তারা নিঃস্ব, নিঃসহায় ভিখারী পথিক। বিশ্বের সভ্য সমাজ থেকে তারা আজ বিতাড়িত, সংগ্রাম পিপাসী, ধ্বংসকামী বিশ্বের সভ্য মানব আজ তাদের তাড়া দিচ্ছে পিছন থেকে। তাই তারা আজ কাঙাল, ইতাকুইজ সেজে ঘন অরণ্যের ভিতর দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে। তাদের জন্য আজ সভ্য জগতের কারো এতটুকু নাই দয়া মায়া। মানুষের জন্য মানুষের আজ এতটুকু ঝরে না চোখের জল। মানুষ তুচ্ছ, ঘৃণিত—আজ সংগ্রামই শ্রেষ্ঠ।

প্রায় এক মাইল পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে নেমে রামনাথ শেষে ঝরণা পেলো ; কিন্তু শুষ্ক, বালুর তপ্ত স্তূপ। রামনাথের চোখে জল এলো। উপায় ? জল না হ'লে চলবে না, কিছুতেই চলবে না। আমরা মানুষ, আমরা নিঃস্ব ইভাকুইজ: আমরা মানব সমাজ হ'তে তাড়িত হ'তে পারি, বোমায় ক্ষত-বিক্ষত হ'তে পারি। যুদ্ধ শিকারী কুকুরের মত আমাদের পিছনে পিছনে ধাবিত হয়ে তাড়া দিতে পারে ; কিন্তু প্রকৃতি মায়ের বক্ষরস থেকে আমরা বঞ্চিত হ'তে পারি না। নিশ্চয়ই অরণ্যের অভ্যন্তরে এক ফোঁটা জল আমাদের শুষ্ক বুকের জন্য লুকিয়ে থেকে টলমল করছে। মানুষ মানুষকে বঞ্চিত করতে পারে, আহত করতে পারে, নিহত করতে পারে, কিন্তু এ প্রকৃতি-জননী পৃথিবীর মানবসন্তানের জন্য গোপনে ঢেলে দেয় তার বক্ষসুধা শীতল জল। রামনাথ ঝরণার রেখা ধরে' ধরে' গভীর গিরি-গহ্বরের দিকে এক পা দু' পা করে' অগ্রসর হ'তে লাগলো। যত এগিয়ে যায় গুহার অন্ধকার, অরণ্যের বিভীষিকা ততই যেন ঘনীভূত হয়ে আসে। সহসা বুকটা আবার ভয়ে কেঁপে ওঠে, সহসা চরণের গতি থেমে যায়। কিন্তু জল চাই, আবার সে এগিয়ে চলে। যত নীচের দিকে যায়, সমস্ত শরীর স্নিগ্ধ অন্ধকারে যেন জুড়িয়ে যায়। আদি পৃথিবীর মানুষ সত্যই সুখী ছিল এ গিরি-গহ্বরে। বর্ত্তমান সভ্যতার উগ্র মানব চোখের আড়ালে এ পাতাল পৃথিবী সত্যই সুন্দর স্নিগ্ধ।

আরো এগিয়ে এসে রামনাথ জল পেলো। ঝরণা সত্যই শুকিয়ে গেছে। কিন্তু অতল গুহায় পাষাণ-গাত্র বয়ে' জল পড়ছে। রামনাথ হাড়িটায় জল তুলতে গিয়ে সহসা থমকে দাঁড়ালো সমস্ত বুকটা তার থর থর করে' কেঁপে উঠলো, একি ভয়ঙ্কর দৃশ্য ! মড়া ! মৃত-দেহ ! মানুষ ! আমাদের মত চারজন ইভাকুইজ ! সংগ্রাম ও বোমা-বিতাড়িত চারজন পলাতক পথিক ! মাদ্রাজী কুলী না ? হাঁ,

তাইতো দেখতে পাচ্ছি। বিশ্বের সভ্য সমাজের ভূলুণ্ঠিত পদদলিত এরাই। এদের এমন শোচনীয় মৃত্যু না হ'লে আর কাদের হবে? হায় ভাই, মৃত পথিকদল! তোমাদের মৃতদেহ আজ বিশ্বের আড়ালে পতিত। জীবিত অবস্থায় কেউ তোমাদের পানে চেয়ে দেখলো না। আজ মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছো মানবসভ্যতার তপ্ত অবজ্ঞায় বহু দূরে—এই গিরি-গহ্বরে। জননী বসুন্ধরা তার গুপ্ত বক্ষে তোমাদের মৃতদেহ গভীর স্নেহে কোলে তুলে নিয়ে বসে আছে এ নিভৃত নির্জ্জনে। প্রকৃতি মায়ের অশ্রুই আজ শুধু ঝরছে তোমাদের জন্ত। চেয়েছিলে জল, নেমে এসেছো এ পাতাল অন্ধকারে। পেয়েছো জল, লভেছো শান্তি চিরনিদ্রায়।

রামনাথ গুহা-গাত্রের পাষাণ স্তূপে হাঁড়িটা ধরলো। পাষাণ ভেদ করে' কোথা থেকে জল নেমে আসছে। এক হাঁড়ি জল নিয়ে রামনাথ আবার ওপরে উঠে এলো। বললো, বাবু, মড়া!

সজল শিউরে উঠে বললো, কিসের মড়া?

রামনাথ বললো, আমাদের মতো চারজন ইস্তাকুইজ কুলীমজুর পিপাসায় জল খেতে গিয়েছিলো, জল খেয়ে আর উঠে আসতে পারেনি।

সজল দীর্ঘ নিশ্বাস টেনে বললো, বিশ্বের অবজ্ঞাত এ জাত! মড়ার কথা শুনে' সিন্ধু বৌদি যেন ভয়ে কেমন হয়ে গেলো। পাথের ওপর থেকে ছেলেকে কোলে তুলে নিলো। দেহে ও মনে যতটুকু শক্তি ছিলো কোথায় যেন হারিয়ে গেলো।

—কাদের মড়া গো ঠাকুরপো?

সজল বললো, যাদের কেউ নেই, ঐ কুলীমজুরদের।

পাখী বললো, ঐ মড়াগুলো তুলে' আনতে পারো এখানে? দেখতে ইচ্ছা করে।

সজল বললো, জীবন থাকতে যাদের দিকে চেয়ে দেখেনি কেউ, তাদের মৃতদেহ দেখে তোমার কি দরকার ?

পাখী বললো, হিন্দু হ'লে চিতা কেটে পোড়াবো আর মুসলমান হ'লে কবর করে' মাটী দেবো।

সজল বললো, এ মড়াগুলোর জন্য তোমার এত দরদ কেন ? মানুষ মরে' গেলে তার দেহে থাকে কি ? তার জন্য এত মায়া কেন ?

পাখী বললো, যে দেহে বাস করে দেবশক্তিসম্পন্ন মহা-জ্যোতির্ময়, পরম অবিনশ্বর আত্মা—সে দেহ একেবারে অর্থশূন্য নয়, সে দেহ এ ভাবে পথের ধারে নির্জন গিরি-অরণ্যের ভিতর পড়ে' থেকে এমনি পচে-গলে' যাবে ?

সজল বললো, আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ সংগ্রাম-পীড়িত হয়ে বোমার নীচে পড়ে নিহত হচ্ছে, তাদের মৃতদেহস্তূপ আজ বড় বড় সভ্য শহরের পথে ঘাটে, অতল সমুদ্রে। কে তাদের পোড়ায়, কে তাদের দেয় কবর ? মানুষের পচা গন্ধে সমস্ত পথ ঘাট, শহর বন্দর আজ দূষিত। যে পৃথিবীতে জীবিত মানুষের প্রতি নেই এতটুকু দয়ামায়া সে পৃথিবীর মৃতদেহের কথা কে ভাবে ?

পাখী চিন্তিত হয়ে ওঠে। কি যেন বিদ্রোহে দেহের রক্ত দুলে' ওঠে তার। পরম পবিত্র এ মানব ; সে মানবদেহ নিয়ে আজ বিশ্ববাসী ছিনিমিনি চলছে। সে মানবের পচা গন্ধে সমস্ত আকাশ বাতাস দূষিত। তবু সংগ্রাম ? তবু যুদ্ধ ? পাখী গভীর বেদনায় ব্যথিত হয়ে শুধু দীর্ঘনিশ্বাস টানে—War is a great crime.

রামনাথ পাহাড়ের গা থেকে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে। পাহাড় থেকে পাথর খুলে' উনুন করে' পথের ওপর রান্না করলো। সামান্য চাল ডাল একত্র অল্প জলে সিদ্ধ করলো। পেট ভরে' জল খেয়ে ক্ষুধা

কমিয়ে, সকলে এতটুকু করে' চাল ডাল সিদ্ধ খেলো। জলের অভাবে উচ্ছিষ্ট হাত মুখ নিজের কাপড়ে মুছে নিলো।

জলের অভাবে সামান্য জল দিয়ে হরলিক্স্ তৈরী করে' সিন্ধু তার ছেলেকে খাওয়ালো। ছেলেটার ক্ষুধা তা'তে এতটুকু কমলো; ঘন ছোট্ট শিশু, বার বার হাঁ করে' অনিবৃত্ত ক্ষুধার কথা জা'নিয়ে আবার গভীর স্নেহের স্পর্শে সিন্ধু বৌদির চোখে এলো জল। নিজের পিছনে শুষ্ক স্তন খোকার মুখে দিলো। সজলের

জীবনের সব কিছুর শেষ আছে। কিন্তু এ পথের যেন শে[illegible] সিন্ধুর সম্মুখের অতিকায় কালো পাহাড়ের দিকে চেয়ে সকলে শঙ্ক চলতে চলতে থমকে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে চরণের গতি থেমে ওঠে। সবার। সবাই স্তব্ধ চোখে বিবশ অঙ্গে থমকে' দাঁড়ালো। পাহাড়ের গা বেয়ে চারিদিক আঁকা বাঁকা হয়ে ঘুরে পথ ওপরের দিকে উঠে গিয়েছে। এ পথ পার হয়ে যেতে হবে। কিন্তু তা কি সম্ভব! এ পথে পিছে যে ভয়ানক! এত উঁচুতে পথ উঠে গেছে! এত সর্পিল আঁকাবাঁকা। গতি! দু' পা সমান সমান ফেলে এ পথ পার হওয়া কি সম্ভব দেহের অসম্ভব হ'লেই বা উপায় কি? যেতে যে হবেই। গিয়ে পাহাড়ের হয় তাই করতে হবে। কারণ এখানে কোন মানব-আবাস নাই— পথিকের জন্য এমন কোন পান্থ-নিবাস নাই যেখানে দু' চারদিন শুয়ে-বসে' বিশ্রাম করে' শরীরের মৃত্যু সম ব্যথা কিছু কমিয়ে পথ ধরবে। এই গভীর গহন অরণ্য, এই অভ্রভেদী পার্ব্বত্য মরু-প্রদেশ, এই বিশ্ব বিহীন নির্জ্জন পাষাণ গিরিমূলে দু' মিনিট বিশ্রাম করার সময় নাই। তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে পারলেই হয়তো কোনদিন এ পথের কূল-কিনারা পাবে; নচেৎ মৃত্যু অনিবার্য্য। সে মৃত্যুর কথা মনে পড়লে তো গা ছম ছম করে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে পিছে ফেলে-আসা ঐ গিরি-গহ্বরে নিক্ষিপ্ত মৃতদেহগুলির কথা। মৃত্যু হবে

এমনি ভয়াবহ, এমনি ভীষণ বিভীষিকাময়। নির্জন গিরিগুহার তাদের অন্ধকারে গলিত, স্খলিত, পচা দেহমাংস নিয়ে বন্য পশু করবে টানাটানি। সজল পিছন ফিরে পাখী ও সিন্ধুর দিকে চেয়ে বললো, হ'লে [...] পথ অত্যন্ত ভীষণ, অতি সাবধানে চলতে হবে। পা একটু সজল [...]নে ফেললে অতল গুহায় পড়ে' গিয়ে জীবনের শেষ নিশ্বাস মানুষ মধ্যে[...]বে রক্তাক্ত দেহে। খুব সাবধানে পা ফেলে আমার পিছু পিছু কেন? [...]সা। বলে' সজল আবার পথ ধরলো।

পাখী বললো, খোকাকে এবার তুমি নাও, আমি আর পারছি না [...]না। নিজের দেহভার ক্রমশঃই নিজের কাছে অসহ্য হয়ে উঠছে। সে দেহ [...]নাথ সকলের পিছনে, বিরাট শক্তিশালী রামনাথ। ও এখন এমনি প[...]ারলে বাঁচে। বললো, মাথায় সামান্য চাল ডাল আছে, শত সজল[...]য়ে বাঁচতে পারলেও যখন এ পথে আর বাঁচবার সম্ভাবনা নেই নীচে প[...]র এ বোঝা বয়ে বয়ে সারা হয়ে কি লাভ? বোঝাটা মাথা শহরের প[...]লে অনেকটা হালকা হয়ে নিই বাবু, না খেয়ে মরি সেও দেয় করব? এ বোঝা আর সহ্য হয় না। মরণ যার ঘনিয়ে আসছে সে কি মূষিক। [...]টাকাপয়সার কথা ভাবে?

সে প[...]সজল স্তব্ধ, আশাহীন, ভাষাহীন চোখে রামনাথের দিকে চেয়ে থাকে; কোন কথা বলতে পারে না। রামনাথের ভীষণ ভয়াবহ প্রশ্নে ভয়ার্ত হৃদয়ে পাষাণ পাহাড়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে বার বার চায়, নীরব নিস্তব্ধ গিরিরাজ শুধু অট্টহাস্য করে' সজলের সে চাহনির পানে চেয়ে থাকে যেন। সজল ক্ষণকাল চুপ করে' দাঁড়ায়, দাঁড়িয়ে মাথা উঁচু করে' সোজা ঊর্দ্ধ আকাশের পানে চায়। আকাশ ভালো করে' দেখা যায় না। উদার অনন্ত দিক্‌দিগন্ত প্রসারিত আকাশ এখানে কোথায়? পায়ের নীচে সরু এতটুকু রাস্তার মতোই সুদূর পারের আকাশ এতটুকু সরু রেখার মত দেখা যায়। বিশাল তরুশ্রেণী আচ্ছাদিত পথের দু' পাশ।

সে তরুশ্রেণী গহন অরণ্যের ভিতর দিয়ে আকাশ মাত্র এতটুকু দেখা যায়। সজল আকাশের পানে চেয়ে দেখে, কোথায় তারা? সন্ধ্যা হয়ে গেছে—তবু তারা নাই কেন? সুদূরের এতটুকু আলোও যেন আজ তার কাছে কত ভালো লাগে। কিন্তু আকাশে একটিও তারা নেই, ঘন ঘোর অন্ধকার আকাশ; ঘন ঘোর অন্ধকার এপথ। সজল আবার চলতে থাকে। আবার পাখী, সিন্ধু আর রামনাথ সজলের পিছনে পিছনে পা বাড়ায়। আবার পাখী ও সিন্ধুর শুষ্ক মরু-বক্ষের নিশ্বাস-ধ্বনি সজলের কাণে প্রবেশ করে। প্রতি পদক্ষেপের গতি-বেদনায় পাখী আর সিন্ধুর বক্ষ হ'তে মৃত্যুশ্বাস বেরিয়ে আসে, সে শ্বাসের মর্ম্মভেদী করুণ শব্দ সজলের কাণে প্রবেশ করে' সজলের সর্ব্বাঙ্গ ভীতি-বিহ্বল হয়ে ওঠে। দু'টী নারী-হৃদয়ের ব্যথিত ক্রন্দনধ্বনি যেন সে শুনতে পায়, সহসা মুখ ফিরিয়ে পিছন দিকে চেয়ে দেখে সন্ধ্যার কালো ছায়ায় যেন মিশে গেছে দু'টী নারী। ছায়ামূর্ত্তির মতো পাখী ও সিন্ধু পিছে পিছে তাকেই অনুসরণ করে' পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠে আসছে। সোজা নির্ভর হয়ে হেঁটে নয়, সোজা দাঁড়িয়ে হাঁটবার মতো দেহের শক্তি এখন কারো নেই। কয়লার মত কালো পাথর খণ্ড পাহাড়ের গাত্র ভেদ করে' পথের ওপর এসে ঝুঁকে পড়েছে। পাখী ও সিন্ধু সে পাথর খণ্ড ধরে' ধরে' এ পাশে ও পাশে বার বার দুলে' দুলে পথ এগিয়ে আসছে। পাথরখণ্ডগুলো বরফের মত ভয়ানক ঠাণ্ডা—আঙুল দিয়ে বেশীক্ষণ ধরে' রাখা যায় না। বরফ স্পর্শে সমস্ত হাত যেন অবশ হয়ে ওঠে। অমনি ওরা তাড়াতাড়ি পাথর ছেড়ে দিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু অনির্ভর হয়ে দাঁড়াতে গেলে অমনি আবার মাথায় ঘুর্ণি লাগে, চোখে অন্ধকার দেখে, পা দু'টো কেঁপে ওঠে, বাঁ পাশের অতল গুহায় পড়ে যেতে চায়।

সজল অনেকখানি এগিয়ে গেছে। কাঁধের ওপর সিন্ধু বৌদির খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে। সজল খোকার নিদ্রিত চোখের দিকে চেয়ে

ভাবলো: হায় অবোধ শিশু, তোমার ঐ মুগ্ধ চোখের আলো কত নির্মল, কত পবিত্র, কত স্নিগ্ধ শীতল! কিন্তু সংগ্রামরত সভ্য পৃথিবীর কঠোর আঘাতে যে তোমার ওই নয়নের আলো ক্রমেই কালো হয়ে আসছে; সে খবর তুমি কিছুই বুঝলে না। হায় অবোধ শিশু, ঘুমোও, ঘুমোও। বিশ্বের রজনী যে গভীর হয়ে আসছে, ঘুমোও। চোখ বুঁজে থেকে মানব-পৃথিবীর নৃশংসতার কথা ভুলে যাও, ভুলে যাও এই ধরার সব কিছু আধুনিকতার কথা। অতি পুরাতন পৃথিবীর বিশুদ্ধ আলোক ফুটে উঠুক তোমার দেহে প্রাণে—এ দু'টী সুপ্ত শান্ত নয়নে।

সজল পথ চলছে ধীরে ধীরে। অন্ধকারে আগু-পিছু কিছুই দেখা যায় না। সজল দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে চেয়ে ডাকলো, পর্ণী! গৌরী! রামনাথ! কোথায় তোমরা? তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসো, এ দিকটায় পথ একটু ভালো।

পিছনে বহু দূর থেকে রামনাথ সাড়া দিয়ে বললো, একটু দাঁড়ান, আমরা অনেক পিছিয়ে পড়েছি।

সজল দাঁড়ালো না। সামনের পথ বোধ হয় সমতলভূমিতে নেমেছে, আর একটু এগিয়ে গিয়ে সেখানে দাঁড়ানো যাবে। কাঁধের ওপরে খোকা। শিশু হ'লে কি হবে, মনে হয় অসহ্য বোঝা। ওখানে গিয়ে খোকাকে মাটীর ওপর শুইয়ে দিয়ে দাঁড়ানো যাবে। বলে' সজল এগিয়ে যেতে লাগলো। সামনে এগুতেই পথের ওপর ভয়ঙ্কর একটা কি দেখা যায়! সজলের ভূতের ভয় নাই, কিন্তু জানোয়ারের ভয় আছে। বন্যহস্তী নয় তো? সমস্ত শরীর ভয়ে কেঁপে উঠলো। সে শিশুটিকে কাঁধ থেকে বুকে নামিয়ে চেপে ধরলো, সমুখে না গিয়ে পিছন পানে দু' তিন-পা সরে' এলো। সহসা সমস্ত ঘন অরণ্য আর গিরি-শ্রেণী আলোকিত করে' আকাশে বিদ্যুৎ চমকালো। সজল আরো ভয়ে শিউরে উঠলো—আকাশে ঝড় উঠেছে! ঝড়! প্রবল ঝাপ্টা!

বিদ্যুৎ আবার ঝলসালো। সম্মুখের পথ পরিষ্কার দেখা গেলো। বন্যহস্তী নয়, জানোয়ার নয়—পথের ওপর পড়ে আছে এক বিশাল কালো পাথর খণ্ড ; পাহাড়ের গা থেকে খসে' পড়া। যেখান হ'তে খসে' পড়েছে, পাহাড়ের সে জায়গা একটা বিশাল গর্ত্তে পরিণত হয়েছে এবং পথ সংলগ্ন সেই গর্ত্ত। ভীষণ গর্জ্জন করে' আকাশে মেঘ ডাকলো ! ভীষণ প্রলয় গর্জ্জনে ঝড় উঠলো। বজ্রের বেগে আকাশ ভেঙে জল পড়তে লাগলো। বন্যার বেগে পাহাড়ের পাষাণশ্রেণী ভাসিয়ে জল ছুটলো। সজল উচ্চকণ্ঠে ডাকলো, পাখী ! বৌদি ! রামনাথ ! কোথায় তোমরা ? শীগ্‌গির এগিয়ে এসো,—কিছু ভয় নেই, তাড়াতাড়ি এসো। কিন্তু সব ব্যর্থ। প্রলয় ঝড় তখন সমস্ত গিরিপ্রদেশ আমূল কাঁপিয়ে তুলেছে। সজলের কণ্ঠস্বর প্রবল বাতাসে কোথায় মিশে গেলো। সজল তাড়াতাড়ি খোকাকে বুকে ধরে' সম্মুখের গর্ত্তে প্রবেশ করলো। পাহাড়ের গাত্র-বিচ্যুত ওই পাথরখণ্ড গর্ত্তটাকে আড়াল করে' পড়ে' থাকায় সজল নিরাপদে আশ্রয় পেলো।

প্রকৃতির দৈত্যলীলা সারা রাত চললো, রুদ্র ঝড় আর থামলো না।

পরদিন রাত্রি ভোর হ'লে সজল পাহাড়ের গা থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো। শিশুটি তার বুকে ; শান্ত, সুন্দর, নিদ্রিত। পিছন পানে কিছু-দূর ছুটে এসে সহসা থম্‌কে' দাঁড়ালো ! চরণের গতি তার স্তব্ধ, বক্ষ-স্পন্দন যেন স্তব্ধ, নয়নের দৃষ্টি যেন অন্ধকারময় ! সব শেষ হয়ে গেছে ! পাখী আর সিন্ধু বৌদির মৃতদেহ একটা প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড আঁকড়ে ধরে' পড়ে রয়েছে। বৃষ্টির প্রবল জলবেগের গতি ওই প্রস্তরখণ্ড আশ্রয় করে'ই রোধ করেছে, কিন্তু জীবন বাঁচাতে পারেনি। মরেছে কিন্তু বাঁচবার আগ্রহ থেকে মুক্ত হ'তে পারেনি। কঙ্কাল-মলিন মৃত কালো দেহ উভয়েরই। সজল বিকট চীৎকার করে' উঠলো, কর্কশ অট্টহাস্যে সমস্ত

অরণ্যভূমি প্রকম্পিত করে' তুললো—পিছে ফেলে আসা মানব-পৃথিবীর পানে চেয়ে গর্জে উঠে বললো, War is a great crime.

পাখীর গলায় সেই মুক্তার হার এখনো আছে, এখনো ঝল্‌মল্ করে' জ্বলছে। সজল সেদিকে চেয়ে শিউরে উঠলো—মানুষ মরে' যায় তবু ঐশ্বর্য্যের জ্যোতিঃ সর্ব্বাঙ্গে ঝল্‌মল্ করে। সজল আস্তে আস্তে পাখীর কণ্ঠদেশ থেকে মুক্তার হারটি তুলে নিতে নিতে বললো, বলেছিলাম ছ' মাস পর তোমাকে এ মুক্তা-হারের গোপন ইতিহাস বলবো, কিন্তু আর বলা হ'লো না। যার হার, সেও হয়তো আজ আর বেঁচে নেই। কোথায় সে মুক্তা, সে রাজকন্যা, সে ছাত্রী মুক্তা? সজল শেষবার পাখীর মুখের দিকে চাইলো। নিমীলিত আঁখি, শুধু অশ্রুরেখা নয়ন প্রান্তে। সজলের চোখে এবার জল এলো। নত হয়ে মুখ নীচু করে' হাঁটু পেতে বসে' পাখীর অধরে অধর ঠেকিয়ে বললো, প্রেম নয়, ভালবাসা নয়, মিলন নয়—এ শুধু বিরহ-চুম্বন, মৃত্যু-চুম্বন; মানব-জীবনের যাত্রাপথে মানুষের সঙ্গে মানুষের এমনি হয় শুধু দু'দিনের পরিচয়, তারপর সব শেষ। সজল তারপর সিন্ধু বৌদির দিকে একবার চেয়ে বললো, জননীস্বরূপা ছিলে তুমি, আজ এই শেষ-বিদায়। তারপর পদপ্রান্তে বসে' বৌদির চরণে নিজের মাথা ঠেকালো, খোকার মাথা ঠেকালো। বললো, তোমার মাকে শেষ-বিদায় জানাও! তারপর উঠে দাঁড়িয়ে, পিছন ফিরে দেখে রামনাথের মৃতদেহ, তার ঘাড়ে চালের বোঝা পড়ে' আছে। সজল সেদিকে চেয়ে বললো, চাল নয়, ডাল নয়, ধন নয়, ঐশ্বর্য্য নয়, মৃত্যুই সত্য। সহসা সজল বক্ষের শিশুটিকে দু' হাতে শূন্যে তুলে' বললো, What thou art my child in this world of destruction. বলে' শিশুটিকে অতল গুহার নীচে ফেলে দিতে উদ্যত হ'লো; সহসা আবার কি ভেবে ক্ষান্ত হ'লো। বললো, No, I will save you, my child, I will save you; Only

man can save man. তুমি শিশু, তুমি পবিত্র, তুমি সত্য সুন্দর, জগতের সভ্যতার স্পর্শ এখনো তোমায় আঘাত করতে পারেনি; তুমি দেবকুমার। তারপর মুক্তার হারটির দিকে চেয়ে অট্টহাস্যে বললো, এই ঐশ্বর্যই মৃত্যু আবার এই ঐশ্বর্যই জীবন।

শিয়ালদহ ষ্টেশনের কাছে বৈঠকখানা রোড। ভিতরের দিকে একটা সরু গলি। এই সরু গলির এ টা দ্বিতল বাড়ীতে মৃণালিনী ও মুক্তা রেঙ্গুন থেকে এসে আশ্রয় নিয়েছে। ভদ্রপল্লী একে আর বলা চলে না, খোলার ঘরই বেশী। গলির ভিতরে ঢুকতে সময় সময় ভয়ানক ভয় হয়। দু'ধারে পানের দোকান, বিড়ির দোকান। কতগুলো অসভ্য লোক পানের দোকানের সমুখে দাঁড়িয়ে পান খায়, বিড়ির দোকান থেকে বিড়ি কিনে খায় আর হাসা-হাসি ঠেলাঠেলি এবং ইয়ারকি করে। কোন মেয়েমানুষ দেখলে তালকাটা বেসুরো প্রেমের গান করে; মাঝে মাঝে থেমে গিয়ে হাত তালি দিয়ে হাসে। খোলার ঘরগুলোতে কতগুলো হিন্দুস্থানী থাকে, তারা দুধ বিক্রী করে। আর খান দুই ঘরে চায়ের দোকান; তাতে বাজে লোকের আড্ডা। এ ঘরগুলো ছেড়ে অনেক ভিতরে ঢুকে তারপর দোতলা একখানা বাড়ী। ওপরের দু'খানা ঘর মৃণালিনী ভাড়া নিয়েছেন, তখন তাড়াতাড়ি করে' এর চেয়ে আর ভালো ঘর পাওয়া যায়নি; পাওয়া গেলেও ভাড়া অনেক বেশী। বেশী ভাড়া দেবার মত আজ আর মৃণালিনীর অবস্থা নেই।

মেঝের ওপর মাদুর পেতে সামান্য বিছানা করা হয়েছে। মেঝের ঠাণ্ডা গায়ের মধ্যে বিঁধছে যেন। সিমেণ্ট করা শক্ত মেঝে পিঠে ভয়ানক লাগছে। মৃণালিনী বার বার উঠে বসে' গা জুড়িয়ে নেন। মুক্তার অল্প বয়স, ঘুম বেশী। তার ওপর এ ক'দিন জাহাজে ঘুমানো তো দূরের কথা, একটুকু শুয়ে থাকতেও পারে নি। সমস্ত দেহ বিশ্রাম ক্লান্তিতে ভেঙে

পড়েছে। আজ শোয়া মাত্রই অচেতন ঘুমে সে সুপ্ত হয়ে পড়ে' আছে। তবু মাঝে মাঝে এপাশ ওপাশ হয়ে শক্ত মেঝের আঘাত সয়ে' নিচ্ছে। মা বার বার পিঠে হাত বুলিয়ে স্নেহের ব্যর্থ পরশ ঢালছে, মুক্তার পিঠের ব্যথা তাতে এতটুকু কমাতে পারেন নি। শুধু তাই নয়, ঘরের মধ্যে এতটুকু বাতাস ঢুকতে পারে না, চারিদিক বন্ধ। দু' দিকে দুটো জানালা আছে সত্য কিন্তু বাতাসের নাম গন্ধ নেই। গরমে সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। শরীরের ঘামে বিছানাটা পর্যন্ত ভিজে উঠেছে। কার সাধ্য এতটুকু ঘুমোয়? এত গরমে, এত অন্ধকারে, এত শক্ত মেঝেয় মানুষ ঘুমোতে পারে? কিন্তু তারা কি আজ মানুষ? মৃণালিনী সেদিন রাত্রে এতটুকুও ঘুমোতে পারলেন না, ভোর রাত্রে সামান্য একটু তন্দ্রার মত এলো। কিন্তু সে তন্দ্রার অন্ধকারে জেগে উঠলো নয়ন ভরা স্বপ্ন।—সেই রেঙ্গুন শহর, সেই জাপানী বিমান, সেই দুরুম দুরুম বোমা পতনের বক্ষভেদী শব্দ; সেই বোমাবহ্নি, সেই ধূমায়িত সারা শহর, সেই পথে ঘাটে মৃতদেহ; সেই আতঙ্ক, সেই শিহরণ; সেই মূর্চ্ছা! তন্দ্রা ভাঙতেই স্বপ্ন গেলো কেটে। কিন্তু স্বপ্নের ভয়াবহ স্পর্শ বুকের সকল শিরায় তখন আন্দোলন তুললো।

এমনি করে' কাটলো প্রথম রাত, এমনি করে' কাটলো দ্বিতীয় রাত, এমনি করে' কাটলো এক বছর। নিত্য নূতন বেদনা ভরা অশ্রুজল: ছিন্ন চ্যুত জীবনের রক্তাক্ত নিশ্বাস। মৃণালিনী ভাবেন, দুঃস্বপ্নের মত এ জীবন কোথা হ'তে কোথায় যেন ভেসে চলেছে। সংগ্রাম, যুদ্ধ! মানব সভ্যতা! বিজ্ঞান! মৃণালিনীর বক্ষশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে।

মুক্তা মার বেদনা-ব্যথিত মুখের পানে চেয়ে নিজেও ব্যথিতা হয়ে ওঠে। শুষ্ক ম্লানমুখে বলে, মা, মানুষের কাছে মানুষের স্নেহ-প্রীতি, আদর-যত্ন, মায়া-মমতার দাবী আজ আর নেই, মানুষ আজ শুধু মানবকঙ্কাল। আজকের দিনে মানুষ করে মানুষের রক্তপান।

কাজেই সংগ্রাম আর মানব-সভ্যতার কথা ভেবে দুঃখ করে' লাভ নেই। এমনি করে' মৃণালিনীর সাথে মুক্তার, মুক্তার সাথে মৃণালিনীর নানা কথাবার্ত্তা হয়। দু'জনের চোখেই ঝরে জল; দু'জনেই উদ্বাস্তু-জীবনের মর্ম্ম-বেদনায় রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। দু'টী নীড়হারা বিহঙ্গ যেন মুখোমুখি বসে' ঝড়ের হাওয়ায় ভেঙ্গে যাওয়া বাসার কথা ভাবে; ভাবে জীবনের প্রলয়-পরিবর্ত্তনের কথা। ভাবে তাদের জীবনের সর্ব্বশ্রী ধূলায় লুণ্ঠিত করার জন্য দায়ী কে? ঘন দীর্ঘশ্বাসে মৃণালিনীর বুক ফেটে বা'র হয় এদেশে ব্রিটিশের রাজত্ব!

একটা চাকর রাখা হয়েছে বাইরের কাজকর্ম করবার জন্য। তা'ছাড়া এদের দেখবার শোনবার জন্যও তো একজন লোকের দরকার। এত বড় শহরে একজন পুরুষ মানুষের সাহায্য ছাড়া দু' জন মেয়ে-মানুষের পক্ষে অনেক ভাবনার কথা। গজেন লোকটা ভালো; বাড়ী তার মেদিনীপুর। কয়েকদিনের মধ্যেই এদের আপন করে' নিয়েছে সে। যেন বহুদিনের পরিচিত পরম আত্মীয়। হৃদয়ের গভীর স্নেহ ও মায়া-মমতা দিয়ে এদের যেন আঁকড়ে ধরেছে। আঁকড়ে ধরবার কারণও আছে—গজেনের আপন বলতে কেউ নেই। সেবার মেদিনীপুরের প্রবল বন্যায় গজেনের বাড়ী-ঘর, গরু-বাছুর, সব কিছু ভেসে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ভেসে গেছে তার স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র। এ দুনিয়ার সব মায়া-মমতা চুকে গেছে একদিনের বন্যাস্রোতে। এমনি করে' হারিয়ে যাওয়া বুকটাকে দু' হাতে চেপে ধরে' গজেন ক'লকাতা এসে দুয়ারে দুয়ারে আশ্রয় খুঁজলো, কিন্তু আশ্রয় পেলোনা কোথাও। এ জগতে কে কাকে আশ্রয় দেয়! গজেনের চোখে এলো জল। মৃণালিনী সে চোখের জল নিজের আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিলেন। বললেন, থাকো আমার এখানে। সেই থেকে গজেন আঁকড়ে ধরলো এদের আশ্রয়; তার ভাঙ্গা বুক যেন একটু জোড়া লাগলো। প্রবল বন্যায় পৃথিবীর বুকে যেন

পেলো একটু তীর। গজেন বাইরের যাবতীয় কাজকর্ম করে' যে সময়টুকু পায়, সেই সময়টুকু সে সামনের ছোট্ট বারান্দায় বসে' হাঁটুর ওপর মাথা রেখে হয় ঘুমোয়, না হয় বন্যায় ভেসে'-যাওয়া মানুষের দুঃখের গান গায়। সে গানে মৃণালিনীর চোখে আসে জল। মুক্তা গজেনের ব্যথিত কণ্ঠস্বরে মিলায় আপন কণ্ঠস্বর। গানের শেষে দু'জনেই আবার হাসে, সে হাসিতে ঝরে' পড়ে বিষাক্ত জীবনের তিক্ত অশ্রুজল। সে হাসিতে কেঁপে ওঠে সমস্ত আকাশ বাতাস।

সমস্ত ব্রহ্মদেশ তখন জাপান-অধিকৃত। ব্রিটিশ ব্রহ্মদেশের মায়া ত্যাগ করে' ভারতে সরে' এসেছে; সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছে চার পাঁচ লক্ষ নিঃস্ব ভারতবাসী ব্রহ্মদেশ ছেড়ে। ক'লকাতা শহরে এখন তিলধারণের স্থান নেই, অসংখ্য ইভাকুইজ এসে আশ্রয় নিয়েছে এখানে। ক্রমে জাপানী যুদ্ধের গতি বঙ্গদেশ ও আসাম অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে; সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে সমস্ত পূর্ব ভারতে। চারিদিকে হাহা রব। চাল নাই, বস্ত্র নাই, ঔষধ নাই; লক্ষ লক্ষ লোকের মৃতদেহ পথেঘাটে, জলে স্থলে, শহরে বন্দরে। সভ্য ক'লকাতা শহরের প্রশস্ত রাস্তার ওপর নগ্নদেহে ক্ষুধার্ত মুখে পড়ে' রয়েছে হাজার হাজার ভিখারী। মুখে তাদের করুণ কাতর অশ্রুসিক্ত মিনতির স্বর—বাবু, একটু ফ্যান্, বাবু তোমার পায়ে পড়ি। সমস্ত শহরের পথঘাট ক্রমে হয়ে এলো মহা-শ্মশান। অগণিত শবদেহ যেখানে পড়ে' মরে' রয়েছে সেখানেই দিনের পর দিন থেকে পচে গলে' যাচ্ছে। সেদিকে সরকারের বা জনগণের কারো লক্ষ্য নেই। প্রলয় দুর্ভিক্ষ ও মহামারী যেখানে সংহার-লীলায় তাণ্ডব নৃত্য করে, সরকারের শৃঙ্খলতা সেখানে শিথিল, জনগণের বদান্যতা সেখানে সঙ্কুচিত। বঙ্গদেশ মরে' শ্মশান হয়ে গেলো। মরে' গেলো শত শত শ্রমজীবি—চাষী, জেলে, কামার, কুমোর, তাঁতী। শুধু চালের অভাবে, শুধু বস্ত্রের অভাবে, শুধু না খেয়ে, না

পরে'। বঙ্গদেশে প্রচুর চাল উৎপন্ন হয়, প্রচুর বস্ত্র বয়ন করা হয়, কিন্তু চাল গেলো কোথায়? বস্ত্র গেলো কোথায়? চাল আর কাপড়ের মিল অবিরল গতিতে চলছে পূর্ব্বের চেয়ে দ্বিগুণ উৎপাদনশক্তি নিয়ে; তবু চাল নাই কেন? বস্ত্র নাই কেন? বিপুল সন্দেহজনক প্রশ্ন। কিন্তু সবাই নীরব, সে প্রশ্নের উত্তর কারো মুখে নেই। উত্তর থাকলেও বলতে কেউ সাহস করে না। চাল আছে, বস্ত্র আছে, কিন্তু সে সব তোমার আমার মতো সাধারণ লোকের জন্ত নয়, কোটীপতি মার্চ্চেন্টের ঘরে ব্ল্যাক-মার্কেটিং-এর জন্তে। একমণ চাল পঞ্চাশ টাকা; একখানা কাপড় কুড়ি টাকা। লক্ষ লক্ষ লোকের খাওয়া পরা হ'লো বন্ধ; মরে' গেলো দেশের প্রাণ ঐ শ্রমিকজাতি কুলী-মজুর আর নিম্নশ্রেণীর অসহায় মানুষগুলো।

মধ্যবিত্ত ঘরের লোক বেঁচে রইলো দু'বেলার জায়গায় এক বেলা খেয়ে, একখানা শতচ্ছিন্ন কাপড় অনেকদিন পর্য্যন্ত পরে, নানা অসুখ বিসুখে অস্থি-মাংস সার হয়ে। আর ধনীরা চোরাবাজার থেকে যে কোন উচ্চ মূল্যে চাল কিনে এনে দু'বেলা খেয়ে পূর্ব্বের মতো সুখে স্বচ্ছন্দেই কাটাতে লাগলো তাদের দিন।

কিন্তু মৃণালিনী কি ধনী? কন্তা মুক্তা? রেঙ্গুনে যাদের সাত আটখানা প্রাসাদতুল্য বাড়ী ছিলো। লক্ষ লক্ষ টাকার মূলধনে যাদের ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো দেশবিদেশে। সে মৃণালিনী, সে মুক্তা আজ সত্য সত্যই সর্ব্বহারা, নিঃস্ব। সত্য সত্যই তারা আজ মধ্যবিত্ত সামান্ত গৃহস্থের চেয়েও দরিদ্র। গায়ের কয়েকখানা অলঙ্কার ছাড়া সঙ্গে করে' তারা কিছুই আনতে পারে নি; আনবার মতো সুযোগ সুবিধা হয় নি, সুযোগ সুবিধা হ'লেও আনতে ইচ্ছে করে নি। স্বামী উপেন্দ্র চৌধুরী যেদিন গানে গেলেন মারা। এদিকে মাথার ওপর অবিরত বোমা। জাপানী বিমান অবিরত করছে গর্জ্জন; তার ওপর পথে-

ঘাটে চলছে লুটপাট। এ অবস্থায় টাকা পয়সা, ধন ঐশ্বর্য্যের ভাবনার চেয়ে মেয়েকে নিয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে ক'লকাতা চলে' আসাই পরম প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ালো। মৃণালিনী সামান্য কিছু গায়ের অলঙ্কার নিয়েই জাহাজে উঠে পড়লেন নিঃস্ব ইভাকুইজ সেজে। ক'লকাতা এসে বহু পুরাতন দু'একজন আত্মীয়স্বজনের খোঁজ করলেন। দু' পুরুষ ধরে' বর্ম্মাবাসী হওয়ায় দেশের আত্মীয়স্বজনের সম্পর্ক একেবারে ছেড়ে দিয়েছিলেন, আজ হঠাৎ ক'লকাতা এসে খোঁজ করে'ও কারো দেখা পেলেন না। মৃণালিনীর পিতৃবংশের পরিচয় তাঁর বিয়ে হবার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে; সে বংশে আজ আর কেউ নেই। কাজেই মৃণালিনী ক'লকাতা পৌঁছে আরো যেন বিপদে পড়লেন। দিশাহারা পারাপারহীন অকূল বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গায়িত বক্ষের চেয়েও যেন ক'লকাতা নগরীর বক্ষ মুহুঃ শঙ্কাময়। পদে পদে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয় ভাবনা; পথে ঘাটে সন্দেহ সংশয়পূর্ণ মানব-চরিত্র। তবু এর মধ্যেই অতি সাবধানে ভয়ে ভয়ে চলাফেরা করে' ওদের দিন চলতে লাগলো। ওদের প্রধান সাথী এখন এই গজেন। এখন মেয়েমানুষের পক্ষে একমুষ্টি চাল জোগাড় করা অসম্ভব। কোন দোকানে চাল নেই, চারিদিকে হাহাকার-ভরা বোবা-কান্না। পল্লীগ্রাম থেকে চাষী-মজুর, শত শত ভিখারী এসে ক'লকাতা শহরে উপস্থিত হয়েছে। শহরের বাবুদের কাছে একটি পয়সার জন্য আকুল কান্না কাঁদছে। দিনের পর দিন না খেয়ে রাস্তার ওপর পড়ে' আছে। লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে 'মাগো একটু ফ্যান—' বলে' পেটের ক্ষুধায় চীৎকার করছে। কিন্তু চীৎকার-ধ্বনি সভ্য শহরের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয়ে কোথায় মিশে যাচ্ছে, কারো কাছে পাচ্ছেনা এতটুকু ভাতের ফ্যান্।

মৃণালিনীর ঘরে আজ দু'দিন যাবত চাল নেই; দু'দিন একরকম উপোসে কাটলো। কিন্তু আজ আর থাকা যায় না, ভাতের জন্য প্রাণ

কেমন করছে, শরীর যেন ভয়ানক দুর্ব্বল বোধ হচ্ছে। মৃণালিনী গজেনকে বললেন, যে ভাবেই হোক, যত টাকায় হোক সের পাঁচেক চাল শীগ্‌গির জোগাড় করে' দাও, নইলে আর চলছে না। তারপর গজেনের হাতে পাঁচটা টাকা দিয়ে বললেন, পাঁচ সের চাল এনো, দোকানে না পাও চোরাবাজারে চেষ্টা করো।

গজেন বেরিয়ে গেলো—রাস্তার সমস্ত দোকান দেখলো, কোথাও চাল নাই। রাস্তার মোড়ে ঐ বড় দোকানটার দিকে ছুটলো, কিন্তু রাস্তায় কি হাঁটা যায়? ভিখারীরা চারদিক থেকে এসে জড়িয়ে ধরে' বলে—বাবু, একটা পয়সা। বাবু, দুটি ভাত, না হয় একটু ফ্যান দাও। রাস্তার এ ক্ষুধার্ত্ত মুখগুলোর দিকে চেয়ে গজেনের বুক কেঁপে ওঠে। গজেনের ক্ষুধার্ত্ত মুখে কথা বন্ধ হয়ে যায়; কিছু বলতে পারে না, শুধু একটা চাপা নিশ্বাসের সঙ্গে বলে' ওঠে—হায় যুদ্ধ! এ ক্ষুধার্ত্ত মুখগুলোকে পিছনে ফেলে গজেন তাড়াতাড়ি রাস্তার ওপাশে চলে' যায়। ব্যর্থ মুখগুলি গভীর বেদনায় ব্যথিত হয়ে ওঠে। শুধু আলোহীন চোখগুলি ব্যর্থ গজেনের পিছে-পিছে চায়, গজেন ঐ ফুটপাথে উঠে তাড়াতাড়ি সরু গলিতে ঢুকতে গিয়ে দেখে—এক কোণে একটা ডাষ্টবিন; দু'তিনজন ভিখারী আর দু'তিনটে কুকুর তার চারধারে পচা গলা ময়লা থেকে কি খুঁটে খাচ্ছে। কে মানুষ, কে কুকুর গজেন যেন কিছুই ঠিক করতে পারছে না। শুধু তার মুখ থেকে অস্ফুট ধ্বনি বা'র হ'লো—যুদ্ধ! সরু গলিতে ঢুকে গজেন চোরাবাজারের সন্ধান করলো: বড় রাস্তার ওপর চোরাবাজার বসে না, সাপের মতো আঁকাবাঁকা অন্ধকার সরু গলির ভিতরেই পৃথিবীর অপবিত্র কাজ দিনরাত চলে। গজেন সেই অপবিত্র হাটে অপবিত্র মানুষ খুঁজতে লাগলো। একটা দোকান পাওয়া গেলো, নামে মাত্র দোকান, শূন্য তার আসবাব-পত্র। চাল ডাল কিছুই নেই। অপবিত্র লোকটি কতকগুলো শূন্য

মাটির গামলার মাঝে একটা ছোট চৌকিতে বসে' বসে' তামাক টানছে; তামাক খেতে খেতে আবার মাঝে মাঝে চোখ বুঁজছে, চোখ বুঁজে থেকে বললো, পাঁচ সের চাল দশ টাকার কমে পাবে না; টাকা ফেলো, দিচ্ছি।

গজেন বললো, আমার কাছে মাত্র পাঁচ টাকা আছে, দয়া করে' দিন, আমরা আজ দু'দিন না খেয়ে আছি।

চোখ বুঁজেই লোকটা ইসারা করে' পথ দেখিয়ে বললো, হবে না, চলে' যাও।

গজেন ঘরে ফিরে এলো। বললো, চাল পাওয়া গেলো না; পাঁচ সের দশ টাকা।

মৃণালিনীর মুখ শুকিয়ে গেলো। পাঁচ সের দশ টাকা! কিন্তু টাকা কোথায়? সামান্য যে ক' টাকা ছিলো, এতদিনে সব শেষ হয়ে গেছে, মাত্র পাঁচ টাকার একখানা নোট ছিলো। মৃণালিনী গজেনের হাত থেকে নোটখানা তুলে' নিয়ে নিজের হাত থেকে সোনার একটা চুড়ি খুলে' দিয়ে বললো, এটা বেচে যা চাল পাও নিয়ে এসো।

গজেন শিউরে উঠলো, কিন্তু পেটের ক্ষুধা তার চেয়েও বেশী। গজেন আবার গেলো, লোকটাকে সোনার চুড়িটা দিলো। লোকটা হেসে সের দশেক চাল মেপে দিলো।

* তখন কন্ট্রোল দরে চাল বেচা-কেনা করবার জন্য সরকার থেকে নির্দ্দেশ করা হয়েছে। সে দরের অমান্য করে' কেউ বেশী দরে চাল কিনলে বা বিক্রী করলে তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে। চাল নিয়ে ঘরে ফেরবার পথে রাস্তার মোড়ের পুলিশটা গজেনকে ধরে' থানায় নিয়ে গেলো। গজেন গোটা পাঁচেক টাকা থানার দারোগাকে লুকিয়ে দিতে পারলে নিশ্চয়ই সে মুক্তি পেতো। কিন্তু গজেনের কাছে কিছুই ছিলো না এবং সে অপরাধের জন্যই যেন গজেনের ছ' মাস জেল হয়ে গেলো। চালগুলো দারোগা-গিন্নি হেসে তুলে' রাখলেন।

সারাদিন গেলো, গজেন এলো না। মৃণালিনী উনুন ধরিয়ে হাঁড়িতে জল দিয়ে বসে' আছেন কিন্তু কোথায় গজেন? উনুনের আগুন নিভে গেলো, ফুটন্ত জল ঠাণ্ডা হয়ে গেলো, গজেনের দেখা নাই। সারাদিন উপোস থেকে সন্ধ্যাবেলা সামান্য রুটী আর পেট ভরে' জল খেয়ে দুর্ব্বল দেহে ব্যথিত বুকে মা ও মেয়ে শুয়ে পড়লো। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মৃণালিনী বললেন, গজেনটাকে ভালো লোক বলেই জানতাম: না, এ যুগে ভালোমানুষ নেই, সব চোর ডাকাত, গুণ্ডা, বদমাস, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক। গজেনও শেষে সোনার চুড়িটা নিয়ে পালালো! আমরা যে না খেয়ে আছি সে কথা ভেবেও দেখলো না! মানুষ এতো নিষ্ঠুর হ'তে পারে।

মুক্তা বললো, গজেন আর কতো নিষ্ঠুরতা করেছে? সামান্য একটা সোনার চুড়ি নিয়েছে, কিন্তু বড় বড় ধনী ব্যবসায়ীরা চালের চোরাবাজার করে' লক্ষ লক্ষ লোকের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে যে ধ্বংসলীলা সৃষ্টি করছে, সে তুলনায় গজেন কিছুই করে নি মা! গরীব মানুষ, খেয়ে বাঁচবার জন্য চুড়িটা চুরি করেছে। কুলীমজুর, গরীব কাঙাল আর ভিখারীরা যদি চুরি ডাকাতিও করে তবু তাদের বিরুদ্ধে বলবার কিছু নাই; ওরা চুরি করে না খেতে পেয়ে, শুধু বেঁচে থাকবার দাবীতে।

আজ মুক্তার বহুদিন পর মাষ্টারমশায়ের কথা মনে পড়ে' গেলো। মাষ্টারমশায় তা'কে পড়াতে পড়াতে অনেক কথা শিখিয়েছিলেন। পড়ানোর চেয়ে বাইরের পৃথিবীর ভালো মন্দের কথাই বেশী শিখিয়েছেন। ধনীদের অত্যাচারে দেশের লোক যে দিন দিন ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, সে কথাই মাষ্টারমশায় তাকে কতোদিন বলেছেন কিন্তু মুক্তা যেন তখন সে কথাগুলো ভাল করে' বুঝতে পারে নি।

আজ মুক্তা বুঝতে পারছে ধনী আর গরীব এই দুই শ্রেণীর লোক পাশাপাশি যে দেশে বাস করে সে দেশের মানবশক্তি নিশ্চিত ধ্বংস-

মুখে। মুক্তার সহসা হারটার কথা মনে পড়ে' গেলো। বললো, মা, আমার গলার হারটা কি হ'লো?

মৃণালিনী বললেন, সামান্য একটা হারের কথা এতদিন পর মনে পড়লো? বাড়ী থেকে তাড়াতাড়ি বেরুবার সময় দেখলাম সামনের ঘরের মেঝের ওপর পড়ে রয়েছে। ইচ্ছে হ'লো তুলে' নিই কিন্তু মাথার ওপর বোমাগর্জ্জন বাধা দিলো।

মুক্তার মুখ মলিন হয়ে উঠলো। হারটার জন্য নয়, ওই হারটার সঙ্গে যে মাষ্টারমশায়ের স্মৃতি জড়ানো। মুক্তার হার এবং মুক্তাহারের মালিকের বিরুদ্ধেই যে মাষ্টারমশায়ের ছিলো নানা প্রশ্ন? সে অমূল্য হারটা রেঙ্গুনে ফেলে এসেছি? সারা রাত কাটলো নিদ্রাহীন চোখের জলে, না খেয়ে থাকার দহনজ্বালা সারা অঙ্গে নিয়ে।

রাত্রি ভোর হয়ে গেছে: চারিদিকে ক্ষুধিতের মর্ম্মভেদী হাহাকার। মৃণালিনী বললেন, মুক্তা, ওঠ, ভোর হয়ে গেছে। গজেন বোধ হয় আর আসবে না, পালিয়েছে। কিন্তু আজ তোকেই চালের জোগাড়ে বেরুতে হবে। টাকা আর নেই, আমার সোণা-গয়না যা আছে তাই দিয়েই চাল আনতে হবে। বলে' মৃণালিনী মুক্তার সর্ব্বাঙ্গে একবার অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে শিউরে উঠলেন: সর্ব্বাঙ্গে প্রথম যৌবনের রাঙা রেখা। চোখ ফিরিয়ে বললেন, না মা, তোর বয়স এখন পনেরো, এ বয়সে কোনো ভিখিরী মেয়েও ভিক্ষেয় বেরোয় না, তুই তো রাজার মেয়ে!

মুক্তা শয্যা ছেড়ে উঠে বললো, কিন্তু চাল রাজকন্যারও দরকার, ক্ষুধায় রাজকন্যাও কাতর হয়। তুমি ভেবো না, আমি এখুনি যাচ্ছি, আজ আমি আর রাজকন্যা নই। আজ আমার দিকে চেয়ে শিউরে উঠো না। আজ দেশে যুদ্ধ, আজ দেশে দুর্ভিক্ষ, ঘরে ঘরে ক্ষুধায় শুষ্ক মুখ; জীবন, যৌবন আজ প্রতি দেহে শুষ্ক। আজ দেহের দিকে

কে তাকায়? আজ দেহের রক্তমাংস তুচ্ছ, ক্ষুধানলে ভস্মীভূত, আজ চাই চাল, চাই বাঁচবার জন্তে একমুঠো অন্ন।

মুক্তা আজ সত্যই পথে এসে দাঁড়ালো। সর্বাঙ্গ লজ্জানত, থর থর কম্পিত বুক। উদাস ব্যর্থ নয়নের চাহনি, ছল ছল নীরব নয়নের কঠিন ভাষা, অন্তরে অসীম গ্লানি। পায়ের তলে যেন বিশ্বধ্বংসী ভূমি-কম্প; শুদ্ধ তার চরণতল। আজ সে কোথায়? আঁচলে বাঁধা তার সোনার বলয়। দেহসজ্জার বহুমূল্য অলঙ্কার আজ তুচ্ছ, একমুষ্টি চাল আজ জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য। মুক্তা পা বাড়ালো। সামনে আর একটু এগিয়ে বৈঠকখানা রোডের ওপর সেই পানবিড়ির দোকানগুলো। সেদিকে চেয়ে মুক্তা চমকে' উঠলো—কতকগুলো ছোকরা বয়সের লোক সেখানে দাঁড়িয়ে। মনে হলো: কয়েকজন এ. আর. পি. সর্বাঙ্গ তাদের কালো পোষাকে ঢাকা। খেতে না পেয়ে এ. আর. পি. হয়েছে। এখন দু'বেলা খেতে পায় আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিড়ি খায়, পান খায়, ভদ্রলোকের মেয়ের দিকে চেয়ে চেয়ে হাসে, ইয়ারকির সুরে গান গায়। মুক্তা সেখানে এগিয়ে আসতেই গান আর হাসাহাসি শুরু হ'লো। জোরে বিড়ি টেনে ধোঁয়াগুলো মুক্তার দিকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলো। মুক্তা যেন মরে' গেলো। তাড়াতাড়ি সে জায়গা পার হয়ে আসতে আসতে মুক্তা মনে মনে বললো, ও কিছু নয়, সংগ্রাম ও সভ্যতা। উলঙ্গ মানব-চরিত্রের আর্তনাদ, আর কিছু নয়। মুক্তা সে পথ পেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়লো। সমুখে চেয়ে দেখে: সারা রাস্তায় ভিখারী-সমুদ্র। শুধু ভিখারী নয়, আজ মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর অনেক গৃহস্থ-বধূ ভিখিরী হয়ে পথে বেরিয়ে এসেছে। চারিদিকে বেদনার ছায়া, কালো কঙ্কাল মুখ: করুণ-কাতর মিনতি: বাবু, একটু ফ্যান; বাবু, একটা পয়সা। কিন্তু বাবুরা তখন মনুষ্যত্বহীন। পথের কাতর মিনতিদৃষ্টির দিকে উপেক্ষায় চেয়ে গাড়ীর হর্ণ দিয়ে চলে'

যায়। মুক্তা ভিখারীদের দিকে চেয়ে অশ্রুভরা প্রশ্নে ভরে' ওঠে: যুদ্ধ? ব্রিটিশ জাপান? ভিখারীরা এসে মুক্তাকে ঘিরে দাঁড়ালো: মা, একটু ফ্যান; মা, একটা পয়সা। মুক্তা নিজের ক্ষুধার জন্ম লজ্জিত হ'লো নিজের আঁচলের সোনার বলয় খুলে' ভিখারীদের মাঝে ফেলে দিলো। ভিখারীরা বলে' উঠলো, সোনার চুরি চাই না মা, চাই একটু ফ্যান, চাই ভাত। বলে' ভিখারীরা মুক্তাকে তার সোনার বালা ফিরিয়ে দিলো। মুক্তা হ'লো ভিখারীদের কাছে পরাজিত। সোনার বালার দিকে চেয়ে মুক্তা অট্টহাসি করে' উঠলো। সোনার বালা রাস্তার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো, তুচ্ছ সোনা-গয়না, তুচ্ছ আজ শহরের এই অভ্রলেহী অট্টালিকা; ট্রাম বাস, শিক্ষা-সভ্যতা। চাই চাল, চাই অন্ন। আজ এ লক্ষ লক্ষ ক্ষুধিতের মুখের কাছে চাই গোলা ভরা ধান, বস্তা ভরা চাল।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি জাপান-সৈন্য আসামের পূর্ব্বাঞ্চলে প্রবেশ করতে সুরু করেছে। ফলে পূর্ব্ব-আসাম ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে জাপানী বোমার উৎপাত বেড়ে গেছে। হাজার হাজার আমেরিকান সৈন্য আসাম অঞ্চলে ঘাঁটি করে' শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে উঠে-পড়ে' লেগে গিয়েছে। স্থানে স্থানে এসব ঘাঁটি নির্ম্মাণের তাড়া পড়ে' গেছে। হাজার হাজার কুলীমজুর ও বড় বড় কনট্রাক্টারের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। লোকের অভাব নাই, বাংলা দেশে তখন দুর্ভিক্ষের তাণ্ডব নৃত্য চলছে। লোক কাজ পায় না, খেতে পায় না, কাজেই লোক বাংলা ছেড়ে আসামে গিয়ে প্রাণের ভয় ত্যাগ করে' জাপানী বোমার নীচে মাথা দিয়েও ঘাঁটিতে কাজ করতে আরম্ভ করেছে। রাতারাতি ঘাঁটির পর ঘাঁটি নির্ম্মাণ হচ্ছে। দলে দলে কনট্রাক্টার নানা দেশ থেকে আসামে গিয়ে কাজের ভার নিচ্ছে আর হাজার হাজার কাগজের টাকায় রাতারাতি বড়লোক হ'চ্ছে।

ক'লকাতা এসে তারা মোটর কিনছে, মেয়েমানুষ খুঁজছে, তারপর চরিত্র হারিয়ে অমানুষ হচ্ছে। দেবব্রত এই চরিত্রের লোক।

দেবব্রত এ পথে মোটর হাঁকিয়ে যাচ্ছিলো। মুক্তার সোনার বালা তার মোটরের সমুখে পড়তেই সে তাড়াতাড়ি মোটর থামিয়ে নীচে নেমে এসে সোনার বালা তুলে' ধরে' চারদিকে তাকিয়ে বললো, এ সোনার বালা কা'র ?

মুক্তা ভিখারীদের মাঝখান থেকে এগিয়ে এসে দেবব্রতের সমুখে দাঁড়ালো। কি যেন এক শঙ্কা মুক্তাকে ঘিরে ফেললো। মুক্তা পিছন পানে দু' পা সরে' এলো।

দেবব্রত দু' পা এগিয়ে এসে বললো, কে তুমি ? তুমি তো ভিখিরী নও, তোমার সর্ব্বাঙ্গে আভিজাত্যের ছাপ। তুমি এ ভিখিরীদের মাঝে কেন ? আর এ সোনার বালা তোমার ঐ দেহেই শোভা পায়, রাস্তার ধুলোয় ধূসরিত হবার জন্য নয়। বলে' দেবব্রত মুক্তার ডান হাতে সোনার বালা পরিয়ে দিয়ে বললো, উঠে এসো।

মুক্তা বিস্মিত কণ্ঠে বললো, কেন, কোথায় ?

—যেখানে চাল আছে।

মুক্তা ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। চাল আছে ? সত্যি বলছেন চাল আছে ? মুক্তা আর বিলম্ব না করে' মোটরে উঠে দেবব্রতের পাশে বসলো। মোটর ছেড়ে দিলো। মোটর চললো ক'লকাতা শহর ছেড়ে বাইরে, বহুদূরে। মাঠ পেরিয়ে একটা অরণ্য-নির্জ্জন স্থানে এসে পৌছালো। চারিদিকে ঘন জঙ্গল, মাঝখানে প্রকাণ্ড টিনের গুদাম। সে গুদামের একটা মাত্র প্রকাণ্ড দরজা; মাঝখানে তার প্রকাণ্ড তালা। দেবব্রত মোটর থেকে নেমে তালা খুলে' দিয়ে বললো, চালের কি অভাব ? যত ইচ্ছে চাল নিতে পারো। দিনের বেলা তালা বন্ধ থাকে, রাত্রিতে চাল বিক্রী হয়।

মুক্তা বিস্মিত চোখে গুদামের দিকে চেয়ে রইলো। বললো, এ গুদামে কত মণ চাল আছে?

দেবব্রত বললো, লক্ষ মণ।

—এ চাল কাদের জন্য?

—দেশের অভুক্তদের জন্য।

দেবব্রত মিথ্যা কথা বললো। এ চাল চোরাবাজারে বিক্রীর জন্য মজুত করা হয়েছে।

মুক্তা মুগ্ধ হয়ে অনিমিষ চোখে দেবব্রতের দিকে চেয়ে বললো, ভেবেছিলাম বাংলা দেশে মানুষ নেই, সত্যি সত্যিই আপনি দেশসেবক। ভালোবাসতে ইচ্ছা হয় আপনার মনুষ্যত্বকে, আপনার অতুল ঐশ্বর্য্যকে; যে ঐশ্বর্য্য দেশের সকলের জন্য। কিন্তু আমাকে এখুনি ফিরে যেতে হবে। ধরুন, আমার এই সোনার বালা দু'টী নিয়ে কিছু চাল দিন। বলে' হাত খানা দেবব্রতের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, খুলে' নিন।

দেবব্রত মুক্তার হাত সরিয়ে দিয়ে বললো, তোমার সঙ্গে কোন বিনিময় চলে না। তুমি সুন্দরী, তুমি যুবতী, হৃদয়বাঞ্ছিত। পরে দেবব্রত মুক্তাকে সের পাঁচেক চাল দিয়ে বললো, যত চালের দরকার হয় এখানে এলেই পাবে। কিন্তু একটা কথা—একদিন আমি তোমাকে চাই।

মুক্তা সে কথার জবাব না দিয়ে তাড়াতাড়ি মোটরে উঠে বসে' বললো, আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিন শীগ্‌গির। মা না খেয়ে রয়েছেন, চাল নিয়ে আমাকে এখুনি যেতেই হবে।

দেবব্রত মুক্তার পাশে বসে' বললো, কোথায় যেতে হবে? কোথায় তোমার বাড়ী?

—শিয়ালদ'র কাছে।

শিয়ালদ এসে মুক্তাকে নামিয়ে দিয়ে দেবব্রত বললো, যখন খুসী গুদামে যাবে, চাল দেবো। ঐ সুন্দর মুখে ভাতের অভাব হবে না।

মুক্তার বক্ষশ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে উঠলো। কি যেন এক তীব্র প্রতিবাদ অধরপ্রান্তে এসে স্তব্ধ হয়ে গেলো। পেটের ক্ষুধা যেন সমস্ত বিদ্রোহ-বহ্নি নিভিয়ে দিলো। মুক্তা সারাদিন পর সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে এলো। ক্ষুধায় অর্দ্ধমূর্চ্ছিতা মৃণালিনী বললেন, মুক্তা, না খেয়ে মরি সেও ভালো কিন্তু চালের সন্ধানে তোকে আর সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে হবে না।

সেদিন সারা রাত মুক্তার চোখে ঘুম নাই। ক্ষণে ক্ষণে গা জ্বলে' ওঠে—তুমি সুন্দরী, তুমি যুবতী! দেবব্রত, তুমি মানুষ? লক্ষ লক্ষ মণ চাল তোমার গুদামে আছে, কিন্তু সে চালের বিনিময়ে তুমি কি শুধু যুবতী নারী চাও? না খেয়ে মরে' যাবে তবু সে আর দেবব্রতের কাছে চালের জন্য যাবে না।

সোনার গহনা যা কিছু ছিলো সব বিক্রী করে' অনশন আর অর্দ্ধাহারে কাটলো আরো দু'মাস, তারপর সুরু হ'লো সারাদিনব্যাপী উপবাস। ফলে মৃণালিনী পড়লেন অসুখে। অসুখ আর কিছুই না, শুধু না খেয়ে থাকার দরুণ একটু একটু করে' দেহের রক্ত শুকিয়ে যেতে লাগলো। মৃণালিনী এখন আর বসতে পারেন না, দিবারাত্রি শয্যায় দেহ এলিয়ে দিয়ে পড়ে' থাকেন। পরণের কাপড়খানিও শতছিন্ন, জীর্ণ দেহের তীব্র লজ্জা ঢাকবার জন্য এ ছেঁড়া কাপড়খানিও আজ যেন বার বার খসে' পড়ে' যায়। কাপড়খানা পর্য্যন্তও আজ ঐ দেহের মায়া ছেড়ে দিয়েছে যেন।

মৃণালিনী অবশেষে একদিন চক্ষের জল ছেড়ে দিয়ে মেয়েকে বুকের ওপর টেনে নিয়ে বললেন, আমি হয়তো আর বেশীদিন বাঁচবো না, কিন্তু মরবার আগে আমাকে একমুঠো ভাত যদি খাওয়াতি...। তারপর একটু থেমে বললেন, আর একটা কথা—এ ছেঁড়া কাপড়ে আমার মৃতদেহ ঢাকা যাবে না, একখানা নূতন থান কাপড় কিনে আমার মৃত অঙ্গ ঢেকে দিয়ে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিস্। সাবধান কোনও মানুষ যেন

আমার মৃতদেহ স্পর্শ না করে। সমস্ত মানব আজ শুচিতাহীন। তাদের দিকে চেয়ে ছিঃ ছিঃ করে' যেন মরতে পারি।

মুক্তা শুষ্কনেত্রে মার দিকে চেয়ে বললো, মা তুমি অমন কথা বলোনা। তুমি মরে' গেলে আমি যে একদিনও একা বাঁচতে পারবো না।

মৃণালিনী বললেন, তা আমি জানি—মানুষের মাঝে মানুষ বাঁচতে পারে অনেকদিন কিন্তু অমানুষের মাঝে দেবতাও বাঁচতে পারে না ক্ষণকাল। আজ এ ভাতের অভাবের জন্য, কাপড়ের অভাবের জন্য দায়ী কে জানিস্? আমাদের দেশের বড় বড় ধনীরা আর আমাদের গভর্ণমেণ্ট। যত শীগ্‌গির পারিস্ আমার পেছনে চলে' আসিস।

মুক্তা বললো, মা, তোমাকে বাঁচতেই হবে। একমুঠো ভাত খেতে পেলেই তোমার সব অসুখ সেরে যাবে।

মুক্তা বেরিয়ে গেলো। সহসা দেবব্রতের কথা মনে পড়লো, সহসা আবার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠলো। সুন্দর মুখে ভাতের অভাব হবে না। দেবব্রত, তুমি যাই হও আজ আমার যৌবন-সমুদ্র তোমার তৃষিত অধরপ্রান্তে তুলে' ধরে' একমুঠো চাল ভিক্ষা করবো। তুমি বাংলার ধনীসন্তান, তোমার কাছে নারীর মূল্য নেই; নারীর দিকে চেয়ে শুধু তার দেহের কথাই ভাবো। তার পেটের ক্ষুধার দিকে চেয়ে তোমার একটুকুও মায়া হয় না। শহর থেকে দূরে বিজন অরণ্য মধ্যে লক্ষ মণ চাল মজুত করে' রেখেছো লক্ষ লক্ষ ক্ষুধিত বাঙালীর মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে। সেই চাল অধিক মূল্যে চোরাবাজারে বিক্রী করে' লক্ষপতি হ'তে চাও; হ'তে চাও বিপুল ঐশ্বর্যশালী। ঐশ্বর্যের মাঝে পেতে চাও সুখ? তোমার চেয়ে শত গুণ ঐশ্বর্য ছিলো আমাদের, কিন্তু আজ শুধু একমুঠো চাল ভিক্ষার জন্য তোমার কাছে ছুটে চলেছি! তাও তুমি টাকা পয়সা, সোনা গয়নার বিনিময়ে দেবে না। আমাদের সেই বিপুল ঐশ্বর্য আজ আমার দেহের সম্মান পর্যন্ত রাখতে পারছে

না। সেই ঐশ্বর্য্যে তুমি পেতে চাও সুখ? তুমি সুখ খুঁজে পেতে চাও নারীর দেহ উপভোগ করে'। এ দেহ তো ধ্বংসের ধূলিমাত্র। এ দেহ-ধূলির বিনিময়ে বাঁচিয়ে তুলবো লক্ষ লক্ষ অন্নক্লিষ্ট প্রাণ। আজ আমি শুধু নারী, প্রাণময়ী। দেহহীন আজ আমার রূপ। দেহ বলে' আর আমার কোন কিছু নেই, আছে শুধু মৃত্যুময় জননীর প্রাণ-বেদনা আমার সকল অঙ্গে। একমুষ্টি চালের আকুল কামনা সারা প্রাণে। লক্ষ বাঙালীর অমৃত অন্নের জন্য যে আকুল কাকুতি মিনতি, সেই মিনতি ভরা প্রাণ আজ আমার সারা প্রাণে মিশে আমার দেহকে করেছে তুচ্ছ। সর্ব্ব অর্থহীন সেই দেহই আজ তোমাকে দান করে' ভিক্ষা করে' আনবো একমুঠো চাল। সেই দেহ দান করে' ভাঙবো তোমার গুদামের দ্বার। লক্ষ লক্ষ ক্ষুধিতের মুখে তুলে' ধরবো অমৃত অন্ন।

মুক্তা উন্মাদিনীর মত ছুটে চললো দেবব্রতের গুদামের দিকে। শহর ছাড়িয়ে মাঠে এসে পড়লো। মাঠ পেরিয়ে নির্জ্জন অরণ্য অভ্যন্তরে গুদামের দ্বারে এসে মুক্তা দাঁড়ালো। কিন্তু দ্বার বন্ধ, প্রকাণ্ড লোহার তালা আঁটা। গুদামের রুদ্ধ দ্বার দেখে মুক্তার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে' উঠলো। জননীর ক্ষুধাক্লিষ্ট মৃত্যুময় মুখখানি তার নয়ন সমুখে ভেসে উঠলো। দুর্ভিক্ষপীড়িত লক্ষ লক্ষ বাঙালীর শুষ্ক মুখ মুক্তার মনে জেগে উঠলো। হায় দেবব্রত! এমনি করে' তালা বন্ধ করে' রেখেছো লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত্ত লোকের মুখ। একটা ভুর্খা দারোয়ান পাহারা দিচ্ছে। মুক্তা তার কাছে দেবব্রতের বাড়ীর ঠিকানা পেলো। আবার পাগলের মতো ছুটে চললো দেবব্রতের বাড়ী। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, চারিদিক থেকে রজনীর অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। দেবব্রতর বাড়ী বালীগঞ্জে। সে বাড়ীতেই আছে। মুক্তাকে দেখে সে মহা উল্লাসে বলে' উঠলো, আজ গৃহে সুন্দর অতিথি আমার।

মুক্তা শিউরে উঠে থমকে' দাঁড়ালো। তারপর ব্যথিত কণ্ঠে বললো,

অতিথি নয়, ভিখিরী আজ আপনার দ্বারে। একমুঠো চালের জন্য গুদামে গিয়েছিলাম, দেখলাম দরোজা বন্ধ।

দেবব্রত হেসে বললো, তোমার জন্য আজ আমার সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত। এখন এসো আমার সঙ্গে। বলে' মুক্তাকে দেবব্রত তার শয়ন-কক্ষে নিয়ে গেলো।

মুক্তার ইচ্ছে হলো: দৌড়ে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু অনাহারে মৃতপ্রায় জননীর মুখখানির কথা মনে পড়তেই তার চরণতল যেন থর থর কেঁপে স্তব্ধ হয়ে গেলো। সর্ব্বাঙ্গে নেমে এলো বিষাদের অবসাদ। সমুখের একটা চেয়ারে বসে বললো, কিন্তু আমাকে চাল নিয়ে এখুনি ফিরতে হবে।

দেবব্রত বললো, রাত্রে গুদাম খোলা হয় না।

মুক্তা বললো, কিন্তু যে দেশ দুর্ভিক্ষপীড়িত, লক্ষ লক্ষ লোক যে দেশে না খেয়ে মরছে, সে দেশে ভাণ্ডার দ্বার দিনরাত খুলে' রাখতে হয়।

—খুলে' রাখতে হয় তা জানি, কিন্তু খুলে' রাখলে ব্যবসা করা যায় না।

—ব্যবসা নাই বা করলেন। লক্ষ লক্ষ লোক দেশে না খেয়ে মরছে আর আপনি তাদের মৃত্যুর বিনিময়ে ব্যবসা করে' বড়লোক হ'তে চান। আপনার সে বড়লোক হবার অর্থ আছে কিছু?

—তুমি সামান্য দরিদ্রঘরের মেয়ে, বড়লোক হবার অর্থ তুমি কি বুঝবে?

মুক্তার চোখে এলো জল। সে জলধারায় ভেসে উঠলো তাদের রেঙ্গুনস্থ পার্ক ষ্ট্রীটের বিরাট ভবন। সেই রজত-শুভ্র হর্ম্যতল; শয়ন-কক্ষের কারুকার্য্যখচিত ময়ূরপংখী খাট-পালঙ্ক। মার্ব্বেল পাথরে গঠিত নানা পশুপক্ষী। বহুমূল্য আসবাব পরিপূর্ণ তার পড়ার ঘর। ভবন-চূড়ায় সেই শ্বেত পাথরের শুভ্র সমুজ্জ্বল গম্বুজ। সেই সিংহদ্বারে

সেই বিপুলকায় সিংহমূর্তি। দু'পাশে শ্বেত পাথরের নগ্ন উড়ন্ত পরী। সে গৃহের তুলনায় দেবব্রতের এই দ্বিতল বাড়ীখানা একটা গোশালা সদৃশ।

দেবব্রত বললো, সে যা হোক, বড়লোক হবার কি অর্থ এখুনি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। বলে ড্রয়ার খুলে' একটা সোনার নেকলেস্ বা'র করে' মুক্তার সমুখে ধরে' বললো, এ নেকলেস আমার ভাবী স্ত্রীর জন্ত গড়েছিলাম, এর দাম পাঁচশো টাকা। কিন্তু আমি এখন বিয়ে করবো না ভাবছি। এ দুর্ভিক্ষে তোমার মতো ভদ্রঘরের অনেক মেয়ে সামান্ত মূল্যে বেচাকেনা হচ্ছে। কিন্তু তোমাকে সামান্ত মূল্য দিতে চাই না, এ হারের বিনিময়ে তুমি শুধু আজকের রাতটা আমার এখানে থাকবে।

মুক্তার আপাদমস্তক থরথর করে' কেঁপে উঠলো। চোখের আলো যেন সহসা নিভে গেলো। চারিদিকে যেন ঘোর অন্ধকার। সে অন্ধকারে ক্ষণিকের তরে ফুটে উঠলো মুক্তার সেই দশ হাজার টাকার মুক্তার হার। সে হারের শুভ্র আলোকে মুক্তা যেন সমুখের সব সুস্পষ্ট দেখতে পেলো।—দেখতো পেলো তারই সমুখে এক দানবমূর্তি দেবব্রত। সে যেন একটা বিশাল মহাপাপ। মুক্তা এতক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, আমি চাই একমুঠো অন্ন; এ হার আপনার স্ত্রী যে হবে তারই উপযুক্ত, আমার নয়। ভিখারী শুধু ভাতের কাঙাল—ঐশ্বর্য্যের নয়।

মুক্তার কথা শুনে' দেবব্রত যেন চমকে' উঠলো! এ মেয়ে সামান্ত ভিখারী নয়! বললো, তাহ'লে একমুঠো চালের বিনিময়ে এমনি আজকের রাতটা এখানে থাকতে স্বীকার আছো?

মুক্তা সম্মতি জানালো।

পরদিন সকালে মুক্তা চাল নিয়ে রওনা হ'লো। অবসন্ন কাতর শুষ্ক মুখ, নয়নের দৃষ্টি যেন আলোহীন, বিষাক্ত দহন জ্বালা তার সারা দেহে। আঁচলে বাঁধা চালের দিকে চেয়ে সর্ব্বাঙ্গ যেন শিউরে উঠলো! দেহের বিনিময়ে এ চাল যে কত অপবিত্র, কত ঘৃণিত! মুক্তা ছুটে চলতে

লাগলো। বার বার আঁচলের দিকে চেয়ে দেখে তার চালগুলি আঁচল থেকে পড়ে যায় না তো? আঁচলের গিঁটটা ভালো করে' দেখলো,—না, বেশ শক্ত করেই বাঁধা হয়েছে। মুক্তা ব্যাকুলচিত্তে ছুটতে লাগলো; আজ মাকে ভাত রেঁধে পেট ভরে' খেতে দেবে। মুক্তার প্রাণে আজ রাজ্যজয়ের আনন্দ।

মুক্তা যখন ঘরে ফিরে এলো তখন বেলা অনেক হয়ে গেছে। ফিরে এসে দেখে ঘরের দুয়ার বন্ধ। মা কি এখনো ঘুম থেকে ওঠেনি! মুক্তা ডাকলো, মা, মা, কিন্তু কারো সাড়া নাই। মুক্তা দরোজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলো, কিন্তু কেউ দরোজা খুললো না। তারপর দরোজা ভেঙে ঘরে ঢুকলো, মা বিছানায় শুয়ে। মুক্তা ঝাঁপিয়ে বিছানায় পড়লো। মা, মা বলে' ডাকলো, কিন্তু তখন সব শেষ। মৃণালিনী মৃত। অর্দ্ধনগ্ন শীতল শবদেহ। মুক্তা চীৎকার করে' কেঁদে উঠে বললো, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মানব-সভ্যতা। মুক্তা মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়লো। মূর্চ্ছিতা মুক্তা যখন চোখ মেলে' চাইলো তখন সে হাসপাতালে চার পাঁচজন ডাক্তার ও একজন নার্স তার বেডের পাশে। ডাক্তাররা বলাবলি করছে—ভদ্রলোকের মেয়ে, মায়ের মৃত্যু আর ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে পারেনি। শুধু ভালো পথ্যের দরকার। নার্সটিকে রোগীর প্রতি বিশেষ যত্ন নেবার উপদেশ দিয়ে ডাক্তাররা প্রত্যহ এসে রোগী দেখে চলে' যায়। মুক্তা সারাদিন শুয়ে থাকে, নার্স এসে পথ্য দিয়ে যায়। সামান্য ঔষধ না খেলেও চলে, এতো রোগ নয় ক্ষুধা; এতে ওষুধের প্রয়োজন কি? মুক্তা পথ্য খেয়ে গায়ের ওপর লাল কম্বলটা টেনে দিয়ে চোখ বুঁজে পড়ে' থাকে। তখন মনে পড়ে যায় সেদিন শ্মশানে মৃত পিতার কথা, মনে পড়ে অনাহারে মৃতা জননীর কথা, মনে পড়ে কালো কঙ্কাল দেবব্রতের কথা। চোখে তার প্রভূত অশ্রু শুষ্ক হয়ে ওঠে—গায়ের এ লাল কম্বলটার মত রাঙা শিখায়। মুক্তার বেডের চারপাশে আরো কতগুলো বেড। অনশনক্লিষ্ট শত শত

রোগী, সভ্য শহরের বড় রাস্তার ওপর দিনের পর দিন না খেয়ে' পড়ে' থাকা অর্দ্ধ উলঙ্গ মানব কঙ্কাল। না খেয়ে খেয়ে অস্থিচর্ম্মসার হয়ে যখন জীর্ণ বুকে মৃত্যুশ্বাস টানছে তখন তাদের হাসপাতালে টেনে এনে নগ্ন দেহ দামী কম্বলে ঢেকে দিয়ে মুখে এক ফোঁটা দুধ দেবার ব্যবস্থা করছে, মরণের পূর্ব্বে তার নগ্নদেহ ঢেকে দেওয়া হচ্ছে। মরণযাত্রীর অধরে দুধ ঢেলে দিয়ে তাদের কাণে প্রাণের মহিমার কথা শুনাচ্ছে। মৃত্যু গায়ের কম্বলটা মাথা পর্য্যন্ত টেনে সমস্ত জগৎটাকে আঁধার করে' রাখতে চায় যেন। কম্বলের উষ্ণতার মধ্যে উষ্ণ নিশ্বাস টেনে বলে, যুদ্ধ।

সর্ব্বাঙ্গ ধূলিমাটী মাখা, বড় বড় চুল, বড় বড় দাড়ি, হাত পায়ে বড় বড় নখ, পরণে শতছিন্ন ময়লা ধুতি পাঞ্জাবী, পা হ'তে হাঁটু পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে ক্ষত বিক্ষত। ভূতের মত চেহারা, দেখলে ভয় হয়। অজানা আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে মন। সজল এমনি এক ভূতের মতো চেহারা নিয়ে দু'মাস পরে চট্টগ্রাম এসে পৌছালো। তাকে দেখে হ'লো ভয়। এ কি মানুষ? মানুষের চেহারা এমন? এ কে? কোথা হ'তে এসেছে? চোর, ডাকাত—জাপানী স্পাই নয় তো? সকলের মনে ঘোর সন্দেহ। বিশ্বাস করা যায় না এ সব লোককে। সজল অতিশয় ক্ষীণ ও ক্লান্তকণ্ঠে বললো, আমি একজন ইভাকুইজ; আরাকানের পার্ব্বত্যপথ আর দুর্গম বন জঙ্গল পার হয়ে ব্রহ্মদেশ থেকে হেঁটে এসেছি। সমস্ত লোক তখন বিস্ময় স্তব্ধনেত্রে তার দিকে চেয়ে রইলো! মানুষ এত পথ হেঁটে আসতে পারে! এমনি হয় তার চেহারা! দেহে রক্ত মাংস আছে বলে মনে হয় না; কতকালের গুহাবাসী যেন অনাহারে কঙ্কালসার হয়েছে। অস্থি আর পঞ্জরগুলো যেন ফুটে বেরুচ্ছে। ওর কাঁধের ওপর ওই শিশুটি কে? শিশুটি সজলের কাঁধের ওপর সমস্ত অঙ্গ এলিয়ে দিয়ে চলে' পড়েছে। জীবিত না মৃত বুঝা যায় না। ওটি কি তার ছেলে! সজল তাদের জিজ্ঞাসু নেত্রের দিকে চেয়ে

করুণ কোমলকণ্ঠে বললো, পথের সাথী। বলে' সামনের একটা নাপিতের দোকানে গিয়ে ছ'মাসের চুল দাড়ি কেটে আধুনিক ভদ্র সভ্য মানুষ হয়ে একটা হোটেলে গিয়ে স্নানাহার করলো, ছেলেটিকেও টাটকা দুধ খাইয়ে একটু তাজা করলো। সর্ব্বাঙ্গে মৃত্যুর অবসাদ। সন্ধ্যাকালে সজল শুয়ে পড়লো, নিমিষের মধ্যে অসীম মৃত্যুসম নিদ্রা এসে সকল অঙ্গ অবশ করে' দিলো। কিন্তু নিদ্রার সাথী স্বপ্ন, সঙ্গে সঙ্গে বিপুল ভয়াবহ স্বপ্নে সজলের চোখ যেন কাঁপতে লাগলো—কত পাহাড় পর্ব্বত, ঘন অরণ্য, গিরি-গহ্বর, ঝড় বৃষ্টি সজলের দু'টী চোখের সামনে তাণ্ডব-লীলা করলো। সজল ভয়ে শিউরে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেলো। জেগে রইলো তার অসীম দু'টী চোখ। অবোধ শিশু তার পাশে শুয়ে। সজল শিশুর দিকে চেয়ে ভাবলো, অনেকদিন পর পেট ভরে' খেতে পেয়ে ছেলেটি যেন অকাতরে ঘুমোচ্ছে। পৃথিবীর সমস্ত প্রলয় ধ্বংস এর দু'টী ছোট নিদ্রিত চোখের পাশে যেন কত তুচ্ছ। মাতৃহারা শিশু কত অসহায়। সমুদ্রবক্ষে ভেসে যাওয়া তৃণের মত দিশাহারা এর জীবনের গতি। এ শিশু কি জানে কত প্রলয় পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে তাকে টেনে আনা হয়েছে। হায় শিশু, কত ভাবনাহীন গভীর সুনিদ্রা তোর চোখে! ইচ্ছা হয় তোর মত অবোধ শিশু হয়ে এ বিশ্বটাকে গভীর ঘুমের আঁধারে রেখে ফাঁকি দিয়ে চলি।

সহসা ছেঁড়া জামার ওপর পকেটে চোখ পড়লো। মুক্তার হারটা অসংখ্য তারকার জ্যোতিঃ নিয়ে যেন জ্বলছে। হোটেলের ঘরে যেন শত মণি-দীপ জ্বললো। সজল সেদিকে চেয়ে শিউরে' উঠলো স্তব্ধ অপলক নেত্রে। এ ঐশ্বর্য্য বেদনার ঘাযে আজ সমস্ত বিশ্ব ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। মহাযুদ্ধ, মহাপ্রলয়, মহা অন্ধকার সারা পৃথিবীতে। কিন্তু তবু এ এ ঐশ্বর্য্যের মায়া ত্যাগ করা ভার। সজল মুক্তার হারটার বহ্নিস্পর্শে যেন কাঁপতে লাগলো, বহ্নিস্পর্শ ই বটে। কার হার কোথায় এসে পড়েছে,

আজ কোথায় সে ছাত্রী মুক্তা? কোথায় বৌদি? কোথায় পাখী? কোথায় আজ সে প্রেম, সে ভালবাসা, সে হৃদয়-রাঙা জীবনের কুসুম স্বপ্ন? একটা বিরাট পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে ছুটে চলেছে এ জীবন ও জগতের স্রোত। ভালবেসেছিলাম পাখীকে। বোমাবর্ষী এক প্রলয় রজনীর অন্ধকারে বৌদিকে সাক্ষী করে' করেছিলাম ওকে পত্নীরূপে গ্রহণ। সজল আর ভাবতে পারলো না, দু'টী চোখ তপ্ত অশ্রুনীরে ভরে' উঠলো। কিন্তু পার্ব্বত্য পাষাণ-পথের ধূলায় সে প্রেম হয়ে গেলো ধূলিসাৎ। কি ভীষণ ঝড় উঠলো সমস্ত পর্ব্বত-শ্রেণী কাঁপিয়ে। প্রবল বেগে আকাশ ভেঙে নামলো বৃষ্টি। অরণ্য আর পর্ব্বতে যেন বান ডাকলো। ভেসে গেলো ঘন অরণ্য, ভেসে গেলো পাখী। এ দু'টো বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে' রাখতে পারলাম না তাকে মৃত্যুস্রোত থেকে। উগ্র প্রকৃতির কাছে ব্যর্থ হ'লো আমার সকল পুরুষত্ব। শুধু নম্র ভীরু পথিক হয়ে পথের পাশে দাঁড়িয়ে সব দেখলাম, করতে পারলাম না কিছুই। মানুষ কি করতে পারে? সামান্য একটা তৃণ-পত্র ছিন্ন করবার শক্তি আছে কি মানুষের? বিরাট বিপুল শক্তিশালিনী প্রকৃতির সমুখে মানুষ ধূলিকণা মাত্র। কোথায় সে উড়ে যায় প্রকৃতির নিশ্বাস-ঝড়ে। বাঁচাবার, রক্ষা করবার, সৃষ্টি করবার শক্তি আছে কি মানুষের? মানুষ কি পারে শুষ্ক তৃণ খণ্ডে সবুজ প্রাণের রঙ লাগাতে? মানুষ শুধু ধ্বংসের অধিকারী, শুষ্ক পত্রে পারে সে আগুন লাগাতে, নিমিষের মধ্যে মহাশ্মশান করে' তুলতে সমস্ত জগৎ।

মুক্তার হারটা জল্ জল্ করে' জলছে। সজল সেদিকে চেয়ে বলে' উঠলো: কোথায় মুক্তা? আজ হয়তো সে ক'লকাতা অনেক লোকের মাঝে হারিয়ে গেছে সামান্য একজন ভিখারিণীরূপে। তার কণ্ঠে যে এ মুক্তামণি দুলতো এ কথা আজ আর কেউ বিশ্বাস করবে না। হয়তো আজ তার কণ্ঠে কত তৃষ্ণা সামান্য একটু জলের জন্য। হয়ে

হয়তো কত বেদনা, চক্ষে হয়তো কাঙাল কাতর অশ্রু। সজলেরও চোখ দু'টী ভিজে উঠলো। মুক্তার ঘরে ঢুকে এ মুক্তামণি কুড়িয়ে পেয়েছে। মুক্তারই স্মৃতি-চিহ্ন। মুক্তার অঙ্গেরই স্নেহস্পর্শমাখা এ মুক্তা-হারের প্রতিটি মুক্তা। মুক্তার যদি আবার দেখা পাই তার ভূষণ তার অঙ্গেই আবার ঢেকে দেবো। পাখীকে ক্ষণিকের দুর্ব্বলতায় সাজিয়েছিলাম এ মুক্তা মালায়, কিন্তু ঐশ্বর্য্য তার অঙ্গে সইলো না। প্রাণের পবিত্র প্রেম তাকে রাখতে পারলো না। সে চলে' গেলো প্রেম ও ঐশ্বর্য্য দুটোকেই অবহেলা করে'। ধরায় মানুষের সব আয়োজন কত ব্যর্থ, কত অর্থহীন তা' সে বুঝতে পেরে চলে' গেলো ঐ অনন্ত আকাশের সঙ্গে এক হয়ে মিশে থাকতে। প্রেমের ও ঐশ্বর্য্যের অধিকারী শুধু ঐ এক মহাপুরুষ। ধরার মানুষ শুধু পথের এ ধূলির প্রেমের অধিকারী। শুধু দু'দিনের জন্য পাখীকে পেয়েছিলো বুকের কাছে। বুকের অসীম পরশ দিয়ে পাখীকে ঢেকে রাখতে চেয়েছিলো। ভেবেছিলো তার প্রেমে পাখীর হবে মুক্তি, আর পাখীর প্রেমে তার হবে মুক্তি। ধরার প্রেমে তারা স্বর্গের দ্বার খুলতে চেয়েছিলো। চেয়েছিলো তারা মানব-প্রেমে দেবতার প্রেম। কিন্তু কোথায় যেন ভুল হয়ে গেছে। কোথায় যেন গুপ্ত ছিল একটুকু দুর্ব্বলতা। হয়তো দেহের কামনা। তাই সেই সোনার পাখী স্বর্ণপিঞ্জর ছেড়ে কোন্ অজানা সুদূরে উড়ে চলে' গেছে। মস্ত একটা অভিশাপ রেখে গেছে তার জীবনে। সজল ঐ পিছে ফেলে-আসা পার্ব্বত্য পথের পানে চেয়ে আবার চোখ মুছলো। রাত্রি ভোর হয়ে গেলো। সজলের চোখের সামনে ভেসে উঠলো আবার যুদ্ধ-পীড়িত মানব-বিশ্ব।

চার মাস পরে ডাক্তার সাহেব একদিন মুক্তাকে ভালো করে' পরীক্ষা করে' দেখলো, তখন সে ভালো হয়েছে। রোগ তার কিছুই নয়, শুধু

খেতে না পেয়ে শরীর খারাপ হয়েছিলো। এখন মুক্তা পূর্ণ স্বাস্থ্যবতী। আর তাকে হাসপাতালে রাখা চলে না। শুধু ভদ্রলোকের মেয়ে বলেই এতদিন বিশেষ যত্নে ও তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে। কাল মুক্তাকে হাসপাতাল ত্যাগ করতে হবে; কাল তার ছুটী। ডাক্তার সাহেব এ কথা বলে' চলে' গেলেন। কাছে ছিলো নার্স, সে সর্ব্বদা মুক্তাকে দেখাশুনা করতো। ডাক্তার সাহেব চলে' যাবার সময় তার কাণে কি যেন বলে' গেলো। ডাক্তার চলে' গেলে নার্স মুক্তাকে বললো, দেখুন, আপনার বোধ হয় স্বামী আছে? আপনি যে গর্ভবতী?

মুক্তা শিউরে উঠলো! তার সমস্ত অঙ্গ কি যেন এক ভীষণ আতঙ্কে কাঁপতে লাগলো। সে গর্ভবতী! চোখের সামনে জেগে উঠলো ভয়াবহ এক পুরুষ মূর্ত্তি, দেবব্রত। তাড়াতাড়ি রাঙা কম্বলটা দিয়ে সে সমস্ত মুখ চোখ ঢেকে ফেললো। এ মুখ বিশ্বের অতল অন্ধকারে ডুবে যাক। শেষে তাড়াতাড়ি আবার নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে কম্বলের ভিতর থেকে নার্সের কথার জবাব দিলো, হাঁ, সে বিবাহিতা, কিন্তু কিছুদিন হ'লো স্বামী নিরুদ্দেশ।

নার্স বললো, দুর্ভিক্ষের দিনে অনেক স্বামীই আজ বাংলাদেশ ছেড়ে পালিয়েছে। বলে' নার্স চলে' গেলো।

রাত্রি তখন বারোটা। মুক্তা ভাবলো: আজ রাত্রি ভোর হ'লেই তা'কে হাসপাতাল ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু জীবনের এ কলঙ্ক নিয়ে সে যাবে কোথায়? কে আছে তার? কে এ কলঙ্কিনীকে স্থান দেবে? ছিলো একমাত্র মা; কিন্তু না খেয়ে খেয়ে সেদিন মাও মরে' গেলো। মরেনি বেঁচেছে! তার মেয়ে মুক্তা যে গর্ভবতী এ কলঙ্কের সংবাদ তাকে শুনতে হ'লোনা। কিন্তু কে তা'র জীবনের ওপর টেনে দিলো এতবড় একটা কালো যবনিকা? কে তা'র জীবন ভরে' দিলো ধিক্কার দিয়ে? কম্বলের নীচে মুক্তার চোখের ওপর বারবার ভেসে

ওঠে একটি পুরুষ মূর্তি।—বাংলার সভ্য, ভদ্র সমাজের একজন পুরুষ—দেবব্রত। মুক্তা মুখের ওপর থেকে রাঙা কম্বলটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। চোখের সামনে থেকে রক্তপিপাসু দেবব্রতের দানব মূর্ত্তি দূরে সরে' যায়। মুক্তার সমস্ত শিরা উপশিরা কি যেন এক তীব্র দাহনে জ্বলে' ওঠে। মানুষকে এ ভাবে পদদলিত করবার কোন অধিকার মানুষের নেই। আজ হাজার হাজার দরিদ্র গৃহস্থ, কুলী মজুর দেবব্রতের ঐ চালের গুদামের চতুর্দ্দিকের বস্তিতে দিনের পর দিন না খেয়ে অস্থিচর্ম্ম-সার হয়ে বাস করছে, রোগযন্ত্রণায় ভুগছে, মরে যাচ্ছে, কিন্তু দেবব্রত তবু গুদামের চাবি বন্ধ করে' মোটা লাভের আশায় বসে' বসে' দিন গুনছে। মুক্তা কম্বলটা গা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে বসলো। নিজের দেহের দিকে চেয়ে শিউরে উঠলো—এ দেহ সে একটা কুকুর দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করেছে। সেই কুকুরকে আবার নিজে বাঘিনী সেজে ভক্ষণ করবে। বলে' মুক্তা নিজের বেড থেকে নীচে নেমে দাঁড়ালো। রাত তখন দু'টো। সমস্ত হাসপাতাল নীরব নিস্তব্ধ। মুক্তা নিজের বেড থেকে ধবধবে সাদা বিছানার চাদরটা তুলে' নিয়ে মাথায় একটা পাগড়ী বাঁধলো। মাথার চুল পাগড়ীতে ঢেকে গেলো। তারপর হাসপাতালের সেই সবুজ মোটা ডোরা কাটা ফতুয়া ও পাজামা পরে' পথের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লো।

রাত্রি প্রভাত হ'লে মুক্তা দেবব্রতের গুদামের দিকে ছুটলো। গুদামের নিকটবর্ত্তী বস্তির দুর্ভিক্ষপীড়িত দরিদ্র কুলী মজুরদের ডেকে সভা করে' তরুণ বীরের বেশে মুক্তা বক্তৃতা দিলো—তোমরা মানুষ; মানুষের মতো বেঁচে থাকবার অধিকার তোমাদের আছে। তোমরা আজ যে চালের অভাবে না খেয়ে মরতে চলেছো, সে চাল তোমাদের নিকটেই একটা জঙ্গলের ভিতর গুদাম ভর্ত্তি আছে; সে চাল আজ রাত্রে লুঠ করে' এনে তোমাদের এ বস্তীতে বিতরণ করে' দেবার

আদেশ নিয়ে আমি শহর থেকে এসেছি। আমি শ্রমিক-সঙ্ঘের তরুণ সেবক। তোমাদের কোন ভয় নেই। না খেয়ে মরতে চলেছে যারা তাদের আবার ভয় কি? মরতেই যদি হয় তবে না খেয়ে মরবে কেন? লুঠ করে' পেট ভরে' খেয়েই বরং মরা ভালো। এসো, আমাকে অনুসরণ করো। বুভুক্ষিতের দল উত্তেজনায় মেতে উঠলো। সেদিন রাত্রি দুটোর সময় গুদামের তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে দেখে সব ব্যর্থ! সমস্ত গুদাম শূন্য, হাহাকার করছে যেন; এই আক্রমণ-কারীদের পেটের ক্ষুধার মতো। এর মধ্যেই দেবব্রত চাল চোরা বাজারে বিক্রী করে' ফেলেছে। মুক্তার গা' জ্বলে' উঠলো। শ্রমিকদের বললো, জেলে দাও সমস্ত গুদাম। ভস্ম হয়ে যাক বাংলার ধনীদের এ অত্যাচারের লীলাস্থল। নিমিষের মধ্যে আগুনের শিখা আকাশে ঠেকলো।

কিছুদিন পর সজল চট্টগ্রাম থেকে ক'লকাতা চলে' এলো। একদিন ট্রামে ললিতবাবুর সঙ্গে দেখা হ'লো। আগ্রহকণ্ঠে তাঁকে সজল বললো, একি ললিতবাবু যে! ভালো তো? কি করে' এলেন? হেঁটে, না জাহাজে? বম্বিংএর দিন মনে ক'রেছিলাম আপনি হয়তো আর নেই, নদীর জেটীতে মরে পড়ে আছেন।

ললিতবাবু হেসে বললেন, না, জাপানী বোমা ব্যর্থ করে' দিয়েছি। মাথার ওপরে পড়েনি একটিও, চারদিকে পড়েছে। তাড়াতাড়ি নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে' কোনো রকমে বেঁচেছি। প্রাণ কি সহজে যায়, জীবনে কষ্ট আছে যথেষ্ট, তাই বেঁচে এসেছি।

সজল হেসে বললো, কেন বাঁচবেন না? ধনী লোকেরই বেঁচে থাকা উচিত, নইলে গরীবের সর্ব্বনাশ করবে কে?

—ঠিক কথাই বলেছো। টাকা পয়সা রোজগার করতে গিয়ে গরীবের মুখের গ্রাসই কেড়ে নিয়েছি, ক্ষুধায় একমুঠি অন্ন দিইনি কাউকে।

লক্ষ লক্ষ মানুষের অভাব অভিযোগের কাছ থেকে দূরে সরে' থেকে বিপুল ঐশ্বর্য্য নিয়ে বেঁচে থাকার মধ্যে যেন আর কোন অর্থ খুঁজে পাই নি। ছেলেপিলে নেই, একমাত্র স্ত্রী—এ অর্থে কি হবে? কিন্তু সে কথা যাক, তুমি এখানে থাকো কোথায়?

সজল তেমনি হেসে বললো, আমার থাকার জায়গার অভাব? পথে ঘাটে, যেখানে সেখানে।

ললিতবাবু বললেন, চিরটাকাল কাটালে একভাবে! নিজের জীবনের প্রতি এতটুকু দরদ নেই তোমার। এখন না হয় একটা কাজকর্ম নিয়ে বিয়ে করে' সংসারী হও। যুদ্ধের বাজার, তার ওপর এম. এ. পাশ করা ছেলে—বড় চাকুরী পাবে নিশ্চয়।

সজল এবার একটু করুণকণ্ঠে বললো, হেঁটে আসবার পথের পাশে জীবনের সমস্ত সংসারের ভার ফেলে এসেছি. আর ওপথে নয়।

ললিতবাবু কিছু বুঝতে না পেরে বললেন,—তার মানে?

সজল বললো, মানে কিছু নেই, কিন্তু সে কথা যাক। আপনি এখন কি করছেন?

ললিতবাবু বললেন, কি আর করবো, সেই কাঠের ব্যবসাই। সামান্য কিছু টাকা-কড়ি নিয়ে এসেছিলাম, তাই দিয়ে আবার ব্যবসা জুড়েছি। আমার কাঠগোলা নিমতলা ঘাট স্ট্রীট। যেয়ো একদিন। বলে' ললিতবাবু সামনের মোড়ে ট্রাম থেকে নেমে পড়লেন।

জীবনের সব কিছু হারিয়ে যাবার মধ্যে একটা অপার আনন্দ আছে। সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হয়ে এমনি বিজন মাঠের পাশে নির্জ্জন বৃক্ষছায়ার তলে গা ঢেলে দিয়ে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকার ভিতরে যে আনন্দ তার মূল্য ধনীর শুভ্র শীতল সুসজ্জিত শয়নকক্ষের চেয়েও অনেক বেশী। আজ মিন্টু বৌদির ছেলেটাকে একটা অনাথ আশ্রমে দিয়ে এসে গড়ের মাঠে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলের পাশে একটা গাছের নীচে সবুজ

কোমল ঘাসের ওপর শুয়ে সজল ভাবছে—এইতো জীবন? এমনি ধরার ধূলার ওপর মিশে এক হয়ে থাকা। তার জন্ত এত আয়োজন কেন? শ্বেতপাথরে গড়া এই যে ভিক্টোরিয়া হল, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জীবন কি ধরে' রাখতে পেরেছে? তবে আর এ ঐশ্বর্য্যের রত্নপুর সাজিয়ে রেখে কি লাভ? তার চেয়ে এ দিগন্তর ব্যাপী তৃণাচ্ছাদিত এ সবুজ কোমল মাঠ, ঐ অনন্ত নীল আকাশ—এর মাঝে মিশে থেকে গোপনে জীবনের পথে এগিয়ে চলার ঐশ্বর্য্য কি কম? হাত দিয়ে একটি তৃণপত্র ছিঁড়ে চোখের সামনে ধরে' মনে মনে সে বললো—এক মহা প্রলয়স্রোতে ছুটে চলেছে এ জগৎ স্রোত—অনাদি-কাল হ'তে আজ পর্য্যন্ত। এ স্রোত-সমুদ্রে মানুষ এ তৃণের মত কত তুচ্ছ; শুধু তরঙ্গ-বুদ্বুদ্। তবে? ধন রত্ন, টাকা পয়সা আর ঐশ্বর্য্যের পানে ধাওয়া কেন? তারপর ঘাসের ওপর কাণ পেতে চুপ করে' থেকে সজল মা বসুন্ধরার কথা শুনলো। কতক্ষণ পর ধরিত্রিমাতা কি যেন বিদ্যুৎ ধ্বনিতে শিউরে উঠে বললো—না, তবু এ স্রোত-সমুদ্রের বুকেই মানুষ গড়ে' তোলে জীবনের কীর্ত্তিস্তম্ভ। এ স্রোত-সমুদ্রের তীরে তীরেই গড়ে' রাখতে হয় ঐশ্বর্য্য স্তম্ভ। এ ঐশ্বর্য্য আছে বলেই জীবনের আছে সুর, সংগীত, হাসি, কান্না, কলরব। সজল আবার শিউরে উঠলো। তাকেও ছুটে চলতে হবে এ হাসি-কান্না, কলরব ভরা জীবন-সমুদ্রের বুকে। এই ধন-দৌলত, টাকা-পয়সা ও ঐশ্বর্য্যের পিছনে, মহা তৃষ্ণার পিছনে। তবেই তো জীবন, তবেই তো সে মানুষ। এ জীবনের সুর এমনি সুন্দর, মধুর, যখন মানুষ বিপুল ধনের অধিপতি। সে আজ নিজেও বিপুল ধনের অধিপতি—সে কি সত্যই রিক্ত? তার নিঃস্ব জীবন ঐশ্বর্য্য দিয়ে ভরে' দিয়ে গেছে মুক্তা! আজ সে মুক্তার মুক্তাহারের মালিক। সে হার তার জামার বুক পকেটে, তবে আর ভয় কি? তার সমুখে বিরাট বিপুল কর্ম্মক্ষেত্র

পথ। সে পথের ঐশ্বর্য্য হবে মুক্তা; মুক্তার এ কণ্ঠহার। তার সমস্ত স্বপ্নে, সমস্ত কর্ম্মে, বেঁচে থাকবে মুক্তা। জীবনের ধ্রুবতারার মত। এ মুক্তাহারের ভিতর দিয়েই সে জয় করবে ছাত্রী মুক্তাকে।

সজল ভূপভূমি ছেড়ে কি যেন এক বহ্নিস্পর্শে উঠে পড়লো। সোজা নিমতলার কাঠগোলায় গিয়ে ললিতবাবুর সঙ্গে দেখা করে' বললে, আমায় দশ হাজার টাকা ধার দিন, এ মুক্তাহার আপনার কাছে রইলো যেদিন টাকা ফিরিয়ে দেবো, সেদিন এ হারও ফিরিয়ে দেবেন।

ললিতবাবু স্তব্ধ ও বিস্মিত চোখে হারের দিকে চেয়ে থেকে বললো, এ হার কোথায় পেলে?

—বম্বিংএর দিন রেঙ্গুনে।

ললিতবাবু বললেন, সর্ব্বস্ব হারিয়ে ফেলার দিন যখন আসে, মানুষ তখন এমনি অমূল্য ধন পিছে ফেলে ছোটে। এই বলে' সজলকে তিনি বিশ হাজার টাকা দিলেন আর মুক্তার হারটি একটি সোনার কৌটায় রেখে দিয়ে বললেন, এখানে রেখে দিলাম, যখন খুসী নিয়ে যাবে। এ হার আজকালকার বাজারে অমূল্য, বিশ হাজার টাকাও এ হারের কাছে তুচ্ছ

বাংলাদেশের সর্ব্বত্র তখন জাপানী বিমানের হানা চলেছে। মহাযুদ্ধের আয়োজনে বাংলার সর্ব্বত্র সৈন্য ঘাঁটী ও সৈন্যের হাসপাতাল নির্ম্মাণ হচ্ছে। নার্স রূপে দুর্ভিক্ষপীড়িত বাঙালী মেয়ে পীড়িত সৈন্যদের সেবা-যত্ন করছে। বাঙালী মেয়েরা গোরা সৈন্যের গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে দু'বেলা পেট ভরে' খেতে পাচ্ছে। বঙ্গনারী আজ নিজেকে গোরা সৈন্যের কাছে পেটের দায়ে বিলিয়ে দিচ্ছে। বঙ্গকুলবধূ আজ গোরা সৈন্যের শিবিরে কখনও ধাত্রীরূপে, কখনও নর্ত্তকীরূপে, কখনও বা শয্যাসঙ্গিনীরূপে।

মুক্তা এমনি একটা সৈন্তের হাসপাতালে এসে ধাত্রীরূপে নিযুক্ত হ'লো। সুদূর পাড়াগাঁয়ের একটা হাসপাতাল, তার চারদিকে দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রাম, মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের ঘরবাড়ী। মুক্তা এ গ্রামেরই একপাশে এক সংসারবিরাগিনী বৈষ্ণবীর ঘরে আশ্রয় নিলো। লাল টুকটুকে ফুলের মতন মেয়েটিকে মুক্তার কোলে দেখে বৈষ্ণবী বললো, মায়ের উপযুক্ত মেয়েই বটে। কিন্তু মা, তুমি কাঁচা বয়সে এমন রূপ নিয়ে সৈন্তদের মধ্যে চাকুরী করতে এলে কেন? তোমার স্বামী কোথায়?

মুক্তা আজ আবার নিজের প্রস্ফুটিত দেহের পানে চেয়ে চমকে' উঠলো। তার দেহের যৌবনই তার কাল হয়েছে। তার অঙ্গের মুকুলিত রূপই আজ তাকে তিলে তিলে দগ্ধ করছে। যেখানে যায় সেখানেই এ দেহ মস্ত বড় প্রশ্ন তুলে' তাকে পাগল করে' তোলে। এ দেহই তার জন্ম যেন পথেঘাটে চারিদিকে ছড়িয়ে রেখেছে পুরুষ-শত্রু। তার এ দেহশিখা যদি এ মুহূর্তে নিভে যেতো, এ যৌবন-দীপ যদি এ মুহূর্তে পুড়ে ভস্ম হয়ে যেতো, এ যৌবনে যদি সে ষাট বছরের বৃদ্ধার মতো শুভ্রকেশ, লোলচর্ম, স্খলিত দন্ত, নিষ্প্রভ আঁখি, বধির শ্রবণ পেতো তবে আর তার ভয় ছিলো কি? কে চাইতো তার দিকে? কিন্তু তার দেহে এ দুরন্ত যৌবনানল যেন দীপ্ত হয়ে জ্বলছে, একটুকুও নিভেনি। সত্যি এ গোরাদের হাসপাতাল, এ সৈন্তদের রক্তচক্ষুর সম্মুখে অক্ষত দেহে সে কি করে' টিকে থাকবে? তবে সে কাজ নিলো কেন? কেন সে এখানে ধাত্রীরূপে নিযুক্ত হ'লো? কিন্তু তার যে আর উপায় নেই। সে দাঁড়াবে কোথায়? সে যে কলঙ্কিনী? ঐ দেবব্রত সভ্য শিক্ষিত ভদ্র বাঙালী তাকে যে আজ পথের পাশে টেনে এনেছে। সে যে আজ ঐ ছোট্ট মেয়েটির মা। সে জানে হাজার হাজার অপবিত্র নারী ভ্রূণহত্যা করে' নিজের কলঙ্ক আবরণ

টেনে দিয়ে জগৎকে ফাঁকি দেয়; কিন্তু সে তা করেনি, কেন সে তা করবে? মানুষের একটা তৃণপত্র ছিঁড়বার অধিকার নেই। একটা শিশুর জীবন হত্যা করবার অধিকার—সে কথাতো ভাবতেও শরীর শিউরে ওঠে! না, এ কাজ সে কিছুতেই করতে পারেনি। এ যে গুরুতর অপরাধ, মহা অন্যায়, মহাপাপ। তার গর্ভজাত এ সোনার শিশু আজ তার সমস্ত হৃদয় আঁকড়ে ধরে' বেঁচে থাকতে চায়। সে দিন দিন বেড়ে উঠতে চায় তারি স্নেহ-সুধা পান করে'। আর আজ সেও চায় মাতৃত্বের দাবী নিয়ে এ শিশুকে সর্ব্ব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে গড়ে' তুলতে। এ শিশুকে লোকের সামনে, সমাজের সামনে গড়ে' তুলতে—জননীরূপে। তাই সে আজ ছুটে এসেছে এ সৈন্যের হাসপাতালে। চাকুরী নিয়েছে সে এখানে ধাত্রীরূপে; নিজে খেয়ে বাঁচতে, এ শিশুকে বাঁচাতে। তার এ যৌবন-বিকশিত দেহ জননীর দেহের মত পবিত্র রেখে কাজ করে' খেতে। কিন্তু এটা সৈন্যের হাসপাতাল। তার এ দেহ পবিত্র রাখতে দেবে কি ঐ রক্তপিপাসু সৈন্যের দল? সেদিন এক মুঠো চালের অভাবে দেবব্রতকে দেহ দান করেছিল। কিন্তু আর নয়, আজ সে কাজ করে' খেতে জানে।

এতক্ষণ পর মুক্তা বৈষ্ণবীর কথার উত্তরে বললো, মাসিমা, আমার এ যৌবনই হয়েছে আমার জীবনে একটা মস্ত অভিশাপ। স্বামী আজ ছ'মাস হ'লো নিরুদ্দেশ। কি করবো, পেটের দায়ে এ কাজ নিতে স্বীকার করেছি।

বৈষ্ণবী বললো, কিন্তু নিজেকে একটু সামলে চলো মা, সৈন্যেরা কি মানুষ? ওরা মেয়েদের মাংস কাঁচা খায়।

মুক্তা আজ প্রায় চার বৎসর পর নিজের মুখ আয়নার ভিতর দিয়ে দেখলো। এত সুন্দর সে? মুখ চোখ থেকে ঝরে' পড়ছে যেন রূপের শিখা। কপোল তলে যেন পুষ্পরাগ। ললাট-প্রান্তে অরুণ-

আভা। অধর প্রান্তে যেন চন্দন গন্ধ। চুল যেন আষাঢ়ের কালো মেঘ। কিন্তু দিনের পর দিন তার দেহ ও মনের ওপর দিয়ে যে প্রলয় ঝড় যাচ্ছে তাতেও কি দেহের জ্যোতিঃশিখা নিভন্ত হয়নি? মুক্তা দীর্ঘশ্বাস টানলো। দুরন্ত যৌবনকালের কঠোর আঘাতের বাইরে দারিদ্র্যপীড়িত ভিখারীর মেয়েও যৌবনে সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়। যতই সে অনাহারে থাক, দেহের যৌবন আপনিই ফুটন্ত হয়ে সারা দেহে জেগে থাকে প্রকৃতির আলো বাতাসের জীবন্ত গোপন পরশে। এ যৌবন আলোকলতার মত আপনিই মুকুলিত হয়ে ওঠে সর্বাঙ্গ স্বর্ণরঞ্জিত করে'। মুক্তা আবার নিজের দিকে চেয়ে ভাবলো—যে সৈন্য বোমা নিক্ষেপ করে, ধ্বংস করে মানব পৃথিবী; তাদের সম্মুখে এ রূপ, এ যৌবন? না তা কিছুতেই নয়, আজ সে জননী, আজ সে মা, আজ তার এ মুকুলিত অঙ্গ ঢেকে দিতে হবে কুশ্রীতা দিয়ে। দেহের প্রতি কোণে কোণে জাগিয়ে তুলতে হবে কুৎসিতা নারীর অঙ্গরেখা। মুক্তা আজ বেশ-পরিবর্তন করলো। বৈষ্ণবীর পরিত্যক্ত একখানা থান কাপড় পরলো। বৈষ্ণবীর কালো বড় বড় বোতাম-আঁটা একটা জামা গায়ে দিয়ে গলা পর্যন্ত বোতাম বন্ধ করলো। গলে বৈষ্ণবীর তুলসীর মোটা মালা। ললাটে ও নাসিকায় চন্দনের তিলক। মুক্তা আবার আয়না দিয়ে মুখ দেখলো, দেখে মনে মনে হাসলো। হেসে বৈষ্ণবীকে ডেকে বললো, মাসিমা, এবার ঠিক মানিয়েছে তো?

বৈষ্ণবী বললো, কিন্তু মাথার চুলগুলো দেখলে মনে হয় কাঁচা বয়সের বৈষ্ণবী। মুক্তা একটা পরামানিক ডাকলো; মাথার সমস্ত চুল কেটে ছোট করলো। একটা আধ-ময়লা কাপড়ের টুকরো মাথায় বাঁধলো। একগুচ্ছ দীর্ঘ কালো চুল বসেছে মেঝের ওপর পড়ে রইলো। কালো চুলে সারা মেঝেটি যেন ঝলমল করতে লাগলো। মুক্তার দেহমাধুর্য

আজ ধূলায় লুণ্ঠিত। মুক্তার যৌবনপ্রভা সারা ঘরে ছিন্নচ্যুত হয়ে পড়ে যেন কাঁদলো। মুক্তার চোখে এলো জল। সে আজ সত্যসত্যই সর্ব্বস্বহীনা কুৎসিতা নারী। আজ সে নির্ভয় চিত্তে হাসপাতালে ঢুকলো। মুক্তা সৈন্যসেবায় নিযুক্ত হ'লো।

সংগ্রাম তখন সংহার-মূর্ত্তি ধরে' সারা বাংলার বুক জুড়ে বসে আছে। চারিদিকে হাহাকার। নাই চাল, নাই ডাল, নাই তেল, নাই লবণ, নাই বস্ত্র, নাই ব্যাধির ওষুধ। চাল ডাল যা কিছু আছে, তাও বড় বড় ব্যবসায়ীর হাতে ব্ল্যাক্-মার্কেট চলছে। লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা পেয়ে বাজারে ছাড়ছে। জনসাধারণ এক টাকার চাল দশ টাকায়ও কিনতে না পেরে অনশনে দিন কাটাচ্ছে। তার ওপর গভর্ণমেণ্ট আবার এ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সেই এক টাকার চাল দশ টাকা দিয়ে কিনেই গুদাম বোঝাই করে' রেখে লক্ষ লক্ষ সৈন্যের ভাতের ব্যবস্থা করছে। এমনি করে' বাংলার ও বহির্বাংলার ধনিকসম্প্রদায় ও গভার্ণমেণ্ট মিলে যখন বাংলার বুকে ঘুঘু চড়াচ্ছে, সজল তখন বাংলার পানে চেয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস টানলো।

বাংলার মানুষ মৃত। বাংলার পুরুষ আজ ভীরু, কাপুরুষ, ক্লীবত্ব-প্রাপ্ত। সজল ঘন দীর্ঘশ্বাস টেনে শান্ত হ'লো। ভরসা নাই, এ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মৃত্যুমুখী বাংলাকে রক্ষা করার। এর প্রতিবন্ধক দেশের এই ধনিক-সম্প্রদায়, গুদাম ভর্ত্তি চাল কিনে রেখে যারা ব্ল্যাক্-মার্কেট করছে। সজল দেখলো,—এ বন্ধন ছিন্ন করতে হ'লে চাই দেশের সমস্ত লোকের কেন্দ্রীভূত শক্তি, যা এদেশে অসম্ভব। অথবা নিজে কোটীপতি হ'য়ে রক্ষা করতে হবে দেশ; দিতে হবে অন্ন ক্ষুধাক্লিষ্ট লক্ষ লক্ষ নীরব মুখে। দিতে হবে বস্ত্র হাজার হাজার নগ্নদেহে; নিজে নিঃস্ব হয়ে কেউ দেশের কল্যাণ সাধন করতে পারে না। চাই টাকা, চাই অর্থ, চাই বৈভব; দেশের জন্য, লোকের জন্য, প্রপীড়িত বাংলার জন্য।

সে আজ নিঃস্ব নয়, মুক্তার কণ্ঠহার তাকে করে' গেছে ধনী। সে বৈভবশালী—তার আর ভয় কি। সে আজ রাজা। সজলের বুকে জেগে ওঠে মুক্তার সেই স্নিগ্ধ শান্ত সুশ্রী মুখখানি। সজল কি যেন প্রেরণায় ফুটে ওঠে। সে আজ ছুটে চলতে চায় কর্ম্মময় জীবন-প্রবাহে। ললিতবাবুর নিকট থেকে বিশ হাজার টাকা নিয়ে এসে সে ব্যবসা আরম্ভ করলো। বাঙ্গালীর আহার্য্য কোন বস্তু কিনে সে ব্ল্যাক্-মার্কেট্ করতে গেলোনা। সে এক আনার দামের ব্লেড্ ছ' আনায় বিক্রী করে' বিশ হাজার টাকায় এক লক্ষ টাকা মুনাফা পেলো। দিলো সে ব্লেডের ব্যবসা ছেড়ে। সরকার থেকে রাস্তা নির্ম্মাণের চুক্তি নিলো। বছর দু'য়ের মধ্যে সে প্রায় বিশ লক্ষ টাকার মালিক হয়ে পড়লো। ঠিক এই সময় ক'লকাতা শহরে একদিন রাত ন'টা থেকে রাত বারোটা পর্য্যন্ত জাপানী বোমা বর্ষিত হ'লো। ভয়ানক রব উঠলো যে, ক'লকাতা এবং ক'লকাতার আশে-পাশে যত বড় বড় ফ্যাক্টরী ও মিল আছে সব জাপানী বোমার টার্গেট্; শীঘ্রই এ সমস্ত ফ্যাক্টরী ও মিলের ওপর বোমা পড়বে।

শ্রীরামপুর ক'লকাতার নিকটবর্ত্তী স্থান। এখানে কয়েকটা কটন মিল বাংলার সম্পদরূপে দাঁড়ানো। হাজার হাজার কাপড় এখান থেকে প্রতি বছর তৈরী হয়ে সমস্ত বাংলার নগ্নতা ঢেকে দেয়। হাজার হাজার কুলীমজুর, তাঁতী এ সকল মিলে কাজ করতো। কিন্তু এখানে মিলের ওপর বোমা পড়বে শুনে তারা প্রাণভয়ে সরে' পালাতে সুরু করলো। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে সব মিল প্রায় বন্ধ হয়ে গেলো। এমন কি মিলের মালিকরা পর্য্যন্ত স্ত্রীপুত্র নিয়ে মিল বন্ধ করে' পালাতে লাগলো। কোন কোন মিলওয়ালা যা' তা' দামে মিলের সমস্ত স্বত্ব বিক্রী করে' নিজ দেশে চলে গেলো। অধিকাংশ মিলেরই মালিক ঐ মাড়োয়ারী গোষ্ঠী। কিন্তু সজল সকলকে অবাক করে' দিয়ে এমনি এক পলাতক

মাড়োয়ারীর কাছ থেকে "শ্রীরামপুর উইভিং মিল" নামক মিলটির সমস্ত স্বত্বাধিকার কিনে সঙ্গে সঙ্গে ললিতবাবুকে বিশ হাজার টাকা দিয়ে মুক্তার সেই মুক্তাহারটি ফিরিয়ে আনলো এবং "মুক্তা কটন মিল" নাম দিয়ে নীরব নিস্তব্ধ মিলে আবার কর্মকোলাহল জাগিয়ে তুললো। গুহাগহ্বর সদৃশ ইন্‌জিনের নির্ব্বাপিত বিরাট চুল্লী আবার প্রচণ্ড অনল শিখায় প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো। ইন্‌জিনের চিম্‌নী বেয়ে বিপুল কালো ধোঁয়া আকাশে উঠলো। বোমা আর পড়লোনা। যে সমস্ত লোক পালিয়ে গিয়েছিল সকলে আবার এসে কাজে লাগলো। যারা আগে মিলে কাজ করতো না, তারাও এসে সজলকে বললো, বাবু, এ দারুণ দুর্ভিক্ষে না খেয়ে মরছি কাজ দিন; মাইনে চাইনে, শুধু চাল আর কাপড় চাই। সজল মিলের কর্মীদের জন্য মিল কিনবার সঙ্গে সঙ্গে সরকারের অনুমতি নিয়ে হাজার দশেক মণ চালও কিনে রেখেছিলো। সজল ক্ষুধা-ক্লিষ্ট এ সমস্ত ম্লান মুখগুলির দিকে চেয়ে বললো, বেশ, কাজ করো, চাল পাবে; পরবার কাপড়ও পাবে। দেশের নিরন্নদের জন্য আমার এ মিলের দরোজা দিবারাত্রি খোলা থাকবে।

হাজার হাজার লোক এসে কাজে ঢুকতে লাগলো। এ সমস্ত কাঁচা হাতগুলি দু' তিন মাসের শিক্ষায় পাকা হয়ে উঠতে লাগলো। এ সমস্ত লোকদের মিলে কাজ শেখাবার জন্য পৃথক কার্য্যদক্ষ লোক রয়েছে। তারা উচ্চ বেতনভোগী। পুরুষদের মতো শত শত মেয়েরাও এসে ক্ষুধাহত মুখ দেখিয়ে মিলের কাজে এসে ভর্ত্তি হলো। এ সমস্ত নূতন মেয়েদের কার্য্যক্ষম করে' তোলবার জন্য বিদেশী মেয়ে-এক্‌স্‌পার্ট নিযুক্ত করা হ'লো। মেইল এণ্ড ফিমেইল ডিপার্টমেন্ট নাম দিয়ে মেয়েদের পৃথক ব্যবস্থা করা হ'লো। মেয়েদের কারখানার সামনে উইমেন্ অন্‌লি—পুরুষ এখানে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ইত্যাদি লিখে রাখা হ'লো। মেয়েদের জন্য লেডী সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত করা হ'লো।

যুদ্ধ-পীড়িত দুর্ভিক্ষক্ত বাংলার অনেক মেয়ে তখন নৈতিক চরিত্রে দুর্বল হয়ে পড়েছে। খেতে না পেয়ে অনেকে বারাঙ্গনাবৃত্তি ধরেছে। এদের মধ্যে অধিকাংশই তখন সজলের মিলে ঢুকে খেতে পেয়ে শৃঙ্খলভাবে জীবন যাপন করবার সুযোগ পেলো। পুনরায় এদের মধ্যে নৈতিক চরিত্রের কোন দুর্বলতা যাতে না আসে সে দিকে দৃষ্টি রাখবার জন্ত মেয়ে সুপারিন্টেণ্ডেন্টের ওপর কড়া হুকুম দেওয়া হ'লো। রাস্তার ওপর মিলের সদর দরোজায় লিখে রাখা হ'লো—দেশের দুর্গতদের জন্ত এ দ্বার উন্মুক্ত। যার খুশী এখানে ঢুকে কাজ শিখে কাজ করে' খেতে পারবে।

বিজ্ঞাপনের মত এ সব কথা একটা মোটা কাগজে মোটা অক্ষরে লিখে মিলের গেটে মোটা লোহার শিকে বেঁধে কাগজখানা ঝুলিয়ে রাখা হ'লো। নীচে মোটা অক্ষরে স্বাক্ষর রয়েছে মিঃ এস্, দত্ত। কিন্তু মুক্তা কটন মিলের সে কে, তা কিছুই লেখা নাই।

হাজার হাজার লোক এ রাস্তা দিয়ে চলে বিজ্ঞাপন পড়ে—এস্, দত্ত? না, এ নামের প্রসিদ্ধ ধনী বলতে এ অঞ্চলে কারো নাম নাই! তবে এ কে? সকলেই জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে থাকে।

মুক্তা কটন মিলের কাজ জোরে চলছে। খাওয়া-পরা ও বেতন দেবার ব্যবস্থা শুধু এ মিলেই আছে। এ সব দেখে অন্তান্ত মিলের কর্মীরা মাঝে মাঝে ধর্মঘট করছে। তারা শুধু সামান্ত বেতন পায়। মিলের মালিকরা দেখলো, বোমার ভয়ে সব কর্মীরা পালিয়েছে, মিল ভালো রকম চলছে না; এর ওপর যদি আবার ধর্মঘট চলে তবে একেবারে পথে বসতে হবে। সবাই এসে সজলকে বললো, মশায়, আপনি বিনামূল্যে চাল বিতরণ করে' কি আমাদের পথে বসাবেন?

সজল হেসে সোজা জবাব দেয়, খেতে পায় না তাই খেতে দিই।

কিন্তু এমন দানছত্র খুললে আপনার মিল ক'দিন চলবে?

সজল তেমনি হেসে উত্তর দেয়, এ মিল অক্ষয় : দেশের দুর্গতদের ভাগ্যলক্ষ্মী।

এক বৎসরের ভিতর মুক্তা কটন মিলের নাম সারা বাংলায় ছড়িয়ে' পড়লো। কাগজে কাগজে এস্. দত্তের নাম বড় বড় অক্ষরে ছাপা হ'তে লাগলো। সম্পাদকের দল এস্. দত্তের সঙ্গে দেখা করতে চাইলো। বড় বড় পার্টিতে নিমন্ত্রণ করলো। বড় বড় সভা-সমিতিতে প্রেসিডেন্ট করতে চাইলো। বড় বড় ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার করতে চাইলো। কিন্তু এস্, দত্ত আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে জবাব পাঠায়—I most humbly refuse.

লোকে অবাক হয়ে বলে, লোকটা অদ্ভুত, মান-সম্মান চায় না ; এমন কি নামটা পর্য্যন্ত সংক্ষেপ করে' রেখেছে। মিলের নাম রেখেছে মুক্তা কটন মিল। কিন্তু এ মুক্তা কে ? স্ত্রী ? শুনা যায়, ভদ্রলোক বিয়ে করে নি ; আবার কেউ বলে বিপত্নীক। হয়তো তাই হবে—মৃতা স্ত্রীর নামে মিলের নাম রেখেছে। কেউ বলে, ভদ্রলোকের একটি ছেলে আছে ; কিন্তু মুক্তা তো মেয়ের নাম, স্ত্রীর নামেই তাহ'লে মিলের নাম রাখা হয়েছে।

সজলও সত্য সত্যই নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে মুক্তা কটন মিলের কর্ণধার রূপে সকলের কাছে পরিচিত হ'লো।

গাড়ীতে সে কখনো বেড়াতে বেরোয় না ; গাড়ী ছাড়া না হ'লেও চলে। এতবড় পর্ব্বতশ্রেণী ও অরণ্য পথ যে পায়ে হেঁটে পার হয়ে এসেছে তার কাছে গাড়ী তুচ্ছ। গাড়ী আছে দু'খানা—মিলের জরুরী কাজের জন্য একখানা আর একখানা শুধু সিন্ধু বৌদির ছেলেটিকে বিকাল বেলা একটু মাঠের দিকে বেড়িয়ে আনার জন্য। সিন্ধু বৌদির ছেলেকে কিছুদিন হ'লো আশ্রম থেকে এনে নিজের কাছে রাখা হয়েছে। সজল যখন বার হয়, তখন সে পায়ে হেঁটেই পথ চলে।

পথের দু' পাশের দুঃস্থ পীড়িত ব্যক্তিদের লোকের খোঁজ খবর নেয়। মিলে যারা কাজ করতে পারে না, পীড়িত রুগ্ন, তাদের জন্ত ডাক্তার ডেকে ডাক্তারের ফি দিয়ে ওষুধ আর পথ্য কিনে অসুখ সারিয়ে মিলে ভর্ত্তি করে' দেয়। এমনি করে' শ্রীরামপুর নাম শ্রীসম্পন্ন হয়ে উঠলো; শ্রীরামপুরের অবস্থা ফিরে গেলো। পথঘাটগুলো বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠলো। পথের ওপর দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের এখন আর সে কাতর ক্রন্দন নাই; কুলী-মজুর সকলের মুখেই এখন শ্রীসম্পন্ন হাসি। মিলের আশে পাশে বন-জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে' সে সব স্থানে পীচ্ ঢেলে নূতন পাকা রাস্তা করা হ'লো। মজুরদের ছেলেপিলের লেখাপড়া শেখবার জন্ত এ রাস্তার ওপরেই আবার স্কুল ঘর নির্ম্মাণ করা হ'লো; তারি পাশে অসুখবিসুখের জন্ত প্রকাণ্ড হাসপাতাল। আমোদ-প্রমোদ ও স্বাস্থ্য-চর্চ্চার জন্ত প্রকাণ্ড খেলার মাঠ। এমনি করে' সকলের দেহে জেগে উঠলো রক্তের শিখা; জীবনপূর্ণ আলো। স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধের হাসি মুখে চোখে। ঘরে ঘরে বসলো প্রীতির আসর।

মিলের কম্পাউণ্ডের ভিতরেই প্রকাণ্ড বাড়ী শ্বেত পাথর নির্ম্মিত। একখানা ঘরে খাটের ওপর সামান্ত বিছানা পেতে সজল রাত্রে ঘুমোয়। আসবাব-পত্রের মধ্যে একটা সেক্রেটেরিয়েট টেবিল; টেবিল ভর্ত্তি মোটা মোটা বই—ইকনমিকস্, পলিটিক্স্ ও রবীন্দ্র-কাব্য। ঘরের দেওয়ালে একটা ওয়াল ক্লক; ঘড়িটা রোজ ঘন্টাখানেক পিছিয়ে চলে। যদি বলা হয় ঘড়িটা সারিয়ে নিলে হয় না? সজল হেসে উত্তর দেয়—সময় ছুটে চলছে মহাকালের পানে, সেখানে ঘড়ির অস্তিত্ব কতটুকু? দেওয়ালের ওপাশে ঝুলানো তিনখানা ফটো: রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী ও নেতাজীর। কবির ফটোর নীচে দেয়ালের গায়ে লাল পেন্সিল দিয়ে লিখে রাখা হয়েছে: বাঙালীর স্তব্ধ নীরব বুকে তুমি দাও ভাষা। গান্ধীজীর নীচে লেখা রয়েছে: তুমি দাও স্বাধীনতার বাণী।

নেতাজীর নীচে "জয় হিন্দ"। অপর দেয়ালে আঁকা রয়েছে শ্রমিক ও বণিক। দ্বন্দ্বযুদ্ধে রত Labour fighting the Capital. অপর পাশে আঁকা অর্দ্ধ উলঙ্গ এক নারী, কোলে তার উলঙ্গ শিশু। দুর্ভিক্ষে কঙ্কালসার দেহ। ধূলি মলিন বেশ, অশ্রুসিক্ত দু'টী চোখ, নীচে লেখা রয়েছে, "বাঙ্গলার মা"। সজলের ঘরের সামনেই প্রকাণ্ড একটি হল-ঘর, রাজকক্ষের মতো শুভ্র সমুজ্জল। বিখ্যাত শিল্পীর শিল্পকলায় পরিশোভিত। ভারতসম্রাট শাহজাহান আমলের ভাস্কর্যে কক্ষটি ঐতিহাসিকময়। কক্ষের ঠিক মধ্যস্থলে নীল পাথরের প্রকাণ্ড ময়ূর-পক্ষী। ময়ূরপক্ষীর পৃষ্ঠে বসানো রজত-সিংহাসন। সিংহাসনের চূড়ায় শ্বেত পাথরের একটি কাকাতুয়া পাখী। পাখীটির স্বর্ণখচিত চঞ্চুপুটে মুক্তার মুক্তাকণ্ঠহার। এ ময়ূর-সিংহাসনের ঠিক ওপরে এক গুচ্ছ বিজলী-বাতি সিলিং হ'তে ঝুলানো; বাতিগুলো থেকে নানা বর্ণের আলো ঝরে—লাল, সবুজ, গোলাপী। সারারাত আলো জ্বেলে রাখা হয়। কাকাতুয়ার চঞ্চুতে মুক্তার হার সে আলোর অপূর্ব্ব জ্যোতিঃতে জ্বলতে থাকে। সজল প্রত্যহ শোবার আগে এ ময়ূর সিংহাসনের সম্মুখে জানু পেতে বসে' যুক্তকরে ব্যথাতুর নম্র কণ্ঠস্বরে বলে: ভবনের লক্ষ্মী ভবনে এসো। তোমার জন্যই পেতে রেখেছি এই সিংহাসন। মিলের অধীশ্বরী তুমি, তুমি দিয়েছিলে ধন; আমি শুধু রেখেছি সে ধনের মান। এ ছাড়া এ মুক্তা কটন মিলের আমি কে? লোকে জানে এ মিল আমার কিন্তু আমি জানি এ মিল তোমার।

সজল এর পর নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। রাত্রি অধিক, দু'টী চোখ নিমিষে মুদে আসে। নিমিষে স্বপ্ন ঘনায় চোখের কোণে। মুক্তা কোথায় কোন অজানা দেশে হারিয়ে গেছে। সে দেশ দুর্যোগের প্রলয় অন্ধকারে যেন ঢাকা। মহামারী, মহাদুর্ভিক্ষ, মহাসমর সে দেশ যেন শতছিন্ন করে' দিচ্ছে। সে দেশের লোক যেন শৃগাল কুকুরের

খেতে খেতে না পেয়ে পথে ঘাটে মরে পড়ে রয়েছে। সে সব মৃত দেহের ওপর কাক আর শকুন বসে' পচা মাংস খাচ্ছে। মুক্তা যেন এখনো বেঁচে আছে; কিন্তু প্রাণভয়ে চারিদিকে ছুটোছুটি করছে। কোথাও পালাবার স্থান নেই, যেদিকেই যায়, কি যেন এক যমদৈত্য পিছু পিছু তাড়া দিচ্ছে। ভয়ে তার বুক যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। মুক্তার যেন সেই গৌরী সুন্দর রূপ আজ আর নাই। অঙ্গের সেই কোমল কান্তি আজ যেন ঝরে পড়ে গেছে। সে আজ বিভীষিকাময়ী কুৎসিতা কুরূপা নারী। সজলের স্বপ্ন-মৌন চোখ দু'টী সহসা কি যেন আতঙ্কে থর থর করে' কেঁপে ওঠে; ঘুম তার ভেঙে যায়। বীভৎস স্বপ্ন যায় টুটে। সজল জেগে ওঠে। দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলে, হয় তো বেঁচে নেই। সজলের আর ঘুম হয় না। বিছানায় বারবার এপাশ ওপাশ করে' শুধু দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে। রাত্রি ভোর হয়ে যায়, মিলের বাঁশী বাজে। ধুতি পাঞ্জাবী, জহর কোট ও শুভ্রজালী টুপী পরে' সজল বেরিয়ে পড়ে। আজ আর মিল পরিদর্শনে গেলো না। দু' পকেট ভর্ত্তি দশ টাকার নোট নিয়ে মাঠের শেষে বহুদূরে একটা গরীব বস্তীতে ঢুকে মুক্তার সমবয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে সেগুলো বিলিয়ে দিলো। মুক্তা হয়তো আর এ জগতে নেই, কিন্তু এ মেয়েগুলো মুক্তারই সমবয়সী। মুক্তা-মিলের ওপর এদেরও দাবী আছে। মুক্তার মুক্তাহারের উপার্জ্জিত অর্থের ভাগ এরাও পেতে পারে। এদের ভেতর দিয়েই সজল ঐশ্বর্য্যময়ী মুক্তাকে পাবার আনন্দ উপভোগ করে। শূন্য পকেটে ঘরে ফিরে এসে নিজেকে পরিপূর্ণ মনে করে। নিজের ডাইরীতে লিখে রাখে মুক্তাকে আজ বস্তীর দরিদ্র মেয়েদের ভিতরে পেলাম।

•

সাময় আঘাতপ্রাপ্ত ইংরাজ সৈন্য বেডে শুয়ে শুয়ে সিগারেট খাচ্ছে, একটার পর একটা। মুখের ধোঁয়াগুলি মুক্তার দিকে ফুঁ দিয়ে

ছেড়ে বলছে, Ugly Indian, bloody nurse. বলে পাশ ফিরে শোয়। মুক্তার গায়ের রক্ত যেন টক্‌বগ্‌ করে' ফুটে ওঠে। মুক্তা মনে মনে ভাবলো: Ugly Indianই বটে! সমস্ত ভারত আজ সংগ্রামপীড়িত, দুর্ভিক্ষপীড়িত; সমস্ত ভারত আজ একটা বৃহৎ হাসপাতালে পরিণত; ভারত রমণী আজ কলঙ্কিনী ধাত্রীরূপে সে হাসপাতালে নিযুক্ত। কেন? এজন্য দায়ী কে? তোমরা নয়?

সৈনিক পুরুষ আবার পাশ ফিরে মুক্তার দিকে চেয়ে বলে' Sitting idle! you hell! বলে' তার হাত মুক্তার দিকে প্রসারিত করে। মুক্তা প্রসারিত হাতের দিকে চেয়ে ঘৃণায় জ্বলে ওঠে! এ হস্ত নিক্ষেপ করেছে কত বম্ব্‌ মানব-আবাসের ওপরে, মাতৃক্রোড়ে স্তনপায়ী কত শিশুর ওপরে।. সৈন্য মাত্রই মানবধ্বংসী, সভ্য মানবসমাজের বুকে মহা কলঙ্ক। মুক্তা নীরবে হাত টিপতে থাকে। লোহার মত শক্ত হাত ক্ষ্যাপা রক্তের উষ্ণ প্রবাহে ভরা যেন! সারা বিশ্ব শ্মশান হবে চলছে যেন এ হাতের নিষ্পেষণে! এ হাতে তার হাতের পরশ? প্রলয় ঝড়ের সমুখে এ কিশলয়-কুসুম? মুক্তা হাতখানি ঠেলে সরিয়ে দিয়ে উঠে পড়ে। ঘরে ফিরে এসে বৈষ্ণবীকে বলে, মাসিমা, বিষ আছে?

বৈষ্ণবী চম্‌কে ওঠে। বিষ!

—হাঁ, মাসিমা, বিষ। আছে? দিতে পারো আমায়?

—কেন গো? বিষ দিয়ে কি হবে, খেয়ে মরবে নাকি?

মুক্তা বিষণ্ণকণ্ঠে বলে, বেঁচে আছি আর কবে? পৃথিবী শুদ্ধ লোক তো আজ মরেই আছে; কিন্তু সে জন্য নয়, বিষ আমার দরকার হাসপাতালের রুগীদের জন্য।

—কেন বিষ খাইয়ে রোগীদের মারতে চাও নাকি?

—মারতে চাইনে। মানুষ দেবতা. তাদের উষ্ণ রক্তে হিমের পরশ

চালাতে চাই। সৈন্যের রক্ত শীতল না হওয়া পর্যন্ত দেশ ঠাণ্ডা হবে না। যুদ্ধ কে চায়? তুমি না আমি? কেউ না। সৈন্য কে চায়? তুমি না আমি? কেউ না। ভদ্র শিক্ষিত ভালো মানুষের দেশে সৈন্য মহা কলঙ্ক নয় কি?

বৈষ্ণবী যৌবনকালে প্রেমে পড়েছিলো। প্রেমিককে না পেয়ে মনের দুঃখে বিষ খেয়ে মরতে চেয়েছিলো। কিনেছিলো সেদিন বিষ, কিন্তু মরতে তার সাহস হয়নি।

এর বছরখানেক পর বৈষ্ণবী আবার এক বৈরাগীর প্রেমে পড়েছিলো কিন্তু এ বৈরাগীও তাকে ত্যাগ করে' কোথায় চলে গেলো। আগের বিরহে মরবার জন্ম বিষের কৌটাটি এবারও হাতে তুললো; কিন্তু সাহস হ'লোনা। এমন নির্দ্দয় পুরুষগুলোর জন্ম সে প্রাণ দিতে যাবে কেন? এবং সেই অবধি পুরুষ জাতের ওপর তার ভয়ানক আক্রোশ জন্মেছিলো; এ জাতকে বিশ্বাস করতে নেই। আর না, প্রেমে আর সে কখনো পড়বে না। বলে সে বিষের কৌটাটি যত্ন করে' রেখে দিয়েছিলো। যদি কোনদিন ঐ বৈরাগীর দেখা পায়— যে তাকে ভুলিয়ে এনে বৈষ্ণবী করে' ছেড়ে দিয়েছে, তাকে সেই বিষ খাইয়ে মারবে। কিন্তু বৈরাগীর সঙ্গে আর দেখা হ'লোনা। মুক্তার হাতে আজ সেই কৌটাটি দিয়ে বললো, তাই হোক মুক্তা তাই হোক, দেশ ঠাণ্ডা হোক। এ পুরুষ জাতি সর্ব্বনাশের মূল।

মুক্তা আবার হাসপাতালে এসে সৈনিকের পাশে বসলো। আঁচলে বাঁধা বিষের কৌটো।

দেশে গরু নাই; সংগ্রামের ক্ষুধায় লেগেছে সব। কাজেই দেশে দুধ নাই; দুধপোষ্য লক্ষ লক্ষ শিশু আজ শুষ্ককণ্ঠ। কিন্তু হাসপাতালের ড্রেইনে দুধের জোয়ার, রোগীরা খেয়ে যা থাকে ফেলে দেওয়া হয়। প্রত্যেক রোগীর বেডের পাশে ছোট টেবিলের ওপর বাটিভরা দুধ।

পার্শ্বস্থিত রোগীর দুধের বাটীটি মুক্তা হাতে তুলে নেয়; আঁচলে বাঁধা কৌটাটীর কথা ভাবে। কিন্তু মানুষ দেবতা, সৈন্তেরাও মানুষ। মুক্তা ঘরে ফিরে এসে বৈষ্ণবীকে বিষের কৌটা ফিরিয়ে দিয়ে বলে, পারলাম না মাসিমা! ভারতীয় নারী জানে শুধু পালন করতে, সেবা যত্ন করতে; বিষ মিশাতে নয়।

কিছুদিন পর হাসপাতাল গেলো উঠে। ক্ষণিকের রোগী, ক্ষণিকের হাসপাতাল, ক্ষণিকের নার্স। মুক্তার চাকুরী গেলো শুনে বৈষ্ণবী বললো, এখন উপায়? ভিক্ষাও আমার উঠে গেছে, কেউ কিছু দেয় না। ছিলাম তোমার ভরসায়। হাসপাতালে চাল ডাল পেতে তা'ও গেলো, এখন দু'জনেই উপোস করি।

মুক্তা চিন্তিত হয়ে আকাশ পাতাল ভাবে। রেঙ্গুনের বড়বাজারের চালের বস্তা ভর্ত্তি তাদের সেই গুদামগুলি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ঘন দীর্ঘশ্বাস টেনে বলে—যুদ্ধ! একমুষ্টি চালের জন্ম আজ তার কত ভাবনা, একমুষ্টি চালের জন্ম তার দেহ দান···। অস্ফুটস্বরে মুখ থেকে বের হয়—নরকঙ্কাল ঐ দেবব্রত। তারপর বৈষ্ণবীর দিকে করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললো, মাসিমা, উপোস থাকবো কেন? র‍্যাশন শপে গেলেই চাল ডাল সব মিলবে।

বৈষ্ণবী বলে, বেশ, যাও। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইন ধরে' দাঁড়াও গিয়ে।

তখন গভর্ণমেণ্ট থেকে র‍্যাশন শপ খুলছে। কষ্ট করে' ঘণ্টা দুই তিন রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে বাঁধা দরে চাল ডাল ইত্যাদি সব পাওয়া যায়।

কিন্তু র‍্যাশন শপে যত খুশী চাল মিলে না। জনপ্রতি একপোয়া। পেটের ক্ষুধাকেও একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম মেনে চলতে হবে। কাজেই সমস্ত গরীব জনসাধারণকে গভর্ণমেণ্টের ডিসিপ্লিন্ মেনে চলতে হবে।

রোদে লাইন ধরে' দাঁড়াবার ডিসিপ্লিন্, পেটের ক্ষুধা কমানোর ডিসিপ্লিন।

মুক্তার আজ লাইনে দাঁড়াতে একটু দেরী হয়ে গেছে, একটু দেরী হওয়ার জন্ত তাকে আজ প্রায় তিনশো মেয়ের পিছনে দাঁড়াতে হ'লো। সব নিম্নশ্রেণীর মেয়েমানুষ। মুক্তাকেও আজ নিম্নশ্রেণীর মতোই দেখায় কাপড় চোপড়ে। কিন্তু মুখের দিকে চাইলে সব যেন ভুল হয়ে যায়। এ মেয়ে এ শ্রেণীতে এলো কি করে'? এতগুলি ক্ষুধার্ত মেয়ে কঙ্কালের মাঝে এ মেয়েটি ক্ষুধাক্লিষ্টা হ'লেও কঙ্কাল নয়—কি যেন একটা বৈশিষ্ট্য ওকে সকলের থেকে পৃথক করে' রেখেছে।

ঘণ্টা তিনেক এত রৌদ্রে ও এত ঠেলাঠেলির মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে এ ক্ষুধাতুরদের শ্বাস রুদ্ধ হয়ে ওঠে, পা অবশ হয়ে ওঠে, পা ব্যথায় টনটন করে' ভেঙে পড়ে যেন। সমস্ত শরীরে ঘামের জল, পরিহিত বস্ত্র সিক্ত, স্থানে স্থানে করুণ চোখে মুখে বোবা কান্না। এত ঠেলাঠেলিতে আর কতক্ষণ থাকা যায়? পিছন থেকে বুক দিয়ে ঠেলে; সমুখ থেকেও পিঠ দিয়ে ঠেলে। চাপ দু'দিক থেকেই লাগছে। চাপের চোটে পাতলা ছিপছিপে মেয়েরা একবার মাটি থেকে শূন্যে উঠছে; আবার চাপ একটু কমে' গেলে মাটিতে নামছে। তার সমস্ত দেহের ওপর দিয়ে যেন ঝড় দোলা বইছে। বাংলার গৃহকোণে পালিত পরমাসুন্দরী লজ্জানত গৃহলক্ষ্মীরা আজ এক মুষ্টি চালের জন্তে লজ্জা সঙ্কোচ ত্যাগ করে' শহরের প্রশস্ত রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে ধূলিধূসরিত অর্দ্ধ নগ্নদেহে চীৎকার করে' আর্তকণ্ঠে বলছে—ওগো, দোর খোলো, চাল দাও। কিন্তু এখনো দুয়ার খোলার সময় হয় নি, বেলা চারটে বাজলে দোকানের দুয়ার খোলা হবে; কিন্তু এ চারটে বাজার অপেক্ষায় লাইন ধরে' দাঁড়াতে হয় সেই সকাল বেলা থেকে। চারটে যখন বাজলো, তখন দুয়ার খুলে' চাল বিতরণ চললো। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার

আর ঠেলাঠেলি সুরু হ'লো। বঙ্গনারীর কণ্ঠে আজ পীড়িত লাঞ্ছিত ধ্বনি। চীৎকার করে' ঠেলাঠেলি করে' একটু আগে চালটা পেলেই তো উনুন ধরাবে ঘরে, নচেৎ উপোস।

এ ভাবে এ প্রলয় নৃত্যের মাঝে মাত্র ঘণ্টাখানেক সময় চাল বিতরণ হ'লো। মুক্তার আগের মেয়েরা সব চাল পেয়েছে, এবার মুক্তার পালা আসতেই দোকানের দরোজা বন্ধ হয়ে গেলো। আজ আর হবে না, পাঁচটা বেজে গেছে। মুক্তার ক্ষুধাক্লান্ত অবসন্ন দেহখানি দরোজার সামনে নুয়ে পড়লো। আজ যে ঘরে এককণা চালও নেই; কি খাবে রাত্রে? চাল তার আজ চাইই, মুক্তা জোরে দরোজা ধাক্কা দিয়ে বললো, ওগো, খোলো; চা'ল আমার চাইই। দোকানের ভিতর থেকে গলার আওয়াজ এলো—র‍্যাশন অফিসারের গলার আওয়াজ। ইতিমধ্যে দোকান পর্য্যবেক্ষণে এসেছে। সে বললো, দূর হ' মাগী, পাঁচটা বেজে গেছে, আজ আর চাল পাবি না।

বাঙালী অফিসার। নূতন চাকুরী পেয়েছে, এতদিন বিড়ির দোকানে বসে' বিড়ি খেতো আর হাই তুলে চোখ বুঁজে যক্ষারোগীর মত কেশে দিন কাটাতো। হঠাৎ দরোজা খুলে বেরিয়ে এসে পায়ের বুট দিয়ে মুক্তাকে জোরে লাথি মেরে দোকানের সিঁড়ির ওপর ফেলে দিয়ে আবার দরোজা বন্ধ করে' দিলো। মুক্তার কপালের কাছ দিয়ে কেটে গিয়ে রক্ত বার হ'লো। তাজা টাটকা রক্তে সিঁড়ি রক্তময় হয়ে গেলো। মুক্তা মূর্চ্ছিতা।

সন্ধ্যার ছায়া তখন ঘনিয়ে এসেছে। মেয়েরা সব চলে গেছে—কেউ চাল পেয়ে কেউ চাল না পেয়ে। এদিকটা তখন নির্জ্জন। দু' একজন যারা এদিক দিয়ে চলছে, তারাও উপেক্ষা করে' চলে যাচ্ছে। ভিখারী এখন রাস্তাঘাটে কত পড়ে' থাকে; কে কার খোঁজ নেয়। অনশনক্লিষ্ট, মুমূর্ষু এমন বহু লোক আজকাল বাংলার পথেঘাটে। আগে একটা কুকুর বিড়াল এভাবে পথের ধারে মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে'

থাকলে লোক সামনে দাঁড়িয়ে একটু আহা করতো, কিন্তু আজকাল মৃত মানুষ দেখেও উপেক্ষা করে' চলে যায়। এমনি উপেক্ষার দৃষ্টি ফেলে আজ গজেনও এপথ দিয়ে চলছে। গজেন একবার ওদিকে চেয়ে ভাবলো—অল্প বয়সের মেয়েটি, কিন্তু রক্ত কেন? না খেয়ে যারা মরে তাদের শরীরে তো রক্ত থাকে না? না খেয়ে থেকে থেকে সে রক্ত তো অন্তরেই শুকিয়ে যায়। গজেন সামনে গিয়ে ভালো করে' চেয়ে দেখলো, কপাল কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে, গজেন তাড়াতাড়ি তুলে ধরে' ওঠাতেই দেখে দিদিমণি! তাড়াতাড়ি কোলের ওপর শোয়ালে, বিস্ময় ও শঙ্কাজড়িত কণ্ঠে বললো, একি! দিদিমণি, তুমি এখানে পড়ে, মাথা দিয়ে রক্ত পড়ছে যে!

মুক্তা আস্তে আস্তে চোখ মেলে চাইলো।

সে গজেনকে চিনতে পারলো। চিনতে পেরে তার রুদ্ধ অশ্রু আর বাধা মানলো না। দু'চক্ষের ধারায় যেন ব্যথিত সুর ভেসে আসলো—যুদ্ধ! দুর্ভিক্ষ! র‍্যাশন শপ! বাঙ্গালী অফিসার! তারপর চোখের জল মুছে বললো, হাঁ গজেন, আমি এখানে পড়ে। আমাকে নিয়ে চলো।

—কিন্তু যাবে কি করে' কপাল কেটে রক্ত পড়ছে যে!

মুক্তা বেদনাচ্ছন্ন ম্লান কণ্ঠে বললো, রক্ত নয় গজেন, রক্ত নয়—র‍্যাশনের চাল। আমি তোমার কাঁধে ভর করে' হেঁটেই যেতে পারবো, কাছেই আমার ঘর।

—কাছে ঘর হ'লো কি করে? সেই বৈঠকখানার বাসা?

—মুক্তা সহজ সুরে বললো, সে কথা আর তুলো না, সে অনেক কথা…। তুমি সেই সোনার চুড়ি নিয়ে…।

গজেন মাথা দিয়ে বললো, পালিয়ে গেলাম? কিন্তু পালাইনি দিদিমণি, চুড়ির বদলে চাল নিয়ে ঘরে ফেরবার সময় পুলিশে ধরে'

নিয়ে গেলো। ছ মাস জেল খেটে গায়ের হাড় ক'খানা নিয়ে বেরিয়ে দেখলাম, বাংলাদেশে কারো ঘরে ভাত নেই। কেউ আমাকে রাখলো না। না খেয়ে মরবো এবার নিশ্চয় জানলাম। এমন সময় শুনলাম—শ্রীরামপুরের মস্তবড় এক ধনীর কথা। কে এক কি দত্ত, ইংরেজী নামটা মনে পড়ছে না, মস্ত বড় একটা মিলের মালিক। দুর্ভিক্ষপীড়িত সমস্ত কুলীমজুর ও নীচু শ্রেণীর লোককে ডেকে নিয়ে মিলে কাজ দিচ্ছে। তার মিলে কাজ নিলাম। দেখি এক বিরাট ব্যাপার—হাজার হাজার স্ত্রী পুরুষ সেখানে কাজ নিয়ে বেঁচে গেছে।

—গজেন, আমায় সেখানে নিয়ে যেতে পারো? আমিও কাজ করবো।

—বেশ দিদিমণি, চলুন, সেখানে কাজ করলে থাকা, খাওয়া, মাইনে সবই পাবে! র‍্যাশন শপে আর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না।

মুক্তা সেদিন বৈষ্ণবীকে বললো, মাসিমা, খুকী রইলো তোমার কাছে, শ্রীরামপুরে একটা মিলে আমার কাজ হবার সম্ভাবনা আছে, আমি সেখানে চললাম। কাজ পেলে চাল, ডাল সব পাবো। মাইনে পাবো। র‍্যাশন শপে দাঁড়িয়ে থেকে চালের বদলে রক্ত নিয়ে আর ঘরে ফিরতে হবে না। মাস মাস টাকা পাঠাবো, তুমি নিজে খেয়ো, খুকীকেও খাইয়ো। বলে মুক্তা খুকীকে কোলে তুলে' আদর করে' চুমু খেয়ে বৈষ্ণবীর কোলে দিয়ে চোখ মুছে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো। মুক্তা ও গজেন গাড়ীতে উঠে বসলো।

মাস দুই পর বৈষ্ণবী লিখেছে—মুক্তা, তোমার পত্র পেলাম, মেয়ের কথা লিখেছ—খুকী এখন কেমন আছে। রত্নলেখা এখন বেশ একটু বড় ও মোটা সোটা হয়ে উঠেছে। এখন আর শুয়ে থাকতে চায় না; ঘরময় হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ায়। ঘরের জিনিষপত্র কিছু আস্ত রাখেনা, সব ওলট-পালট করে' ফেলে। এখানকার জিনিষ ওখানে,

ওখানকার জিনিষ সেখানে নিয়ে, নেড়ে চেড়ে, ভেঙেচুরে খেলা করে। ঘরের মেঝের তক্তপোষের নীচে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে সর্ব্বনাশই করে বেশী। আলু, বেগুন, পটল এ-সব তরকারী আর রাখা যায় না; আলুগুলি নিয়ে মার্ব্বেল গুলির মতো খেলা করে—সারা ঘরে ছড়ানো আলু। বেগুনগুলো ছোট কচি হাতে মুঠি করে' তুলে মুখে ঢুকিয়ে দেয়। গিলতে চায়, পারে না—কাশতে কাশতে বমি করে' ফেলে। তাড়াতাড়ি বেগুনটা হাত থেকে আনতে গেলে আবার চীৎকার করে' কাঁদে মা মা করে'। তোমার মেয়েকে নিয়ে আর পারি না, দুষ্টের শিরোমণি হয়ে উঠেছে। এতটুকু মেয়ের দুষ্টোমি বুদ্ধির কথা ভেবে অবাক হয়ে যাই। ঘরে আজকাল ভয়ানক মশা হয়েছে, মশা কামড়ালে আমার পা দু'খানা জড়িয়ে ধরে' কোলে উঠতে চায়। কোলে তুলে নিলে আবার ঝুঁকি দিয়ে তক্তপোষের ওপর নেমে পড়তে চায়, নামিয়ে দিই। কিছুক্ষণ পর এসে দেখি বিছানাপত্রের ইজ্জৎ নেই; মুখের লালা দিয়ে ভিজিয়ে সর্ব্বনাশ করে' রেখেছে। এত অত্যাচার করলে বিছানা ক'দিন টিঁকবে? বালিশের ওয়াড়গুলো পুরানো কাপড়ের; ঐ কচি হাতের দস্তিপনায় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। রাগ করে' কোলে তুলে নিয়ে মুখে চোখে চুমু দিয়ে বলি—দানবী, শয়তানী। এত অত্যাচার আমার সঙ্গে কেন? তোর মা কোথায়? আমি কি তোর মা? বলে' আবার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে' বলি, হাঁ, আমিই তোর মা। আমার বুকের শুষ্ক মাতৃপ্রাণ দিনরাত চীৎকার করে' মরছে—তোর মত একটি লাল টুকটুকে সন্তানের জন্য। এমনি আরো কত কথা বলি বকুলেখার সঙ্গে। শুনে শুধু হি হি করে' হাসে, এমন মেয়েকে ভুলে তুমি কি করে' রয়েছো? একবার ছুটী নিয়ে এসে দেখে যেও। তোমার মেয়ে রাজবধূ হবে; এমন সুন্দর গায়ের রং আর মুখ চোখের

চেহারা। হ্যাঁ, ভাল কথা—এ মাসে আরো দু'টো টাকা বেশী পাঠিয়ো; খুকীকে দুটো জামা করে' দেবো, শীত এসে পড়েছে।

ইতি

তোমার মাসিমা

মুক্তা চিঠিখানা শতবার পড়েও যেন শেষ করতে পারছে না; যতবার পড়ে খুকীর একটা পরিস্ফুট চেহারা তার চোখের সামনে যেন ভেসে ওঠে! রত্নলেখা এখন বড় হয়েছে; হামাগুড়ি দিয়ে চলতে পারে। মুক্তার মাতৃ-হৃদয় ফুল হয়ে ফুটে ওঠে যেন। সন্তানের মা হওয়া নারীর সৌভাগ্য। মুক্তা চিঠিখানা আর একবার পড়তে থাকে। হ্যাঁ, খুকীর জন্ম জামার কথা লিখেছে, টাকা না পাঠিয়ে জামা কিনেই পাঠাবো।

এমন সময় লেডি সুপারিনটেনডেন্ট ডলি দত্ত মুক্তার কাছে দাঁড়িয়ে রুক্ষকণ্ঠে বললো, চিঠি পড়ার সময় এখন নয়। মিলে এসেছো কাজ করতে, চিঠি পড়তে নয়। না খেয়ে মরতে চলছিলে, এখন খাওয়া-পরা পেয়ে দেহখানা কাঁচা সোনা হয়েছে। কাজ কামাই করে' চিঠি পড়া হচ্ছে। জেনারেল ম্যানেজার মিষ্টার সেনের কাছে রিপোর্ট করতে হবে।

সত্যই মুক্তা মিলে কাজ পেয়ে পেট ভরে' খেতে পেয়ে ফুলের মতো ফুটে উঠেছে যেন। মুক্তার দিকে চেয়ে মিষ্টার সেন ডলিকে একদিন বলেছিল, মেয়ের মত মেয়ে, দেখলে চোখ জুড়োয়। মেয়েটি নতুন কাজে ঢুকেছে বুঝি?

মিস্ ডলি দত্তের বয়স পঁচিশের ওপর, এখনো অবিবাহিতা। যৌবন চলে' গেছে কিন্তু পিপাসা যায় নাই। ডলি সেদিন মিষ্টার সেনের কথায় হেসে উত্তর দিয়েছিল, যদি বলেন আলাপ করিয়ে দিতে পারি। দরকার হ'লে ঘরেও পৌঁছে দিতে পারি। এ ধরণের বিশ্রী কথাবার্তা মিষ্টার সেন ও ডলির সঙ্গে প্রায়ই চলে। দু'জনের চলাফেরা আজকাল

সন্দেহজনক বলে মনে হয়। মিলের ডিউটীর পর দু'জনেই এক মোটরে বেরিয়ে কোথায় বেড়াতে চলে যায়। মিষ্টার সেনের স্ত্রী-পুত্র আছে; স্ত্রীটি চিররুগ্না। মিষ্টার সেন সেজন্য প্রায়ই ডলির কাছে দুঃখ করে' বলেন, স্ত্রীসুখ আমার ভাগ্যে নেই মিস্ দত্ত, আপনার মত স্বাস্থ্যবতী নারী পুরুষের বাঞ্ছিত। আপনি যেদিন মেয়ে ডিপার্টমেন্টের হেড হয়ে মিলে কাজ নিলেন, সত্যিই আপনার স্বাস্থ্য দেখে ভালো লাগলো।

ডলি হেসে কথার জবাব দেয়—আমার ভাগ্য ভালো, আমার স্বাস্থ্যটা আপনার পছন্দ হয়েছে। এ স্বাস্থ্য দিয়ে যদি আপনাকে সেবা-যত্ন করতে পারতাম···।

কিন্তু সেবা-যত্ন সে মাঝে মাঝে করে' থাকে, এ কথাও এখন কারো কারো মুখে শুনা যায়, কিন্তু তা অত্যন্ত গোপনীয় কথা। মিলের কেউ জানে না, বাইরের দু' একজনের চোখে পড়েছে। যাদের চোখে পড়েছে তাদের তা জিজ্ঞাসা করলে চুপ করে' যায়। কারণ মিষ্টার সেন এত বড় মুক্তা কটন মিলের ম্যানেজার। মিষ্টার এস্. দত্তের পরই তাঁর দুর্দান্ত প্রতাপ। বিশাল বপু, কালো চেহারা, বড় বড় গোঁফ, রক্তের মত লাল বড় বড় চোখে যার দিকে চান সেইই ভয়ে এতটুকু হয়ে যায়। তাঁর এই ভয়ানক চেহারার দরুণই মিলের মজুররা তাঁর কাছে ভয়ে এতটুকু হয়ে থাকে। কাজের সামান্য ত্রুটীর জন্য যে কোন মজুরকে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে বার করে' দিতে তিনি ছাড়েন না। মিষ্টার সেনের কাছ থেকে সেই শিক্ষা পেয়েই লেডি সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট ডলিও তেমনি কড়া শাসনে মেয়ে-মজুরদের থেকে কাজ আদায় করে' নেয়। মেয়েরাও তার ভয়ে কাঁপে; কাজে অবহেলা করলে শাস্তি পায়। মিলের কাজের উন্নতি অবনতি একমাত্র এ দু'জন কড়া মেজাজী লোকের ওপরই নির্ভর করে। মিল সংক্রান্ত জটিল কোন ব্যাপার ছাড়া এমন কি কাজকর্ম দেওয়া-নেওয়া সম্বন্ধেও এখন মিষ্টার দত্তকে আর

জানানো হয় না। মিষ্টার দত্তও আজকাল এদের ওপর মিলের সমস্ত ভার দিয়ে দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলার দরিদ্রজনসাধারণের সাহায্যার্থে ফাণ্ড খুলে' নিজে মোটা টাকা চাঁদা দিয়ে দেশের বড় বড় লোকের নিকট থেকে চাঁদা আদায় করেন। আজ এখানে, কাল সেখানে—এমনি করে' সমস্ত বাংলাদেশে ঘুরে' চাল ও কাপড় বিতরণ করছেন। প্রত্যহ সংবাদপত্রে তাঁর দানবীর হৃদয়ের শত প্রশংসা ছাপা হচ্ছে।

প্রতি রবিবার স্পেশ্যাল সংখ্যায় তাঁর ফটো ছাপা হচ্ছে। উন্নত ললাট, প্রশস্ত বুক, সুদীর্ঘ দেহের গঠন, পরণে ধুতি পাঞ্জাবী জহর কোট ও মাথায় গুজরাটী টুপি। ফটোর নীচে বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকে S. Datta, owner of Mukta Cotton Mill ; father of the poor and friend of the naked. কাজেই মিল সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যাপার এখন এই দু'জন প্রধান কর্মচারীর ওপর। মিষ্টার দত্ত মাঝে মাঝে এসে দেখে যান, মিলে উৎপন্ন যাবতীয় কাপড় মিল উৎপন্ন মূল্যে দরিদ্রজনসাধারণের নিকট বিক্রী হয় কিনা! কারণ তাঁর মিল উৎপন্ন কাপড় দেশের বস্ত্রহারাদের জন্য, অন্যান্য মিলওয়ালাদের মত সৈন্য সজ্জার জন্য নয়।

আজ ডলি যখন মুক্তাকে চিঠি পড়ার অপরাধে শাসিয়ে বললো, মিষ্টার সেনের কাছে রিপোর্ট করবে তখন মুক্তা সত্য সত্যই ভীত হয়ে উঠলো। কারণ সে মিষ্টার সেনকে ভালো রকমই জানে—তাঁর নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে সে যেন সন্দেহহীন হ'তে পারে না, তা ছাড়া লোকটা বদমেজাজী। একটু দোষ পেলে আর কথা নেই—কাজ থেকে বরখাস্ত অনিবার্য্য। কিন্তু তার কাজ গেলে যে উপায় নেই ; রত্নলেখা ও মাসিমা যে তার ওপরই নির্ভর করে' আছে। জামার কথা লিখেছে—এ-মাসের বেতন পেয়েই সে জামা কিনে পাঠাবে। তার রত্নলেখা সে থাকতে

দীতে কষ্ট পাবে কেন ? সে তার মা—তার স্নেহময়ী মা। কিন্তু সত্যই যদি মিষ্টার সেনের কাছে রিপোর্ট করে' দেয় ? তার যদি কাজ যায়—তবে সে জামা কিনবে কি করে' ? মুক্তার বুক কেঁপে ওঠে।

চিঠি পড়ার অপরাধে ডলি মুক্তার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করার কথা বলেই ক্ষান্ত হ'লো না—রুক্ষ কণ্ঠ আরো রুক্ষ করে' বললো, দেখি কার চিঠি ? জানো, এ মিলে কাজ করলে কোন পুরুষের কাছে গোপনে চিঠি লিখলে অপরাধ হয়। দেখি, কার চিঠি। প্রেমের চিঠি লেখবার জায়গা এটা নয়।

মুক্তার সহ্য হ'লো না—চিঠিখানা জামার নীচে লুকিয়ে বললো, আমার চিঠি সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করা আপনার অন্যায়। আর প্রেমের কথা বলছেন—মিলের কুলীমজুরদের প্রেমের চিন্তার চেয়ে খেয়ে-পরে' বাঁচবার চিন্তাই বেশী। অতবড় একটা উঁচু স্থানে বসে' প্রেমের কথা ভাববার সময় আপনাদের মতো মেয়েরই থাকে।

মিস্ ডলি জ্বলে' উঠলো। এতবড় কথা আমার মুখের ওপর ! এর মজা টের পাবে।

কিছুদিন পর মিষ্টার সেন তাঁর অফিস রুমে মুক্তাকে ডেকে পাঠালেন। মুক্তা চোখের নিমিষে সব বুঝতে পারলো। মুক্তাও একান্ত প্রস্তুত ছিলো। মিষ্টার সেনের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই মিষ্টার সেন তাড়াতাড়ি উঠে এসে দরোজা বন্ধ করে' দিয়ে বললেন, তোমার বিরুদ্ধে ভয়ানক অভিযোগ আছে।

মুক্তা গম্ভীর স্বরে বললো, কিন্তু সে অভিযোগ শুনতে হ'লে কি ঘরের দরোজা বন্ধ করে' শুনতে হবে ?

—Private character নিয়ে আলোচনা কিনা···তাই। তোমার চরিত্রে একটু গোলমাল আছে !

—কি গোলমাল বলুন ?

—মিলের কাজ করতে এসে love letter নিয়ে ব্যস্ত থাকলে চলে না। —প্রেমের পাত্রটি কে শুনি?

—মিলের আইন অনুযায়ী একজন মেয়েমানুষের সঙ্গে ঘরের দরোজা বন্ধ করে' এসব বিশ্রী আলোচনা করা আপনার অন্যায়।

—এবং সে অন্যায়ের শাস্তিদাতা যে আমিই সে কথা বোধ হয় জানো?

—জানি। আর এ কথাও জানি যে, আপনি সকল মজুরের ওপরই এমনি অন্যায় উৎপীড়ন করেন।

—কিন্তু তোমার ওপর করিনি। করবো, যদি আমার কথা না শোনো।

—মিলের কাজ সম্বন্ধীয় আপনার সব কথাই আমি শুনতে রাজী আছি।

—তোমার কাজের কথাই বলছি। তোমাকে মেয়ে ডিপার্টমেণ্টে বড় কাজ দিতে চাই—মজুরীগিরি করতে হবে না—যদি ·····.

—বলুন, থামলেন কেন?

—যদি তোমাকে উপভোগ করতে দাও।

মুক্তা সজোরে দরোজা খুলে' বেরিয়ে আসতে-আসতে বললো, Brute.

পরদিন দেখা গেলো, এক মাসের নোটিশে মুক্তাকে ডিসচার্জ করা হয়েছে।

সিন্ধু বৌদির ছেলে অসীম এখন বড় হয়েছে, বছর ছয়েক বয়স হবে। বেশ মোটা সোটা, স্বাস্থ্য সমুজ্জ্বল, সর্ব্বাঙ্গে যেন কাঁচা সোনা জ্বলছে, এমন সুন্দর গায়ের রং। অসীমকে দেখবার শুনবার জন্ম নার্স ও বয় সারভেণ্ট আছে, লেখাপড়ার জন্ম মাষ্টার আছে। পড়ানো

ছাড়া মাষ্টারের আর একটি কাজ হচ্ছে—সকাল বিকাল অসীমকে নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসতে হয়। বেশী দূরে নয়, মিলের চারপাশ দিয়ে হেঁটে একটু বেড়িয়ে আসা। দূরে গেলে গাড়ীতে যায়। কিন্তু অসীম গাড়ীর চেয়ে হেঁটে লাফালাফি দৌড়োদৌড়ি করে' চলতেই ভালোবাসে। সেদিন লাফালাফি করে' বেড়াবার সময় পড়ে গিয়ে মাথা কেটে যায়; রক্ত পড়ে। মুক্তা সে সময় মিল থেকে ছুটির পর ঐ পথে যাচ্ছিলো। সে দেখতে পেয়ে দৌড়ে এসে অসীমকে অসীম স্নেহে কোলে তুলে নিয়ে নিজের কাপড়ের আঁচল ছিঁড়ে তাড়াতাড়ি মাথা বেঁধে দিলো। মাষ্টারমশায় একটু দূরে ছিলেন, তিনি কাছে এসে দেখেন—অসীম আহত। মুক্তা বললো, এ ছেলেটি আপনার কে হয়? চলুন, আপনাদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি—বড় লেগেছে। মাষ্টারমশায় কিছু না বলে' ঘরের দিকে চললেন। মুক্তা চলেছে তার পিছে পিছে। মিলের কম্পাউণ্ডে এসে রাজপ্রাসাদসদৃশ ঐ প্রকাণ্ড বাড়ীতে ঢুকতেই মুক্তা থমকে দাঁড়িয়ে বললো, এ যে দত্ত সাহেবের বাড়ী? এদিকে যাচ্ছেন কেন?

মাষ্টারমশায় বললেন, অসীম দত্ত সাহেবেরই ছেলে। আমি ওর মাষ্টার। মুক্তা সহসা শিউরে উঠলো। তার মত সামান্য একজন মজুর মেয়ের কোলে রাজার দুলাল? এ তার পক্ষে ভয়ানক দুঃসাহস। সে আজ এদের মিলেরই সামান্য মজুর। হাঁ, সত্যই আজ সে মজুর মেয়ে—রেঙ্গুনের লক্ষপতি উপেন চৌধুরীর মেয়ে মুক্তা আর সে নয়। হঠাৎ তার কাণের ভিতরে যেন বোমা-বর্ষণের শব্দ হ'লো। হাঁ, এ বোমাতেই তার বাবা মারা গেছেন, এ যুদ্ধই করেছে তাকে ছিন্ন, চ্যুত, সর্ব্ব-পরিচয়হীন। মুক্তা অসীমকে কোল থেকে নামিয়ে দিতে চাইলো। অসীম মুক্তার গলা জড়িয়ে ধরে রইলো, নামতে চায় না। অসীম আজ বহুদিন পর যেন মাতৃস্নেহের পরশ পেলো। মা-হারানো

শিশু আজ মায়ের মত স্নেহ পেয়ে মুক্তার অঙ্গ জড়িয়ে ধরে' রইলো। সঙ্গে সঙ্গে রত্নলেখার কথা মুক্তার মনে পড়লো। মুক্তার মাতৃপ্রাণ সঙ্গোপনে জেগে উঠলো। মুক্তার বুকে যেন রত্নলেখাই জড়িয়ে আছে। অসীম আর রত্নলেখার মধ্যে মুক্তা কোন পার্থক্য খুঁজে পেলো না। মুক্তা আবার মাষ্টারমশায়ের পিছে পিছে এগিয়ে চললো। প্রকাণ্ড হল ঘর। হল ঘরে ঢুকতেই নার্স এসে মুক্তার কোল থেকে অসীমকে তুলে পাশের একটা ঘরে ঢুকে পড়লো। ঐ ঘরেই মাষ্টার ও অসীম থাকে। মুক্তা হল ঘরের মধ্যস্থিত ময়ূরসিংহাসনের দিকে বিস্ময়-বিহ্বল নেত্রে চেয়ে রইলো। আস্তে আস্তে সিংহাসনের দিকে এগিয়ে গেলো। একটি কাকাতুয়ার চঞ্চুপুটে ঝুলানো মুক্তার মালা। একি! মুক্তা তার চোখ দু'টোকে বিশ্বাস করতে পারলো না! না না, এ তারই ভুল! নিশ্চয়ই তার ভুল! এ কিছুতেই হ'তে পারেনা। এত স্পর্দ্ধা তার! সামান্য মজুর সে, সে বলতে চায় এ হার তার? সব ভুল, সব ভুল! নিজের ভুলের কথা ভেবে নিজেরই হাসি পায়। হাঁ, ভুল হবারই কথা। আজ ক'দিন যাবৎ সব কিছুতেই যেন ভুল হয়ে যাচ্ছে। আজ এক সপ্তাহ হ'লো সে নোটিশ পেয়েছে, মিল ছেড়ে চলে' যেতে হবে। নারীদেহলোভী ম্যানেজারের হুকুম। হাঁ, ছেড়েই যাবে। দেহ দিয়ে এ নরপিশাচের মন ভিক্ষা করে' মিলে কাজ করতে চায় না সে। কিন্তু এ মুক্তা হার? বিস্ময়, সন্দেহ, সংশয়, আশা, আনন্দ সর্ব্বাঙ্গে ঝড়ের মতো জেগে উঠলো। সে মুক্তাহারের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো নির্ব্বাক নিস্পন্দভাবে। চোখের পরে যেন মুক্তামালার জ্যোতিঃ এক অপূর্ব্ব রহস্য আলোকে জ্বলে' উঠলো— সে আলোক মুক্তাকে অস্থির করে' তুললো। মুক্তার চোখ দু'টী আস্তে আস্তে বুঁজে এলো—মুক্তা কি এক সুদূর ঐশ্বর্য্য স্মৃতির বেদনায় অবশ বিহ্বল হয়ে পড়ে গেলো। মাষ্টারমশায় কাছেই দাঁড়ানো ছিলেন,

তিনি তাড়াতাড়ি মুক্তাকে ধ'রে' তুলে বললেন, আপনি এমন করছেন কেন ? কি হয়েছে আপনার ?

মুক্তা নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বললো, না, কিছু না। শরীরটা ক'দিন ধ'রে একটু খারাপ, তাই। বলে মুক্তা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো।

মুক্তা আজ ছ' মাস হ'লো মিলে এক মজুরের কাজে লেগেছে। সে লেখাপড়া জানে, সে অনায়াসে মজুরগিরি ছাড়া একটু উঁচুদরের কাজ চাইতে পারতো, কিন্তু সে তা' চায়নি। আর চেয়েই বা লাভ কি ? আজ তার কোন গৌরব-তৃপ্তি নেই। যার জীবন হ'তে রাজ-কন্যার মত গৌরব মুছে গেছে তার কাছে কাজের মর্য্যাদা অর্থশূন্য। সে আজ হাজার মজুরের মধ্যেই একজন। অন্যান্য গরীব কাঙাল দুর্ভিক্ষপীড়িত অভুক্ত মজুরদের মতই শুধু দু'টো খেয়ে বেঁচে থাকবার জীবন-সমস্যা নিয়েই ব্যস্ত। তাই সে সামান্য মজুর বেশেই কাজে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু তার চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, কথা-বার্ত্তা, শিক্ষা-দীক্ষা ও আভিজাত্যপূর্ণ চেহারা তাকে সমস্ত মেয়ে-মজুর থেকে বিশিষ্ট করে' রেখেছে। সকলেই তার কথা শোনে, দিদি বলে' ডাকে। তার কাছে তাদের সুখ দুঃখের কথা কয়। মুক্তাও তাদের লাঞ্ছিত, তাপিত, দলিত জীবনের ব্যথার সঙ্গে নিজের জীবনের ব্যথা মিলিয়ে তাদের সঙ্গে এক হয়ে যায়। তারাও যা, সেও তা। তাদের চোখেও দুঃখ-দারিদ্র্যের অশ্রু শুকায় না, মুক্তারও তাই। পার্থক্যের মধ্যে তারা তাদের ঘর-সংসারের কথা মুক্তার কাছে দ্বিধাহীনচিত্তে খুলে' বলে। মুক্তা সে সব কথা হৃদয়ের সুদৃঢ় আড়ালে অতি সঙ্গোপনে ঢেকে রাখে। জিজ্ঞাসা করলে শুধু দীর্ঘশ্বাস টেনে বলে, কুলী-মজুরের আর পরিচয় কি, তোমরাও যা, আমিও তা। এমন কি মিলে ঢোকবার সময় নিজের নামটা পর্য্যন্ত গোপন করে' পরিচয় দিয়েছে তারবতী

নামে। মুক্তা নামে আর পরিচয় দিয়ে লাভ কি? যে নামে ডাকলে অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা মনে পড়ে যায় আজ সামান্য একটা মেয়েমজুর বেশে সে নামের গৌরব কোথায়? সেই থেকেই মিলের সবাই মুক্তাকে ভারতী বলেই জানে। মুক্তা নিজের সম্বন্ধে যেমন গোপন, অসীমও তেমনি নিজের সম্বন্ধে গোপন। এ পর্য্যন্ত বাইরের লোক তো দূরের কথা এমন কি মিলের জেনারেল ম্যানেজার মিষ্টার সেন বা লেডি সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডলি দত্ত পর্য্যন্তও জানেনা—এই এস্. দত্ত লোকটি কে? অসীম নামে ঐ ছেলেটিইবা কে? মিলের মজুর থেকে আরম্ভ করে' ঐ মাষ্টারমশায়টি পর্য্যন্ত এই এস্. দত্ত বা অসীম সম্বন্ধে সঠিক কোনো খবর জানে না? সবাই অনুমানে ধরে' নিয়েছে অসীম এস্. দত্তেরই ছেলে। এ বিষয় কেউ কোনদিন এস্. দত্তকে সাহস করে' জিজ্ঞাসা করেনি। বড়লোকের ঘরের কথা জানবার আগ্রহ প্রকাশ করাও অনেক সময় অন্যায়। কাজেই মাষ্টারমশায়ও সেদিন মুক্তাকে বলেছিলেন, অসীম এস্. দত্তেরই ছেলে।

মুক্তা ঘরে ফিরে এসে ভাবলো—অসীম এস্. দত্তের ছেলে? তবে কি ঐ মুক্তাহার তাঁর স্ত্রীর? না, তারই ভুল, যা বলেছিল রেঙ্গুনে বম্বিংএর দিন তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় সে দেখেছে ঘরের মেঝের ওপর মুক্তাহার পড়ে রয়েছে। সে হার এখানে আসবে কি করে'? এ হার মিসেস্ দত্তেরই হবে। তার মাথা ঠিক নেই, সে সত্যই স্বপ্ন দেখছে। তার জীবনটাই একটা স্বপ্নের ছায়া দিয়ে গড়া। যা কিছু করে, যা কিছু দেখে সবই আজ স্বপ্নময়। বাস্তবতার কোন চিহ্ন যেন তার জীবনে নেই। সব ভুল, সব মিথ্যা, সব মায়া মরীচিকা! মুক্তা আর ভাবতে পারে না, কি যেন এক গভীর নৈরাশ্যে সমস্ত হৃদয় ভুয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ এ ভাবে কাটে, দু'টী চোখে নীরব অশ্রু ঝরে' পড়ে। এমনি মুক্তাহার তারও ছিলো। কিন্তু আজ সে মিলের একজন

সামান্য মজুর। না না, সে আর মজুর নয়—তাকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। সামান্য দোষে কাজের সময় love letter পড়লে মিলের নিয়ম অনুসারে নাকি ঘোরতর অন্যায়। কিন্তু এটা কি love letter? এ বৈষ্ণবীর চিঠি—রত্নলেখা'র কথা লিখেছে। কেন সে এ চিঠি পড়বেনা, একশোবার পড়বে। তার মেয়ের জামা নেই, জামার কথা লিখেছে, শীত এসে পড়েছে; রত্নলেখা কি শীতে কাঁপবে? তাকে জামা পাঠাতে হবে। চিঠি পড়ার দোষে নোটিশ? চাকুরী থেকে বরখাস্ত? অন্নবস্ত্র হ'তে বঞ্চিত? সে জানে, মুক্তা কটন মিল মজুরদের জন্য, দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের জন্য। তবে তাকে তাড়ায় কি করে'? সব মিথ্যা, সব প্রতারণা! সব মিলওয়ালা একই ধন-গর্ব্বে গর্ব্বিত। ঐশ্বর্য্যের স্তূপে বসে' গরীবদের স্বপ্ন দেখা। এই এস্. দত্ত লোকটি কে? সে জানে না, তাকে এ পর্য্যন্ত চোখে দেখিনি। শুনেছি—এ মিলের মালিক তিনি। ঐ প্রকাণ্ড বাড়ীটা তাঁরই। কিন্তু তাঁর ম্যানেজারটি? এতবড় একটা পশুর স্থান এ মিলে হ'লো কি করে'? এস্. দত্ত নিজে মিলের অধিকারী: তাঁর মত ছাড়া এসব কি করে' সম্ভব? তাহ'লে তিনিও নিশ্চয় এসব ব্যাপারে জড়িত আছেন! তাকে ম্যানেজার নোটিশ দিয়েছে, এ মিল থেকে বিনা দোষে তাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছে—এসব খবর কি এস্. দত্ত জানেন না? সবই জানেন। জেনে শুনেই এসব বড় বড় ধনী লোক গরীবদের প্রতি অত্যাচার করে' থাকে; এস্. দত্তও জেনে-শুনেই তার মত সর্ব্বস্বহীন নিরাশ্রয়া নারীকে দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলার পথের পাশে তাড়িয়ে দিতে চাচ্ছেন। সব ষড়যন্ত্র! এসব ধনীদের গুপ্ত চক্রান্ত গরীবদের প্রতি। এ এস্. দত্তও তার জীবনটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। হায় ভগবান, মানুষের শত্রু মানুষ! মজুররা একদিন কাজ না করলে মিলের অবস্থা কি হয়ে দাঁড়ায় তাকি তাঁরা কখনো ভেবে দেখেছেন? কিন্তু এবার ভাবিয়ে তুলতে হবে। জানিয়ে দিতে হবে যে,

মজুররাও মানুষ ; তারাও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে জানে। বিনা দোষে একজন মজুরকে নোটিশ দেওয়া—এ ঘোরতর অন্যায়। কিন্তু সে আজ একা—তার পাশে আজ যদি তার মাষ্টারমশায় থাকতেন। মুক্তার' চোখে এলো জল। আজ সে কোথায়? মুক্তার সহসা মনে পড়ে গেলো—একদিন মাষ্টারমশায়কে সে ফুলের মালা গলায় পরিয়ে দিতে চেয়েছিলো। সত্যই আজ তাকে পেলে……মুক্তা আর ভাবতে পারলো না, শুধু দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লো। জীবনে সে কোনদিন কাউকে ভালোবাসেনি। মাষ্টারমশায় গরীব কুলীমজুরদের প্রেমের ঠাকুর, তারও প্রেমের ঠাকুর। মুক্তা মাষ্টারমশায়ের উদ্দেশ্যে মাথা নত করলো।

—মা, একঠো কাপড়া দিজিয়ে ; একঠো কাপড়া। আকুল মিনতি ভরা করুণ কণ্ঠস্বর। চিত্তরঞ্জন এভিনিউর ফুটপাথ ধরে' রমণী চলেছে। চারতলা, পাঁচতলা বড় বড় বাড়ীগুলির সামনের রেলিং দেওয়া বারান্দার দিকে মুখ তুলে চেয়ে রমণী পথ চলছে আর বলছে—মা, একঠো কাপড়া দিজিয়ে। হৃদয়-বিদারক সে কণ্ঠস্বর। মর্মস্পর্শী সে কাতর ধ্বনি। সজল চেয়ে দেখে সম্মুখে এক অর্দ্ধোলঙ্গিনী নারী। হ্যাঁ, তাঁকে অর্দ্ধোলঙ্গিনীই বলা চলে। উরুদেশের ওপরে শুধু কটিদেশ ঢেকে সামান্য এক টুকরা কাপড়ের ন্যাকড়া জড়ানো। এ ছাড়া সমস্ত দেহ নগ্ন। একেবারে নগ্ন। বছর তিরিশেক বয়স, দুর্ভিক্ষ-বিতাড়িত গৃহস্থ-বধূ বলেই মনে হয়। হিন্দুস্থানী, কলিকাতা-প্রবাসী—অন্নহীন, গৃহহীন। সুসভ্য ক'লকাতা শহরের প্রশস্ত রাস্তার ওপর দিয়ে চলছে, আর উর্দ্ধে মাথা তুলে ডেকে বলছে—এ মাই, একঠো কাপড়া দিজিয়ে। কটি-দেশের সামান্য কাপড়ের টুকরোটি বারবার খসে' পড়ে যেতে চায়, রমণী বাঁ হাত দিয়ে তাড়াতাড়ি ধরে ও ডান হাত ওপরে তুলে বারান্দার দিকে চেয়ে চেয়ে একটা কাপড়ের জন্য মিনতি জানাচ্ছে।

মেয়েরা ওপর থেকে ফুটপাথের নারীর কাতর-ধ্বনি শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রেলিং ধরে' দাঁড়ায়। নীচের দিকে চেয়ে নারীর উলঙ্গ দেহখানা দেখে তাড়াতাড়ি সরে' পড়ে। ফুটপাথের নারী আকুল আশায় ওপরের দিকে চেয়ে থাকে। কিন্তু এতটুকু ছেঁড়া কাপড়ও ওপর থেকে পড়ছে না। চার পাঁচতলার নারী—অট্টালিকাবাসিনী, শিক্ষিতা; তাই এ ফুটপাথের নারীর উলঙ্গ দেহপানে চেয়ে লজ্জিত না হয়ে চুপ করে' ঘরে ঢুকে পড়ে। ব্যর্থ হ'লো নারী বিরাট অট্টালিকার পানে চেয়ে। সে আবার এগিয়ে চলছে, প্রশস্ত পথের শিক্ষিত, সভ্য জনগণের ভিড় ঠেলে—তাদের পানে চেয়ে—একখানা কাপড়ের আকুল মিনতি জানিয়ে। কিন্তু সকলেই নারীর পানে চেয়ে কিছুমাত্র লজ্জিত বা দুঃখিত না হয়ে পথ চলে যাচ্ছে। নারী আজ পুরুষের সম্মুখে উপেক্ষিতা, অপমানিতা—হয়তো কেউ কেউ দু' চক্ষে উপভোগ করছে তার নগ্নদেহ। ভারতের জননী আজ ভারতের সন্তানের কাছ থেকে এর চেয়ে আর বেশী কি আশা করতে পারে?

সজল রমণীর দিকে চেয়ে শিউরে উঠলো। পথের ওপর থমকে দাঁড়িয়ে রইলো। তার মনের মধ্যে বিপুল প্রশ্ন ঝড়ের মত জেগে উঠলো—আজ কোথায় নারীর স্থান? বাংলা ও বোম্বের শত শত কটন মিলগুলির দিকে চেয়ে সজল দুঃখের হাসি হেসে উঠলো, সে হাসিতে সম্মুখের উলঙ্গ রমণী ভয় পেয়ে গেলো। ভয় পেয়ে একটা হিন্দুস্থানীর দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। সজল পকেট থেকে দশ টাকার একখানা নোট বার করে' রমণীর সম্মুখে ধরলো। রমণী বিশ্বাস করতে পারলো-না। সজল বুঝতে পেরে দোকানের হিন্দুস্থানী লোকটির হাতে নোটটি দিয়ে বললো, জলদি একঠো কাপড়া দাও। হিন্দুস্থানী লোকটি তাড়াতাড়ি ব্ল্যাক-মার্কেট করে' দশ টাকা দিয়ে একখানা কাপড় কিনে

এনে রমণীর হাতে দিলো। রমণী সজলের পা জড়িয়ে ধরে' বললো, বাবু আপকো দিল আচ্ছা হ্যায়।

সজল তাড়াতাড়ি রমণীর হাত ধরে তুলে বললো, গোর ছোড়ো মাইজি। তারপর সজল মনে মনে ভাবলো—তুমি নারী, ভারতের জননী, ভারতের প্রস্তুত কাপড় আজ সৈন্ত-শিবিরে। বড় বড় মিল-ওয়ালাদের কাছে আজ ভারতনারীর নগ্নদেহ লোভনীয়, তাই তুমি আজ উলঙ্গিনী। ভারতের মিলওয়ালারা আজ ভুলে' গেছে জন্মভূমি ভারত আর ভারতের নারীর কথা। তাদের জননীকে, তাদের ভগিনীকে আজ রাজপথের মাঝে নগ্নদেহ বা'র করে' কোটি কোটি গজ কাপড় সরবরাহ করছে সৈন্যদের সুসজ্জিত করতে। কিন্তু মুক্তা কটন মিল এখনো এ কলঙ্কের বিরুদ্ধে মাথা তুলে' দাঁড়িয়ে। দেশের এ নগ্নতা, এ বর্ব্বরতা ঢেকে দেবার জন্য মুক্তা কটন মিল এখনো হু হু করে' চলছে।

রমণী কাপড়খানা পরতে পরতে চলে' যাচ্ছে—সজল সেদিকে চেয়ে আছে। এমনি নগ্ন অঙ্গ ঢেকে দেবার জন্য মুক্তা কটন মিল। রমণী অনেক দূর গিয়ে পিছন ফিরে চাইলো। সজলের চোখে চোখ তার মিশলো। সজলের চোখের সামনে সহসা ভেসে উঠলো—হল ঘরের মুক্তার কণ্ঠহার। মুক্তাহারের শুভ্র নির্ম্মল দ্যুতি। সেই দ্যুতি যেন রমণীর সর্ব্বাঙ্গে প্রতিফলিত হয়ে উঠছে। ছাত্রী মুক্তার কণ্ঠের ঐশ্বর্য্য যেন আজ সত্য সত্যই এ রমণীর অঙ্গের সর্ব্ব দীনতা মুছে দিচ্ছে। সজলের মনে হ'লো—ছাত্রী মুক্তার ঐ মুক্তা আভরণেই আজ সমস্ত বঙ্গের সমস্ত নগ্নদেহ ভূষিত হয়ে উঠছে। এমনি করে' সজল মুক্তাকে পেতে লাগলো বাংলার সমস্ত গৃহহীন, অন্নহীন, বস্ত্রহীন নারীর মাঝে। যে মুহূর্ত্তে সজল নগ্ন নারীর অঙ্গ ঢেকে দেয় পরবার বস্ত্র দিয়ে; যে মুহূর্ত্তে অভুক্ত উপবাসী, অনশনক্লিষ্ট নারীর মুখে সে ধরে অন্ন; পিপাসায় জল,

রোগে ঔষধ, সে মুহূর্ত্তে মুক্তা যেন অতুল ঐশ্বর্য্যরূপে সজলের সম্মুখে এসে দাঁড়ায়, সে মুহূর্ত্তে সজল মুক্তাকে সমগ্র অন্তরের ভিতরে বাইরে দেবীরূপে বরণ করে' নেয়। এমনি করে' সজল মুক্তাকে খুঁজে পেতে লাগলো নিজের অন্তরে—দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধপীড়িত সমস্ত দীন-দলিত পীড়িত জনগণের মাঝে। মুক্তা সজলের চোখে আজ সর্ব্বময়ী, মঙ্গলময়ী, ঐশ্বর্য্যময়ী। মরে' গেছে সিন্ধু বৌদি, মরে' গেছে পাখী, কিন্তু বেঁচে আছে মুক্তা তার অন্তরে, বাহিরে, সর্ব্বত্র।

সেদিন মুক্তা কটন মিলে এক কাণ্ড হয়ে গেলো। মেয়ে-মজুররা ধর্ম্মঘট করে' বসে আছে। ভারতী দিদিকে যে নোটিশ দেওয়া হয়েছে তা তুলে নিতে হবে। তাকে এ মিলে রাখতেই হবে, নইলে তারা কেউ এ মিলে কাজ করবে না। ম্যানেজার মিঃ সেন ও ডলি দত্ত অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লো। আজ ক'দিন ধরে মেয়েরা কাজে আসে না। মিলের কাজ এক প্রকার বন্ধ। এদিকে পুরুষ মজুররাও গোপনে গোপনে কি সব পরামর্শ করছে। হয়তো তারাও এ ধর্ম্মঘটে যোগ দেবে। মিঃ সেন ডলিকে তাঁর অফিস রুমে ডেকে এনে বললেন, আমার মনে হয় আপনার ঐ ভারতী মেয়েটিই এ সব ষ্ট্রাইকের মূলে। তাকে এক মাসের নোটিশ দেওয়া হয়েছে; চলে যাবার আগে একটা গোলমাল বাধিয়ে দিচ্ছে। মেয়েটি ভয়ানক তেজী—সব মেয়েকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। একে শাস্তি দেওয়া উচিৎ। তারপর চেয়ার ছেড়ে উত্তেজিত হয়ে উঠে টেবিলে মুষ্টি আঘাত করে' বললো, হ্যাঁ, তাকে এমন শাস্তি দেব যেন জীবনে না ভোলে—এ মিঃ সেনের কথা. কত বড় সাহস মেয়েটার! ষড়যন্ত্র করে' এত বড় একটা মিলের বিরুদ্ধে, আমার বিরুদ্ধে!

ডলি বললো, কিন্তু শাস্তি দেবার সময় আর কোথায়? তাকে তো নোটিশ দিয়েছেন, কালই সে মিল ছেড়ে চলে যাবে। এক মাসের নোটিশ, কাল একমাস পূর্ণ হবে।

—না, তাকে যেতে দেওয়া হবে না, যেতে দিতে পারি না; তাকে ভীষণ শাস্তি দিতে হবে। তার নোটিশ আজ তুলে নিচ্ছি। তাকে ক্ষমা করছি। তাকে মিলে কাজ করতে হবে। তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে হবে। আপনি দেখবেন, তাকে কি ভীষণ শাস্তি দিই। তা' ছাড়া তাকে এখন কিছুতেই মিল থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া চলে না। মেয়েরা ভয়ানক ক্ষেপে উঠেছে। এ ষ্ট্রাইক বন্ধ করতে হ'লে ভারতীকে মিলে রাখতেই হবে। আপনি যান, মেয়েদের ডেকে বলে দিন যে, ভারতীর নোটিশ তাদের অনুরোধেই তুলে নেওয়া হয়েছে। তারা যেন কাল থেকে কাজে আসে। বলে মিঃ সেন আবার চেয়ার টেনে বসলো। তারপর কথঞ্চিৎ সুস্থকণ্ঠে বললেন, হাঁ, একটা কথা—মিঃ দত্ত ক'লকাতা এসে পড়েছেন। আজ চিঠি পেলাম। পঞ্চাশ জোড়া শাড়ী পাঠাতে লিখেছেন ক'লকাতার বস্তীর মেয়েদের জন্য। আজই কাপড় পাঠিয়ে দিচ্ছি। কাপড় বিতরণ শেষ হ'লেই তিনি শ্রীরামপুর এসে পৌছাবেন। কাজেই এ ষ্ট্রাইক-ক্লাইকের ব্যাপারগুলো তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলাই উচিৎ। কারণ তাঁর মতে মিলের মজুরদের ছোটখাটো সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনীয়। একমাত্র চরিত্র-দোষে দোষী হ'লেই অপরাধ। ভারতী মেয়েটি নিশ্চয়ই চরিত্র দোষে দোষী। এ বয়সে এখনো বিয়ে হয়নি। কোন পুরুষের সঙ্গে নিশ্চয়ই তার যোগাযোগ আছে। এসব চিঠিপত্র তারই। এবার তাকে ক্ষমা করলাম। কিন্তু এ ক্ষমার পেছনে রয়েছে দারুণ পরিণতি।

ডলি হেসে বললো, বড্ড চটে গেছেন দেখছি মেয়েটির ওপর। ওর যৌবনের দিকে চেয়েও কি মন কিছু বলে না?

—না, আপনি আমাকে আর ওসব লোভ দেখাবেন না। তা'ছাড়া আপনি…

ডলি বাধা দিয়ে বললো, তা'ছাড়া আমি রয়েছি না? কিন্তু আমারো বয়স অনেক হয়ে এলো। এখন বিয়ে ছাড়া পুরুষের সঙ্গ আর ভালো লাগে না।

মিঃ সেন বললেন, বেশ তো, আমি তো আগেই বলেছি আমার স্ত্রী রোগা, তাকে আমার ভালো লাগে না। সতীনের ঘর করতে আপত্তি নেই তো?

—আপত্তি যে একেবারে নেই সে কথা বলতে পারি না। কিন্তু আপনাকে গ্রহণ না করেও আমার উপায় নেই। আপনার সন্তান আমার গর্ভে।

পরদিন মেয়েরা এসে আবার কাজে লাগলো। আবার মিল চললো। মিলের ধোঁয়ায় আবার আকাশ অন্ধকার হয়ে উঠলো। মজুরদের মুখে চোখে আজ আনন্দোজ্জ্বল দীপ্তি। তাদেরই জয় হয়েছে। তাদের কথা মানতে বাধ্য হয়েছে। মুক্তা আজ মেয়েদের ডেকে বললো, এমনি করে' অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়। আমরা মিলের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্র। আমাদের উপেক্ষা করলে মিল চলতে পারে না। এ কথা যখন আমরা জানি তখন আর আমাদের ভয় কি? অন্যায় ব্যবহার করলে অমনি সকলে মিলে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে তার প্রতিকার করবো। কে ওই মিঃ সেন? কে ওই ডলি? আমরাই মিলের প্রাণ, মিলের অস্থিমজ্জা; ওরা শুধু ছায়া রূপে মিলের পাশে দাঁড়ানো।

মুক্তা সেদিন ঘরে ফিরে এসে রত্নলেখার জন্য জামা কিনে মাসিমার নামে পাঠিয়ে দিলো। নানা গোলমালে জামা পাঠাতে দু'মাস দেরী হয়ে গেলো। পাঠিয়ে দিয়ে আবার ভাবতে লাগলো—হাঁ, রত্নলেখা একদিন শীতে কাঁপছিল। প্রায় সারা শীতটা খালি গায়ে কাটালো।

ভোরবেলা ভয়ানক শীত লাগে, সে সময় শীতে হয়তো সে কত কেঁদেছে। হায় দুঃখিনী মেয়ে, মজুরের ঘরে তোর জন্ম—তাই সারা শীতকালটা কাঁপতে কাঁপতে কেটে গেলো। এমনি শীতে কাঁপে পৃথিবীর সমস্ত কুলীমজুরের ছেলেমেয়ে। কাঁপে না শুধু তাদের ছেলেমেয়ে—যারা এ মজুরদের রক্তের বিনিময়ে গড়ে' তোলে ঐ ময়ূরসিংহাসন, ঐ কাকাতুয়া পাখী, ঐ মুক্তাহার।

রাত্রি বারোটা। মুক্তা নিদ্রিতা। স্বপ্নালোকে তার দু'টী চোখ প্রদীপ্ত। মুক্তা স্বপ্ন দেখছে—রেঙ্গুনে ফেলে আসা তার মুক্তাহার যেন কোন সুদূর দেশ হ'তে আকাশ ছুঁয়ে ভেসে এসে তার মুদিত নয়ন সম্মুখে জ্যোতিঃশিখায় ঝলমল করছে। তার কণ্ঠদেশ জড়িয়ে থাকতে চাইছে। মুক্তা সেই মুক্তা-জ্যোতিঃ স্পর্শেই যেন সহসা জেগে উঠলো! স্বপ্ন-সুখচঞ্চল তার সমস্ত অঙ্গ! সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো। মিলের কোয়ার্টারেই থাকে সে। সেখান থেকে সে সোজা মিঃ দত্তের বাসভবনে ছুটলো। নিঝুম নীরব গভীর রাত্রি। আকাশে স্নিগ্ধোজ্জল চাঁদ। শুভ্র জ্যোৎস্না-প্রবাহ সমস্ত আকাশ থেকে ঝরে' পড়ছে। শশীর অঙ্গজ্যোতিঃতে রূপালী হয়ে জলছে যেন ঐ মিঃ দত্তের বাসভবন। সহসা আজ মুক্তার সারা অঙ্গে জেগে উঠলো এক অপূর্ব্ব শিহরণ! সে প্রাসাদভবনের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলো। বাঁ পাশেই বিরাট হল ঘর। একটি মাত্র দরোজা; অর্গলহীন দুয়ার উন্মুক্ত। দ্বাররক্ষক দ্বারের পাশে শুয়ে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। দ্বাররক্ষক আজ দ্বার রুদ্ধ করে নি, নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। মুক্তা নিদ্রিত দ্বাররক্ষকের দিকে চেয়ে বললো, রাজপ্রাসাদের দ্বার এমনি উন্মুক্ত রাখতে হয়—যারা রাজ্যচ্যুত তাদের জন্য। মুক্তা তাড়াতাড়ি হল ঘরে ঢুকে পড়লো। ভিতর থেকে দরোজা বন্ধ করে' দিলো হল ঘরের ছাদ থেকে ঝুলানো একগুচ্ছ বিজলী বাতি শত আলোক-বর্ণে

জলছে। শুভ্র প্রস্তররাজিতে হল ঘরের প্রশস্ত মেঝ গ্রথিত। মাঝখানে সেই ময়ূরসিংহাসন। সেই মুক্তাহার কাকাতুয়ার স্বর্ণ-খচিত চঞ্চুপুটে ঝুলানো। বিজলী আলোক-রশ্মিতে সেই মুক্তারাজি দীপ্যমান। সেই মুক্তাহার-বিকীর্ণ জ্যোতিঃ-চূর্ণ শ্বেত মেঝের ওপর পতিত। সমস্ত মেঝেটা যেন এক অপূর্ব্ব দ্যুতি-বিচ্ছুরণে কেঁপে উঠছে। মুক্তার চরণতলও সহসা কেঁপে উঠলো নৃত্য-ঝঙ্কারে। মুক্তার সর্ব্বাঙ্গে জেগে উঠলো নৃত্যছন্দ। কি যেন এক বিপুল উৎসব তার সমস্ত প্রাণে, সমস্ত দেহে। তার হৃদয়ের কোমল তারগুলি সহসা কি এক অপূর্ব্ব স্পর্শে ঝঙ্কৃত হ'লো। পাজামা-পরিহিতা মুক্তা, সুদীর্ঘ এলোচুল সমস্ত বক্ষে ও পৃষ্ঠে ঝুলে পড়েছে তার। মুক্তার হৃদয় নাচতে লাগলো। অসীম আকুল অধীর সে নৃত্য, সমস্ত হল ঘরটা তার নৃত্যের তালে তালে দুলে' উঠলো। তার হৃদয়-রাগিণীতে বেজে উঠলো সমস্ত ময়ূর-সিংহাসন। শুধু নৃত্য, শুধু নৃত্য, নাচতে নাচতে মুক্তা সহসা আত্মসম্বৃত হয়ে চোখ মেলে চাইলো। তারপর তাড়াতাড়ি উঠে হল ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতেই ম্যানেজার মিঃ সেন চোর চোর বলে' চীৎকার করে' উঠলেন। দ্বারবান্ সেই চীৎকারে জেগে উঠে মুক্তাকে দেখতে পেলো। মিঃ সেন বললেন, পাকড়ো, পাকড়ো, চোর হ্যায়। মুক্তা স্তব্ধ ও বিপুল বিস্ময়াপন্ন হয়ে মিঃ সেনের দিকে চেয়ে রইলো।

মিঃ সেন বললেন, প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ! হ্যাঁ, ভীষণ প্রতিশোধ নেবো। তারপর দারোয়ানের দিকে চেয়ে বললেন, ইস্‌কো বড়া কাম্‌রামে ঘুসাকে দর্‌বাজা বন্ কর্ দেউ।

বাঘের মুখে পদাঘাত করে' মৃগশিশু সরে' পড়লে সমস্ত গহন অরণ্য আলোড়িত করে' বাঘ যেমন তার পশ্চাতে ছুটে চলে, মিঃ সেনও তেমনি সেদিন মুক্তার কাছে অপমানিত হয়ে প্রতিহিংসা নেবার জন্য

জলে' পুড়ে মরছিলেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন সুবিধা করে' উঠতে পারেন নি। আজ মুক্তা যখন রাত্রি বারোটার সময় মিঃ দত্তের বাসভবনের দিকে যাচ্ছিল, মিঃ সেনও তখন ডলির ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এ পথে যাচ্ছিলেন। মুক্তাকে দেখতে পেয়ে তিনি তার পেছন ধরে' নিঃশব্দে হল ঘরের সিঁড়ির কাছে দাঁড়ালেন। ঘন্টাখানেক পর আবার যেই মুক্তা বেরিয়ে এলো মিঃ সেন ও তন্মুহূর্ত্তে চোর চোর বলে' চীৎকার করে' উঠলেন।

শ্রীরামপুরের বিপুল ব্যানার্জ্জী তখন পুলিশ ইন্‌সপেক্‌টার। বলিষ্ঠ দেহ, কুচকুচে কালো গায়ের রং। দেখতে ভয়ানক বেঁটে ও মোটা। চোখ দু'টি অত্যন্ত ছোট, মাথাটি আরো ছোট। মাথার চুলগুলি আবার অর্দ্ধমুণ্ডন করে' ছাঁটা। দূর থেকে দেখলে মনে হয়—শুধু একটি বিশাল দেহ যেন দু'টী পায়ের ওপর ভর করে' আছে। দশটা খুনী কেসে আসামীকে ধরে' ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে সামান্য পুলিশ থেকে পুলিশ ইন্‌সপেক্‌টার হয়েছেন। খুনী আসামী, চুরির আসামী সামনে পড়লে গিলে খেতে চান্ তিনি।

পরদিন সকালে মিঃ সেন ফোন করলেন এ হেন পুলিশ ইন্‌সপেক্‌টারের কাছে। তিনি পুলিশ সহ এসে উপস্থিত হ'লেন। হল ঘরের দরজা খুলে' দেওয়া হ'লো। মুক্তা এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে বসে রয়েছে। বিশীর্ণ রক্তহীন, বিবর্ণ পাংশু দেহ। বিপুলকায় এ ভয়ঙ্কর চেহারার লোকটিকে দেখতে পেয়ে সে ভয়ে কেঁপে উঠলো। মিঃ সেন সিংহাসনের ওপর মুক্তা হারটিকে দেখিয়ে বললেন, ঐ হারটি চুরি করে' পালাচ্ছিল—হার সহ ধরা পড়েছে। It is a serious case, Mr Banerjee. তার ওপর দত্ত সাহেবের হার।

ইন্‌সপেক্‌টার ব্যানার্জ্জি গর্জ্জন করে' উঠলেন, She is a nice devil, I see. বলে' মুক্তাকে হল ঘরের কোণ থেকে হাত ধরে' বলপূর্ব্বক টেনে আনলেন। এই টেনে আনার দরুণ মুক্তার পরিহিত

পাজামা অনেকটা শিথিল হয়ে গেলো ও মেঝেতে আঘাত লেগে হাঁটুর কাছ দিয়ে চামড়া উঠে গেলো। মুক্তার সেদিকে কোন লক্ষ্য নাই, শুধু ইন্‌স্‌পেক্‌টারের দিকে কাতর দৃষ্টি মেলে বললো, আমায় ছেড়ে দিন, এসব মিথ্যা কথা, সব ষড়যন্ত্র। আমি হার চুরি করিনি। আমি সামান্ত মজুর। মুক্তার কণ্ঠস্বরে বেদনা-কম্পিত। অশ্রুসিক্ত ভীরু চাহনি তার। মুক্তার হাতের কব্জি তখনো ইন্‌স্‌পেক্‌টারের দৃঢ় নির্দ্দয় মুষ্টির ভিতর। কোমর হ'তে মাথা পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গ ইন্‌স্‌পেক্‌টারের হাতে ঝুলছে। বাকী অর্দ্ধাঙ্গ হলের মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়া। অশ্রুসিক্ত অসহায় দৃষ্টি ইন্‌স্‌পেক্‌টারের দিকে তুলে মুক্তা বললো, আমায় ছেড়ে দিন, আমি চুরি করিনি। আমাকে দয়া করে' ছেড়ে দিন, আমার হাতে ভয়ানক লাগছে।

মিঃ ব্যানার্জ্জি গর্জ্জে উঠলেন, চাপ দিয়ে হাত ভেঙে গুঁড়ো করে' দেবো। বলে' খুব জোরে মুষ্টি চেপে ধরে' বললেন, হার কেন চুরি করেছিলে? মুক্তার হাতের হাড়গুলি মরমর করে' উঠলো। তীব্র যাতনায় মুক্তা ছটফট্ করতে লাগলো। পা দুটো মেঝের ওপর আছড়াতে লাগলো। আর্ত্তকণ্ঠে অস্পষ্ট উচ্চারণ করলো, গ-জে-ন। কিন্তু মুক্তা জানেনা যে, গজেন তাকে মিলে এনে কাজে ঢুকিয়ে দেবার মাসখানেক পরেই একদিন হঠাৎ কলেরায় তার মৃত্যু হয়েছে। মুক্তা আজ এ বিপদে গজেনকেই একমাত্র বন্ধু মনে করে' অস্পষ্টভাবে তার নাম উচ্চারণ করলো।

মিঃ ব্যানার্জ্জি ততোধিক জোরে আবার হাতে চাপ দিলেন। মুক্তার মুখের বর্ণ মৃত্যুরেখায় কালো হয়ে উঠলো। মাগো, মা—মা! মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ।

হল ঘরের ভিতরে, দরোজায়, জানালায় চারপাশে লোকের ভিড় জমে গেছে। ভিড় তাড়াবার জন্ত ইন্‌স্‌পেক্‌টার মুক্তার হাত ছেড়ে দিয়ে

এগিয়ে আসতেই জনতা পিছনে সরে' পড়লো। ইন্‌স্‌পেক্‌টার ফিরে এসে মুক্তার লুণ্ঠিত দেহের কাছে দাঁড়াতেই মুক্তা অশ্রু-মলিন কণ্ঠে বললো, আপনার পায়ে পড়ছি, আমায় ছেড়ে দিন।

ইন্‌স্‌পেক্‌টার তীক্ষ্ণকণ্ঠে ধমক দিয়ে বললেন, চুপ কর ছুঁড়ি, আর কিছু শুনতে চাই না, রিপোর্ট লিখে দিচ্ছি; অন্ততঃ ছ মাসের জন্যে যা। দত্ত সাহেবের বাড়ীতে চুরি?

মিঃ সেন এতক্ষণ চুপ করে' দাঁড়িয়ে মুক্তার প্রতি এ অমানুষিক অত্যাচারের আনন্দ উপভোগ করছিলেন। এবার বলে' উঠ্‌লেন, করবে আর ষ্ট্রাইক? করবে আর অপমান? আমার অফিস রুমে আমাকেই অপমান?

কিছুক্ষণ আগে এসে ডলিও মিঃ সেনের পাশে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্যটা উপভোগ করছিল। বললো, মেয়েটার কত বড় তেজ, চিঠিটা আমাকে সেদিন কিছুতেই দেখালো না। যাও এবার জেলে।

মুক্তার ব্যথিত বিহ্বল দেহ হলের মাঝে ইন্‌স্‌পেক্‌টারের সামনে পড়ে আছে।

এবার সে অসাড় নিস্পন্দ দেহখানি একটু এগিয়ে এনে ইন্‌স্‌পেক্‌টারের পা দু'টো জড়িয়ে ধরে বললো, শুনুন স্যার, দয়া করে' আমার কথা শুনুন, আপনার পায়ে পড়ছি। আমি হার চুরি করিনি, ম্যানেজারের এসব ষড়যন্ত্র। এই ডলি দত্ত আমার একখানা চিঠি দেখতে চেয়েছিল—দেখতে দিইনি বলে' আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে ম্যানেজারের কাছে রিপোর্ট করেছে। ম্যানেজার একদিন তাঁর অফিস রুমে আমায় ডেকে নিয়ে বললেন, আমায় যদি তোমার দেহ………।

ম্যানেজার লাফ দিয়ে ইন্‌স্‌পেক্‌টারের কাছে এগিয়ে এসে বললেন, আপনি কি শুনছেন? এ বদমাস্ মেয়েটাকে নিয়ে যান এখান থেকে…।

—শুনুন স্যার, উনি বললেন, আমায় যদি তুমি ভালবাসো, তোমাকে ভোগ করতে দাও।

ম্যানেজার চীৎকার করে' উঠলেন, মিঃ ব্যানার্জ্জি!

ইন্‌সপেক্‌টার এবার গর্জ্জন করে' উঠলেন, চুপ কর ছুঁড়ি, মেরে হাড় ভেঙে দেবো। এত বড় একটা মিলের ম্যানেজার মিঃ সেন, তার ওপর এই অপবাদ?

—মিঃ ব্যানার্জ্জি! রুক্ষ কণ্ঠস্বর মিঃ সেনের, এখনো দাঁড়িয়ে আছেন?

—আপনার পায়ে পড়ছি স্যার, আমি চুরি করিনি; আমার কথা শুনুন। আমি তাঁর এ কাম-প্রবৃত্তিকে পদাঘাত করে' ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি। এর পর থেকেই ম্যানেজার আমার পেছনে লেগে আছেন। এক মাসের নোটিশ দিয়ে আমাকে মিল ছেড়ে চলে যেতে বলেন। মেয়েমজুররা আমার পক্ষ সমর্থন করে' ম্যানেজারের এ অন্যায় নোটিশ প্রতিবাদ করে' ধর্ম্মঘট করে। মিল বন্ধ হয়, ম্যানেজার ভীত হয়ে উঠলেন। আমার নোটিশ তুলে নিলেন।

ইন্‌সপেক্‌টার হেসে উঠলেন। তারপরই বুঝি সুযোগ দেখে এ ঘরে ঢুকে হার চুরি করতে এসে ধরা পড়ে গিয়েছো, না? তারপর মুক্তার হাত ধরে' জোরে টান দিয়ে তুলে পাথরের মেঝের ওপর ধাস্ করে ফেলে দিলেন। দারুণ আঘাতে মুক্তার মাথা কেটে রক্ত বার হ'লো। তবু আকুল মিনতি ভরা কণ্ঠে মুক্তা বলতে লাগলো, দয়া করে' আমার কথা শুনুন। হারের কথাই বলছি, আমি একদিন বড় সাহেবের ছেলেকে এ বাড়ীতে পৌঁছে দিতে আসি, এ হল্ ঘরে ঢুকতেই ঐ হারটা দেখতে পাই। ঠিক আমার হারটার মত মনে হ'লো। আমার বাবাও আমাকে এমনি একটি হার দিয়েছিলেন।

মিঃ সেন হেসে বললেন, এর মাথা খারাপ হয়ে গেছে মিঃ ব্যানার্জি, এর আবার বাবা, দিয়েছে একে মুক্তার হার! হা-হা-হা! তুমি কুলীর মেয়ে, তোমার বাবা এ রকম হার কোথায় পাবে ?

মুক্তার ইচ্ছা হ'লো তার কাণ দু'টী ঢেকে রাখে। একথা যেন তাকে আর শুনতে না হয় যে, সে কুলীর মেয়ে। মুক্তা আবার বলতে লাগলো, স্যার, শুনুন তা' হ'লে—রেঙ্গুনপ্রবাসী লক্ষপতি পিতার একমাত্র কন্যা ছিলাম আমি। মুক্তা আমার নাম। ভারতী নামে এখানে পরিচিত মাত্র। জাপানীর মেসিন্ গানে যেদিন বাবা মারা যান সেদিনই আমরা—আমি আর আমার মা বোমার ভয়ে রেঙ্গুন ছেড়ে ক'লকাতা আসি। ক'লকাতা আসার কিছুদিন পর মা না খেয়ে মারা যান। তারপর নানা জায়গায় ঘুরে এ মিলে এসে কাজ নিই। যেদিন হল ঘরে ঢুকে এ হার দেখলাম—সেদিন থেকেই আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম। রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম—ঐ হারটীর অলৌকিক জ্যোতিঃ যেন আমায় ঘিরে জ্বলছে। স্বপ্নের আবেশে ঘুম থেকে উঠে আমি এ হল ঘরে চলে আসি। মুক্তার হারটার দিকে চেয়ে থাকি। আমাদের অতীতের ঐশ্বর্য্যের জ্যোতিঃশিখা আমায় যেন মুগ্ধ করলো। আমি কি যেন এক অপূর্ব্ব আনন্দে ভরে' উঠলাম! কি যেন এক বিপুল উৎসবে আমার চরণতলে জেগে উঠলো নৃত্যের কম্পন। অবশ বিহ্বল হয়ে কিছুক্ষণ এ মেঝের ওপর পড়ে রইলাম। পরে যখন আমার ঐশ্বর্য্যের নেশা কেটে গেলো তখন বুঝতে পারলাম, আমার এ সব মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ। তাড়া-তাড়ি সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতেই ম্যানেজারবাবু চোর চোর বলে' চীৎকার করে' উঠলেন। আমি হার স্পর্শও করিনি, অতীত জীবনের স্মৃতির ওপর মুগ্ধ হয়েই শুধু হল ঘরে ঢুকেছিলাম। স্মৃতির নেশা কেটে যেতেই ফিরে যেতে চাইলাম। আপনি বিশ্বাস করুন আমার কথা।

চার পাশের জনতা বিস্ময়-মৌন-নেত্রে মুক্তার কথা শুনে মুখ চাওয়া চাওয়ি করলো। রহস্যময়ী বলে মনে হয় মেয়েটিকে! মেয়েটি কে? মিঃ ব্যানার্জ্জিও বিস্ময়-বিহ্বল হয়ে কতক্ষণ চুপ করে' থেকে শেষে নম্রকণ্ঠে বললেন, কিন্তু মিঃ সেন বলছেন, তুমি হাতে হাতে ধরা পড়ে গেছো, তুমি যে চুরি করনি তার সাক্ষী কে?

—তার সাক্ষী আমি। বজ্র-দর্পিত তীব্র কণ্ঠস্বর! ভিড়ের মধ্য হ'তে কে দ্রুতপদে এগিয়ে এসে ইন্‌স্‌পেকটার মিঃ ব্যানার্জ্জির সমুখে দাঁড়ালো। ইন্‌স্‌পেক্‌টার মুখ তুলে তাঁর দিকে চেয়ে মহা সম্ভ্রমে মাথা থেকে টুপিটা বাঁ হাত দিয়ে নামিয়ে, ডান হাত তুলে মিলিটারী কায়দায় নমস্কার জানিয়ে দু' হাত দূরে সরে' দাঁড়ালেন। সজল আজ সকালের ট্রেনে ক'লকাতা হ'তে শ্রীরামপুর এসে পৌঁছেচে। মিলের কম্‌পাউণ্ডে ঢুকেই দেখে হল-ঘরের চারপাশে প্রকাণ্ড ভিড়। উৎকণ্ঠিতচিত্তে তাড়াতাড়ি হল ঘরের দিকে ছুটে এসে ভিড়ের মধ্যে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে সমস্ত ব্যাপার দেখে মিঃ ব্যানার্জ্জির প্রশ্নের উত্তরে তীক্ষ্ণস্বরে ব'লে উঠলো, তার সাক্ষী আমি। সেই বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর সমস্ত হল ঘরটা কাঁপিয়ে যেন প্রতি-ধ্বনিত হ'তে লাগলো। সেই কণ্ঠস্বরে সমস্ত জনতার মুখে চোখে যেন ফুটে উঠলো ভীতি-বিহ্বলতা, কুতূহল-জড়িত চোখের চাহনি। সেই কণ্ঠস্বরে আপাদ-মস্তক কেঁপে উঠলো মিঃ সেনের ও ভলির। সেই কণ্ঠস্বরে কেঁপে উঠলো মুক্তা। অবিরল অশ্রুসিক্ত শঙ্কাজড়িত চোখ দু'টী তুলে মুক্তা সমুখের দিকে চাইল, কে এই সৌম্য শান্ত মূর্ত্তি! দীর্ঘদেহ, সবল পেশী, বিস্তৃত বক্ষ, উন্নত শির, প্রশস্ত উজ্জ্বল ললাট, অবিন্যস্ত কালো চুল, মুক্তা সজলকে চিনতে পারলো না। কিন্তু "সাক্ষী আমি"—একথা কে বললো? মুক্তা কিছুই ঠিক করতে পারলো না! বিশীর্ণ ক্লান্ত দেহ তার ঘরের মেঝের পড়ে রয়েছে। তার মনে হ'লো জনতার মধ্য থেকেই কেউ হয়তো বলে থাকবে। সে

জনতার দিকে মিনতি ভরা চোখে একবার চাইলো কিন্তু আর কোন সাড়া পাওয়া গেলো না। সে চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে ইন্‌স্‌পেক্‌টারের দিকে চেয়ে আবার বললো, আমায় ক্ষমা করুন, আমায় বিশ্বাস করুন। আমি হার চুরি করতে আসিনি। ইন্‌স্‌পেক্‌টার সে কথায় কর্ণপাত না করে' একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে' বললেন, আপনি ? মিঃ এস্, দত্ত ? এ কথা বিশ্বাস করতে পারি ? "এস দত্ত" নাম বলতেই মুক্তা দারুণ আক্রোশে জ্বলে উঠলো—এই লোকটাই তা হ'লে এ মিলের মালিক। এই লোকটাই তা হ'লে ঐ সেনের ও ভলির পিছনে থেকে তার বিরুদ্ধে উস্কিয়ে দিচ্ছে। তার বিরুদ্ধে এ সব ষড়যন্ত্রের মূলে রয়েছে সেই-ই। তাকে আজ চুরির অপরাধে অভিযুক্ত করে' পুলিশের হাতে দিচ্ছে তা' হ'লে এই লোকটাই। লক্ষপতি হয়ে লক্ষ লক্ষ কুলীমজুরের জীবন নানা অত্যাচারের রক্তস্রোত ভাসিয়ে দিচ্ছে। মুক্তা গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত ব্যাঘ্রের মত শিকারীর কাছে লাফিয়ে পড়ে বললো, আপনি এস্, দত্ত ? এই মিলের মালিক ? আপনি এমনি লোকের সর্ব্বনাশ করেন ? এত বড় উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির লোক পিছনে লাগিয়ে লোকের বুকে ছুরি বসিয়ে রক্তপান করেন ? আজ মিলের মজুরের র‍্যাশন বন্ধ করেন, কাল নোটিশ দেন, পরশু চোর বলে' পুলিশ ডেকে জেলে দেন ? এত অত্যাচার, এত উৎপীড়ন, এত লাঞ্ছনা কেন ? আমরা কি মানুষ নই ? বলে মুক্তা ইন্‌স্‌পেক্‌টারের হাত থেকে সহসা টান দিয়ে টুপিটা এনে সজলের গায়ে ছুঁড়ে মারলো।

ইন্‌স্‌পেক্‌টার ব্যানার্জ্জি এবার অনেকটা উৎসাহিত হয়ে এস্, দত্তকে বললেন, আপনি এখনো বলতে চান—আপনি এর সাক্ষী ? She is a rogue and should be sent up for six months.

সজল সম্মুখে পতিত টুপিটা পা দিয়ে লাথি মেরে মিঃ ব্যানার্জ্জির দিকে

সরিয়ে দিলো। যেন সেই-ই টুপিটা তার গায়ে ছুঁড়ে মেরেছে। তেমনি ক্ষিপ্ত মেজাজে তাঁর দিকে চেয়ে গম্ভীর স্বরে বলতে লাগলো, for 6 months! কিন্তু তার আগে আপনাদের মত লোকের দ্বীপান্তর হওয়া উচিৎ। আজ সমস্ত বাংলা দেশটা আপনারা জালিয়ে দিয়েছেন। অভুক্ত নগ্ন দীন হীন লক্ষ লক্ষ দরিদ্র গৃহস্থ আজ আপনাদের তাড়নায় অস্থির হয়ে উঠেছে। আজ সমস্ত গরীব কাঙ্গালের ওপর দিয়ে যে অন্যায় অত্যাচার চলছে, তার জন্ম সকলের আগে দায়ী আপনারই মতো বড় বড় পদস্থ ব্যক্তি আর মিল ও ফ্যাক্টরীর অর্থলোভী হৃদয়হীনেরা। এরাই হয় চোর, অসৎ, লম্পট, মনুষ্যত্বহীন। আজ দেশে চাল নেই, কাপড় নেই; লক্ষ লক্ষ লোক না খেয়ে, না পরে' পথে ঘাটে পড়ে আর্ত্তনাদ করছে এবং সামান্ত দোষ-ক্রটীর জন্ম তাদেরই আবার ধরে নিয়ে জেলে ঢোকাচ্ছেন। এ সব দরিদ্র কাঙ্গাল মানবশ্রেণীর জন্ম যদি জেলের ব্যবস্থা হয়, তবে আপনাদের জন্ম দ্বীপান্তরের ব্যবস্থা হওয়া উচিৎ। আগে জানতাম না—এই মিঃ সেন আমার মিলের ভিতরে এতবড় একটা জীবন্ত কলঙ্ক। এতবড় একটা দুর্বৃত্তকে পাঁচশো টাকা বেতন দিয়ে পুষে রেখেছি। তার কত বড় সাহস, আমার অনুপস্থিতিতে আমারই বাড়ীতে পুলিশ ডেকে সর্বহারা একটি মেয়ের ওপর এ অমানুষিক অত্যাচার করে। এতদূর স্পর্দ্ধা বেতন-ভোগী একজন সামান্ত ভৃত্যের। বলে সজল একবার মিঃ সেনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। মিঃ সেন ভীষণ শঙ্কাজড়িত চোখে সজলের দিকে পলক মাত্র চেয়ে মাথা গুঁজে রইলেন। তুলির চোখে মুখে যেন দারুণ যন্ত্রণার শিখা। তার দিকে চেয়ে সজল বললো, নারীর সম্মান আজীবন রেখে এসেছি। আপনাকে বেশী কিছু আমার বলবার নেই, শুনেছি আপনি বি. এ. পাশ। শিক্ষার এতবড় কলঙ্ক যে মেয়েদের মধ্যে থাকতে পারে তার দৃষ্টান্ত আপনি। নইলে মেয়েটিকে উৎপীড়িত

করবার জন্য মিঃ সেনের সঙ্গে আপনি হাত মিলাতেন না। আপনারা দু'জনেই যে এ ব্যাপারে জড়িত, তা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এ মেয়েটি কে—সে কথা শুনে নিজ নিজ অসীম অপরাধের শাস্তির জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকুন। I like to whip you out of my mill. বলে সজল মিঃ ব্যানার্জীর দিকে চোখ ফিরালো। মিঃ ব্যানার্জী কি যেন একটা গুরুতর অপরাধে অপরাধী—এমনি বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। সজল বলতে লাগলো, আপনি জানেন না—কতবড় একটা মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করে' এর ওপর অন্যায় উৎপীড়ন করছেন। অপরাধীর অপরাধ স্বীকৃত হ'লে দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা হ'তে পারে। কিন্তু সে অপরাধ স্বীকৃত না হওয়ার পূর্ব্বে ওকে স্পর্শ করার অধিকার আপনার নেই।

এস, দত্তের গায়ে টুপিটা ছুঁড়ে মেরে মুক্তা আবার ভয় পেয়ে গেলো। ইন্‌স্‌পেক্‌টার হয় তো এ অন্যায় আচরণের জন্য তাকে গুলি করেই মেরে ফেলবে। ভীতি বিহ্বল আনত তার দৃষ্টি।

"তার অঙ্গ স্পর্শ করবার অধিকার আপনার নেই।" কথাটা মুক্তার কাণে যেতেই সে চম্‌কে উঠলো। বিস্ময়াভিভূত সকল দেহ। তার পক্ষ সমর্থন করে' কথা বলে এমন লোক জগতে আছে? গভীর অরণ্য অভ্যন্তরে ব্যাঘ্রের মুখে পতিত মৃগশিশুর আকুল চীৎকার-বেদনায় সাড়া দেয় এমন লোক কে আছে [illegible]? মুক্তা এবার এস, দত্তের দিকে চোখ তুললো—কিন্তু সজলকে তবু চিনতে পারলো না, চিনবার মত নয়নের দৃষ্টি আজ তার নাই। তার সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আজ শোকাভিভূত। শুধু চেয়ে দেখলো—সৌম্য, শান্ত, তেজোপূর্ণ উদ্দীপ্ত অভয়মূর্ত্তি।—এ কে? মুক্তা আবার চোখ ফিরিয়ে ইন্‌স্‌পেক্‌টারের দিকে চাইলো।—বিবর্ণ অবশ, বিহ্বল কম্পিত, নির্ব্বাক নিস্পন্দ মূর্ত্তি।

নন্দল বলতে লাগলো, অতীতের স্মৃতিবেদনা-ব্যথিত কোমল কণ্ঠ-স্বর তার। সে অনেক দিনের কথা—রেঙ্গুন শহরে চাকুরী চাকুরী করে' যখন অফিসে অফিসে ভিক্ষা মেগে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছি, কোথা থেকেও পাইনি কোন সাড়া, তখন এ মুক্তার বাবা, আপনারা যাকে ভারতী বলে' জানেন—লক্ষপতি উপেন চৌধুরী আমাকে দিয়েছিলেন আশ্রয়। এবং মুক্তা ছিল আমার পরম প্রিয়। যেদিন জাপানী বোমায় রেঙ্গুন হ'লো বিধ্বস্ত সে দিন ক্ষ্যাপা পাগলের মত ছুটোছুটি করে' দৌড়িয়ে উপেন চৌধুরীর বাড়ীতে গিয়ে দেখি—সব শেষ! উপেন চৌধুরী মেসিন-গানে মারা গেছেন! মুক্তা ও তার মা কিছুক্ষণ পূর্ব্বে জাহাজে সমুদ্র পথে ক'লকাতা রওনা হয়ে গেছেন। সমস্ত বাসভবন শূন্য! শ্মশান যেন দাউ দাউ করে' জ্বলছে! চারতলায় সামনের ঘরে শ্বেতপাথরের মেঝের ওপর পড়ে' রয়েছে মুক্তার ওই মুক্তাকণ্ঠহার। কুড়িয়ে নিয়ে এলাম সেই অমূল্য রতন। বলে এস্. দত্ত হঠাৎ থেমে গেলেন। অসীম আকুল স্নেহ-বিহ্বল কোমল চোখে মুক্তার দিকে চাইলো। মুক্তার সকল অঙ্গে তখন বিস্ময়-শিহরণ। বুকের তলে কি যেন এক অসীম সম্ভাবনার দুরু দুরু কম্পন! তার এ মৃত্যুময় অন্ধকার বুকে প্রাণ সূর্য্যের মত সম্মুখে দাঁড়ানো এ কে? বিস্ময়াভিভূত চোখে—মুক্তা এস্. দত্তের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে' লুণ্ঠিত দেহভার দু'হাতের ওপর ভর করে' তুলে ধরলো। একটু একটু করে' এস্. দত্তের দিকে এগিয়ে এসে রুদ্ধ আকুল ক্ষীণ ও দুর্ব্বলকণ্ঠে বললো—কে আপনি? বলুন, কে আপনি? আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে ক্ষমা করুন। আমাকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচান! আমি হার চুরি করিনি।

এস্. দত্ত মুক্তার কথার উত্তর না দিয়ে মিঃ ব্যানার্জ্জির দিকে চেয়ে আবার বলতে লাগলো—"তারপর ভাবলাম, মুক্তার যদি কোনদিন সাক্ষাৎ পাই নিজ হাতে পরিয়ে দেব এ হার তার গলায়—ভেবে পরম

যত্নে সে হার রক্ষিত করে' রেখেছি এই ময়ূর-সিংহাসন গড়ে। যার কণ্ঠহারের জ্যোতিঃ-শিখায় জ্বলছে সমস্ত শ্রীরামপুর। সমস্ত শ্রীরামপুরের পথ ঘাট। যার কণ্ঠহার মূলধন করে' গড়ে তুলেছি এই বিরাট মিল; বাংলার বস্ত্র-সমস্যার একমাত্র প্রতিষ্ঠান। আজ মুক্তা তার নিজের হার মিথ্যা চুরির অপবাদে আপনার কাছে শাসিত, উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত এবং তার জন্য দায়ী ঐ মিঃ সেন আর ঐ ডলির মতো উচ্চশিক্ষিতা সন্দেহজনক কুমারী নারী—বলে' মিঃ দত্ত ময়ূর-সিংহাসন থেকে মুক্তার হার তুলে এনে মুক্তার দিকে এগিয়ে আসতেই মুক্তা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, বলুন, আপনি কে? এস্, দত্ত নামে আমার জীবনে রহস্যময় দেবতা?

এস্, দত্ত মুক্তার গলায় মুক্তাহার পরাতে পরাতে বললো, মুক্তা, আমি তোমার সেই মাষ্টারমশায় সজলকুমার।

—আপনি? মাষ্টারমশায়! মাষ্টারমশয়! বলে মুক্তা সজলকে জড়িয়ে ধরলে ও পরক্ষণেই মূর্চ্ছিতা হয়ে সজলের বুকে লুটিয়ে পড়লো। মূর্চ্ছিত দেহভার সজল পাঁজা কোলে করে' তুলে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে পিছন ফিরে ইন্‌স্‌পেক্‌টার ব্যানার্জির দিকে চেয়ে বললো, as it is a case of high treason Mr. Sen & Miss Dolly Dutt should be sent up for trial.

মিঃ সেন ও মিস ডলি সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ হ'লো। কৌতূহলী জনতা মিঃ সেন ও ডলির উদ্দেশ্যে সেইম্, সেইম্, বলে' তাদের চরিত্রের তুমুল আলোচনা করতে করতে সরে' পড়লো।

পরদিন মিলের সমস্ত শ্রমিক ও বড় বড় কর্মচারিবৃন্দ মুক্তাকে অভিনন্দন জানাতে এলো। মুক্তা সজলের আদেশে মুক্তাহার গলায় পরে' সকলের অভিনন্দন সাদরে গ্রহণ করলো। সজল সকলের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললো, আপনারা সকলেই একথা জানেন—এ মিলের সমস্ত

কার্য্য নির্ব্বাহ হয়ে আসছে "মুক্তা দেবী" নামে এবং এ মুক্তা দেবীর নাম অনুসারেই মিলের নাম হয়েছে মুক্তা কটন মিল। যার গলার কণ্ঠহার ছিল মিলের মূলধন, সে আজ আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত। আপনারা তাকেই জানবেন—মুক্তা কটন মিলের একমাত্র স্বত্বাধিকারিণী। আমি মিলের প্রতিষ্ঠাতা মাত্র। এ ছাড়া মিলের ওপর আমার আর কোন দাবী নেই। আপনারা আমাকে এতদিন যে আসনে বসিয়ে যে সম্মান দেখিয়েছেন, আজ থেকে সে সম্মানের অধিকারিণী একমাত্র এই মুক্তা দেবী।

অভিনন্দের পালা শেষ হ'য়ে গেলে সন্ধ্যার পর শ্রমিকদের নাচ, গান ব্যায়াম, কুস্তী দেখান হ'লো। তারপর মুক্তা ও সজলকে নিয়ে সমস্ত শ্রীরামপুরের পথঘাট ঘুরে এক শোভাযাত্রা হ'লো।

রাত্রি অনেক হয়ে গেছে। সজল শুয়ে পড়লো। মুক্তা শিয়রের ধারে টেবিলের ফুলদানিতে কয়েকটি রজনীগন্ধা রাখলো। সজল বললো, ফুল কি আমার সাজে? ফুল শুধু দেবতার পূজায় লাগে। মনে নেই সেদিনের কথা? একদিন তোমাকে পড়াতে গিয়ে দেখি—বারান্দায় বসে' ফুলের মালা গাঁথছো। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বললে, মাথা নীচু করুন, আপনার গলায় মালাটা পরিয়ে দিই। আমি তখন বললাম, আমার গলায় কেন ঐ ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের গলায় দাও।

মুক্তা বললো, সেদিন ঠাকুরের গলায় মালা দিয়েছিলাম বলেই আজ আপনার দেখা পেলাম। হয় তো সেদিন ঠাকুর রূপে আপনার গলেই মালা দিয়েছিলাম। বলে মুক্তা হেসে বেরিয়ে এসে নিজের ঘরে ঢুকলো। বাতিটা অফ্ করে' দিয়ে মুক্তাও শুয়ে পড়লো। সজলের বুকে সহসা লাগলো কি যেন এক অজানা দোলা!

মুক্তার চোখে আজ ঘুম নেই। রত্নলেখা আমার মেয়ে? না না, রত্নলেখাকে ভুলে যাবো। সে আমার মেয়ে নয়! সে সত্যব্রতের মেয়ে। সে জারজ। না কিছুতেই সে আমার মেয়ে নয়। আমি তাকে চাই না। সে বৈষ্ণবীর সঙ্গে থাক, আমি আর তার কোন খোঁজ নেবো না। ভাববো সে মরে গেছে, অপবিত্র সে। সে আমার জীবনে একটা মহা-কলঙ্ক। আমার এ কলঙ্কময় জীবন নিয়ে আমি সজলবাবুর কাছে দাঁড়াতে পারবো না! সে আমার এ কলঙ্কের, এ ঘৃণিত জীবনের কথা শুনলে শিউরে উঠবে, ভয় পেয়ে দূরে সরে' যাবে। তাকে হারাতে পারি না। জীবনের সব কিছু হারাতে পারি—এ অতুল ঐশ্বর্য্য, এ মুক্তা কটন মিল, মেয়ে রত্নলেখা, সব কিছু ছাড়তে পারি, সব কিছু ভুলে যেতে পারি, কিন্তু সজলবাবুকে কিছুতেই ভুলতে পারবো না। তাঁকে আমার চাইই। তিনি আমার হৃদয়-দেবতা। তাঁকে আমি ভালবাসি। তিনি আমার জীবনের সর্ব্বস্ব। তাঁর কাছে মেয়ে রত্নলেখা তুচ্ছ। আমি ভুলে যাবো তাকে, তার স্মৃতি আমি মুছে ফেলবো নিঃশেষ করে'।

প্রলয় দুশ্চিন্তায় মুক্তার অঙ্গ অবসন্ন হয়ে পড়ে। চোখ দু'টি বুঁজে ঘুমোতে চেষ্টা করে। ভুলতে চেষ্টা করে রত্নলেখার কথা। কিন্তু তার স্থানে সহসা এসে দেখা দেয় আর একটি শিশু "অসীম"। অসীমকুমার কে? সজলবাবুর ছেলে? হ্যাঁ, অসীমের মাষ্টার একদিন বলেছিলেন—অসীম মিঃ এস্, দত্তেরই ছেলে! সত্যিই কি তাই? সজলবাবু বিয়ে করেছেন?

মুক্তার সারা অঙ্গ আবার গভীর বেদনায় ভরে' ওঠে। চোখে নেমে আসে জলধারা। তবে কি তার আশা আনন্দ এক নিমিষে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে? সে যে তাঁকে চায়। না, না করুন তিনি বিয়ে। সতীনের ঘরই করবে সে। তবু সে সজলবাবুকে চায়। সজলবাবুর শয্যাপ্রান্তে একটুকু স্থান পেলেই তার জীবন হবে ধন্য।

সেদিন মুক্তার নামে একখানা চিঠি এলো কুলী ব্যারাকের ঠিকানায়। কুলীরা এসে মুক্তাকে চিঠিখানা দিয়ে গেলো। বৈষ্ণবী চিঠি লিখছে: "রত্নলেখার জামা পেয়েছি। সঙ্গে একখানা চিঠিও পেয়েছি। তারপর দু' তিন মাস চলে গেছে। তোমার কোন খবর নেই। মরে গেছো না জীবিত আছো; ঈশ্বর জানেন। এদিকে রত্নলেখা জামা পেয়ে কত খুসী! মুখে অবশ্য কিছু বলতে পারে না। কিন্তু সকল আনন্দ সর্ব্বাঙ্গে ফুটে ওঠে। জামা পরাতে গেলে হাত উঁচু করে' তোলে আর মুখ নেড়ে জিব নেড়ে অস্ফুট শব্দে কত কিছু বলে। মনের খুসীতে সারা ঘরে হামাগুড়ি দিয়ে খেলে বেড়ায়। গা থেকে জামা খুলতে গেলে মা মা করে' কেঁদে ওঠে, খুলতে দিতে চায় না। এখন বড় হয়েছে। স্পষ্ট করে' মা ডাকতে শিখেছে। একবার এসে তোমার রত্নলেখাকে বুকে তুলে নিয়ে চুমু খেয়ে মায়ের প্রাণ পূর্ণ করে' যাও। সোনার চাঁদের মত মেয়ে পেয়েছো! কি করে' এমন মেয়ে ভুলে থাকতে পার, ভাবতে পারিনা

ইতি—

তোমার বৈষ্ণবী মাসিমা।

চার পাঁচবার মুক্তা পত্রখানা পড়লো। চার পাঁচবার পত্রখানা বুকে চেপে ধরলো। তার মাতৃ হৃদয় চীৎকার করে' কেঁদে উঠলো। রত্নলেখার কচি মুখখানি চোখের উপর স্নেহ-সিক্ত হয়ে ভাসতে লাগলো। মুক্তা আবার শিউরে উঠলো। না না, এ কিছুতেই হ'তে পারে না। সে আমারই গর্ভজাত, আমি তার জননী, তার মা। আমার স্তন্য পান করেছে সে, সে বেঁচে আছে আমার বুকেরই স্নেহধারা পেয়ে। সে মা ডাকতে শিখেছে, তার স্নেহাকুল কণ্ঠস্বরে। না, আমি তাকে কিছুতেই ভুলতে পারিনা। তাকে গিয়ে আমি দেখে আসবো। সঙ্গে করে' নিয়ে আসবো। আমি একটা মিলের মালিক। আমার দুঃখ কিসের! অভাব

কিসের! এখানে এনে রাজকন্যার মত রাখবো। না, আমি তাকে কিছুতেই ত্যাগ করতে পারি না। মুক্তা আবার চিঠিটা বুকে চেপে ধরে।

কিন্তু সজলবাবু·········? মুক্তা আবার ভাবতে থাকে, সজলবাবুকে কি বলবো? তাঁকে যদি বলি—এ আমার মেয়ে। মুক্তার বক্ষ যেন রুদ্ধ হয়ে এলো। সহসা চিঠিটা টুক্‌রো টুক্‌রো করে' ছিঁড়ে ফেলে দিলো। রত্নলেখা আমার কেউ নয়।

কর্ম্মকোলাহল পরিপূর্ণ মুক্তা কটন মিল। দিন রাত্রি, চব্বিশ ঘণ্টা মিল চলছে। হাজার হাজার লোক দিনের পর দিন খেটে যাচ্ছে। অবিশ্রান্ত মিলের গতি। অবিরাম শ্রমিকদের পরিশ্রম, বসে থাকার সময় নেই। কাপড়ের দুর্ভিক্ষ সমস্ত বাংলা দেশে—কাপড় চাই। কাজেই মিল চলছে দিবা রাত্রি। সকলের বেতন বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বছরের শেষে ছ' মাসের বোনাস দেওয়ার বন্দোবস্ত হয়েছে। তা ছাড়া মিলের আয়ের কতক অংশ সকলের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে' দেবারও ব্যবস্থা হয়েছে; কাজেই সকলের মুখে এখন সুখের হাসি। এ মিল যেন তাদের সকলের।

এদিকে সজল নিজে মিঃ সেনের কার্য্যভার গ্রহণ করেছে। মুক্তাও ভলির স্থানে বসে' মেয়ে-মজুরদের ভার নিজ হাতে নিয়েছে। সেই সকাল আটটায় সজল ও মুক্তা দু'জনেই এক সঙ্গে মিলে ঢোকে, সারাদিন মিলের কাজ পর্য্যবেক্ষণ করে। মজুরদের দোষ-ত্রুটি পেলে হাসি মুখে তা সংশোধন করে।

মিল থেকে ঘরে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। বেয়ারা এসে দু' জনের জলখাবার দিয়ে' যায় চা আর ফল। মুক্তা সজলের পাশে বসে। সজল চা খেতে খেতে হেসে বলে, তোমাকে আমার পাশে এ ভাবে বসতে দেখলেই সেই রেঙ্গুনের কথা মনে পড়ে। কি দুষ্টুই ছিলে তুমি। পড়তে বসে' কত দুষ্টোমি করেছো, মনে আছে সেই বেড়ালটার

কথা? কি যেন ছিল তার নাম? মুক্তা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে লজ্জায় রাঙা হয়ে বলে, লালু!

—তোমরা যে দিন রেঙ্গুন ছেড়ে চলে এলে—সেই লালুকে নিয়ে এলে না কেন? দুষ্টোমির এতবড় সঙ্গীটিকে ফেলে এলে কেন?

—সামান্য একটা বেড়াল, তাই ভুলে গিয়েছিলাম।

—সজল হেসে বলে, কিন্তু অসামান্য হারটার কথা ভুলে গেলে কেন?

—ভুলে গিয়েছিলাম বলেই আজ আবার ফিরে পেলাম আপনাকে।

—আমাকে হারিয়েছিলে কবে?

—যে দিন আপনি আমার হাতে চুম্বন এঁকে দিচ্ছিলেন, হঠাৎ পর্দার আড়াল থেকে দেখতে পেয়ে মা আপনাকে ছাড়িয়ে দিলেন।

—সে দিন তোমার কি মনে হয়েছিল?

—আপনি আমাকে ভালবাসতেন।

—আজ আবার কি মনে হয়? বলে' সজল সামনের টেবিলের উপর সাজানো রাশিকৃত বই থেকে লেনিনের একখানা বই হাতে তুলে নিলো।

—আজ মনে হয়—আপনি অনেক বদলে গেছেন। এখন নিজেই বড় বড় বই পড়েন, আমার সেই 'শিশুমালা' আপনার অগ্রাহ্য, সঙ্গে সঙ্গে আমিও। ভুলে গেছেন এখন আমাকে।

—তার মানে?

—তার মানে—দেখতে পাচ্ছি আপনি বিয়ে করেছেন। অসীম আপনার ছেলে।

—হ্যাঁ পাখীকে আমি ভালবাসতাম—তাকে বিয়েও করেছিলাম শাস্ত্র-মন্ত্র উচ্চারণ করে' নয়—যুদ্ধ-দলিত দেশে শাস্ত্র-গ্রন্থ, মন্ত্রতন্ত্র, ব্রাহ্মণ পুরোহিত, শিক্ষা দীক্ষা, মন্দির মঠ যখন ধূলায় হয় ধূলিসাৎ তখন শুধু প্রাণ ও প্রেমই হয় প্রয়োজন মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের।

পাখীর সঙ্গে আমার বিয়েও হয়েছিলো ঠিক সেই রকমের। হ্যাঁ, তবে আমাদের মিলনের একজন সাক্ষী ছিলেন সিন্ধু বৌদি—কালা বস্তির সিন্ধু বৌদি। আমি তখন নিঃস্ব; সঙ্গে ছিলো শুধু তোমার মুক্তাহার। সেই হার পাখীর গলায় বিয়ের রাত্রে পরিয়ে দিয়ে বললাম, এ হার সম্বন্ধে এখন আমাকে কোন প্রশ্ন করোনা, সময় হ'লে বলবো—কার হারে তোমাকে সাজালাম। আমার দিকে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে পাখী বললো, আমি মরে' গেলে এ হারের মালিককে তুমি বিয়ে করো, তোমাকে সে ভালবাসে। তারপর যখন বহ্নিবাহী জাপানী বোমায় ভেঙে পড়লো সমস্ত রেঙ্গুন শহর, তখন ইভাকুইজ্ সেজে পায়ে হেঁটে দুর্গম গিরি অরণ্যবেষ্টিত পথে এক দুর্যোগ রজনীতে মারা গেলো সিন্ধু বৌদি, মারা গেলো পাখী ; বেঁচে রইলাম আমি আর অসীম। অসীম সেই সিন্ধু বৌদিরই ছেলে, আমার নয়।

সেই দিন রাত্রে। নিদ্রাহীন মুক্তার দু'টী চোখ। অসীম তার ছেলে নয়! তা'হলে সেতো মুক্ত, সকল বন্ধনহীন। তাঁকে পাবার তো বাধা নেই তা হ'লে। মুক্তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আনন্দোৎসে ভরে' গেলো তার বুক। শয়ন ছেড়ে কি যেন উত্তেজনায় উঠে বসলো। তারপর আস্তে আস্তে দ্বার খুলে মুক্তা বেরিয়ে পড়লো। সজলের ঘর দিবারাত্রি চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকে। তার দ্বার সকলের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত। বিশেষ আজ বাংলার দারুণ বস্ত্রদুর্ভিক্ষের দিনে।

রাত্রি তখন দুটো। মুক্তা সজলের ঘরে ঢুকে পড়লো। সুইচ্ টিপে বাতি জেলে দিলো। আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো সকল ঘর। শিয়রের ধারে টেবিলের উপর প্রস্ফুটিত রজনীগন্ধা। গন্ধ-আমোদিত শয়ন-কক্ষ। প্রেম-আমোদিত মুক্তার চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠলো। সজল গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। বালিশ থেকে মাথা পড়ে গেছে। মুক্তা মৌন নম্র কম্পিত হস্তে মাথা তুলে ধরে বালিশটা টেনে মাথার নীচে দিতেই

সজলের ঘুম ভেঙে গেলো। অলস বিহ্বল চোখ মেলে চাইতেই দেখে মুক্তা! সজল বিস্মিত কণ্ঠে বললো মুক্তা, তুমি!

মুক্তা শান্ত ও ধীর কণ্ঠে বললো, হাঁ, আমি, নিভৃত নির্জন চারিধার, গভীর রাত্রি, সুপ্ত পৃথিবী ; যে কথা বলতে এসেছি, এই-ই তার সময়।

সজল হেসে বললো, বলো কি কথা?

মুক্তা লজ্জিত ও অবনত মুখে বললো, আমাদের মিলিত জীবন ও সে জীবনের পরম শান্তি—আপনার কি অভিপ্রেত নয়?

সজল এবার উঠে বসে ধীর গম্ভীর স্বরে বললো, জীবনের অভিপ্রেত অনেক কিছু। কিন্তু ঝড় ওঠে, বন্যা জাগে, ভেঙে পড়ে ঘর বাড়ী। ভেসে যায় জীবনের সমস্ত বাসনা, কামনা। অভিপ্রেত বস্তুর আর সন্ধান মিলে না।

মুক্তা বললো, কিন্তু আমার এই দুঃখময় জীবনের একমাত্র দৃঢ় আশ্রয় আপনি। আপনাকে পাওয়ার চেয়ে বড় শান্তি আমার আর কিছু নেই। পৃথিবীর ধন-ঐশ্বর্য্য সব তুচ্ছ, শান্তির চেয়ে বড় পৃথিবীতে আর কিছু নেই। পুরুষের বক্ষে আশ্রয় পাওয়াই নারীর সব চেয়ে বড় শান্তি ; আমি আপনার কাছে আজ তাই চাই। আমাকে আশ্রয় দিন। বলে মুক্তা সজলের বুকে মুখ লুকালো।

সজল মুক্তার কেশগুচ্ছে অঙ্গুলি সঞ্চালন করে' বললো, শান্তিদাতা ভগবান্। মানুষের কি শক্তি আছে, শান্তি দিতে পারে? তবু বলছি, তোমাকে পেলে আমিও সুখী হবো।

কিছুদিন পর মুক্তা তার ঘরে চেয়ারে বসে সামনের টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। বিষাদঘন কালো ছায়া তার মুখে চোখে। দেখলে মনে হয় কি যেন এক মর্মভেদী বেদনায় কেঁদে আকুল হয়ে অবসন্ন নয়নে ঘুমিয়ে পড়েছে। শুষ্ক অশ্রুরেখা তার কপোল বয়ে। টেবিলের উপর একখানা খোলা চিঠি।

সজলের আজ শরীরটা খারাপ। মনটাও বিশেষ ভাল নয়। তার ওপর আজ ভয়ানক একা একা মনে হচ্ছে। মুক্তা তাকে ভালবাসে। সে তাকে পেতে চায়, পেতে চায় শান্তি। সত্যি শান্তিই জীবনে সব চেয়ে বড় কথা। সজলও শান্তি পেতে চায়। এতবড় একটা মিল সে গড়ে' তুলছে। দেশময় তার নাম, তার সুখ্যাতি, কিন্তু শান্তি পেয়েছে কি সে? শান্তি কোথায়? মুক্তাকে পাবার মাঝে, মুক্তাকে ভালোবাসার মাঝেই পরম শান্তি। প্রেমেই শান্তি শান্তিই প্রেম। এই সব ভেবে সেদিন মুক্তার ঘরে এসে ঢুকলো। মুক্তা টেবিলের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে, সম্মুখে একখানা খোলা চিঠি।

সজল চিঠিখানা তুলে পড়লো:

মুক্তা,

তোমার মেয়ে রত্নলেখার ভয়ানক অসুখ। ডাক্তার বলে গেলো ভাল রকম চিকিৎসা ও পথ্যের বন্দোবস্ত না করলে মেয়ে বাঁচবেনা। মা হয়েছো, মেয়ের জন্ম তোমার এতটুকু মায়া নেই—এ কেমন মা? এ পাড়াগাঁ—ভালো ডাক্তার কবিরাজ নেই, মেয়েকে বাঁচাতে হ'লে ক'লকাতা নিয়ে বড় ডাক্তার দেখাও।

ইতি—

তোমার

বৈষ্ণবী মাসী

সজলের পায়ের নীচ থেকে যেন পৃথিবী সরে' গেলো। তার কাণ দিয়ে যেন আগুন বের হ'তে লাগলো। দু'টী চোখ তার যেন স্তব্ধ কম্পিত, বিস্মিত! মুক্তার মেয়ে! মুক্তার মেয়ে রত্নলেখা! সজলের সমস্ত অঙ্গে যেন তড়িৎপ্রবাহ। চোখে মুখে বিপুল বেদনার ছায়া ঘনীভূত হয়ে এলো। সে কি এক গভীর সন্দেহে কেঁপে উঠলো! নিমিষে তার সকল অঙ্গ অবশ বিহ্বল হয়ে পড়লো; সে যেন কাঁপতে লাগলো। সামনে

টেবিলের ওপর হাত ভর করে' সে দাঁড়ালো। তবে কি মুক্তা পাতকা? না, তা কিছুতেই হ'তে পারে না। মুক্তা তাকে ভালবাসে, তাকে স্বামী রূপে পেতে চায়। তার বুকে মুখ লুকিয়ে পেতে চায় আশ্রয়। পেতে চায় শান্তি। তবে? তবে এই চিঠি কার? মুক্তার নামে এ চিঠি কেন? তবে কি সম্পূর্ণ চিঠিটা মিথ্যা? সজল এবার নিজকে সামলিয়ে নিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে গম্ভীর কণ্ঠে ডাকলো, মুক্তা!

মুক্তা চকিতে জেগে উঠলো। মুখ তুলে সজলের দিকে চাইলো। সজলের হাতে চিঠিখানা দেখতে পেলো। মুক্তা নিমিষে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারলো। মুক্তার মনে হ'তে লাগলো—আকাশ ছোঁয়া দ্রুতগামী এরোপ্লেন থেকে তাকে যেন কে অকূল সমুদ্রের বক্ষে ফেলে দিয়েছে। সে যেন আজ সমস্ত কূল-কিনারা হারা।

সজল তীক্ষ্ণ ও গম্ভীর স্বরে বললো, মুক্তা! এ চিঠি তোমার? এ মেয়ে তোমার?—এ রত্নলেখা কে?

মুক্তা নিজকে দৃঢ় করে' নিয়ে অবিচলিত কণ্ঠে বললো, রত্নলেখা আমার গর্ভজাত সন্তান; জারজ।

সজল চীৎকার করে' উঠলো, জারজ!

মুক্তা বললো, হাঁ, জারজ। পিতৃ-পরিচয়হীন।

সজল আর্তকণ্ঠে বললো, তুমি পতিতা! তোমার জীবনে এ কলঙ্ক!

—মানব জীবনের ইতিহাস কখন কি করে' বিভীষিকাময় হয় সে কথা মানুষ কেন দেবতারা পর্যন্ত জানেনা। যখন রেঙ্গুন ছেড়ে মাকে নিয়ে ক'লকাতা এসে বাসা বাঁধলাম, তখন বাংলার বুকে মহা দুর্ভিক্ষ, ঘরে ঘরে অভুক্ত, ঘরে ঘরে মৃতদেহ, মহাশ্মশান জ্বলছে বাংলার বুকে। লোকে তখন কিনা করেছে। স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করে' স্বামী পালিয়েছে। বৃদ্ধ পিতামাতা ত্যাগ করে' সন্তান পালিয়েছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে রাস্তার ওপর ফেলে মা পালিয়েছে। এমনি

যখন দেশের অবস্থা তখন আমিও অনশনক্লিষ্ট মৃতপ্রায় মাকে বাঁচাবার জন্য বাংলার এক ধনীর কাছে নিজের দেহ বিক্রী করে' একমুষ্টি চাল ভিক্ষা করেছিলাম। চোরা বাজারে বিক্রী করার জন্য তার গুদাম ভর্ত্তি ছিলো লক্ষ মণ চাল। সে ইচ্ছা করলে অনায়াসে আমাকে একমুষ্টি চাল এমনি ভিক্ষা দিতে পারতো, কিন্তু তা সে দেয়নি। বললো, তোমার দেহ বিনিময়ে পেতে পারো। ক্ষুধার কাছে তখন নিজের দেহটাকে তুচ্ছ মনে করলাম। আর ঐ লোকটাকে মনে করলাম, তার চেয়েও তুচ্ছ হীন ঘৃণিত, বাংলার বুকে মহাপাপ। কিন্তু চাল নিয়ে ঘরে ফিরে এসে দেখি মা নেই। কিছুক্ষণ আগে মারা গেছে, বস্ত্রাভাবে অনাবৃত শবদেহ পড়ে আছে। তখন মার জন্য যতটা না কেঁদেছি তার চেয়ে অধিক কেঁদেছি নিজের পাপকৃত দেহের দিকে চেয়ে। সে পাপ দেহে যে শিশুর জন্ম হ'লো তাকে জারজ বলতে পারেন সজলবাবু, কিন্তু সেও আমার মতো, আপনার মতো মানুষ। তারও বেঁচে থাকার অধিকার আছে ভেবে সে দিন ভ্রূণহত্যা করে' নিজের কলঙ্ক ঘুচাতে চেষ্টা করিনি। আজ আপনার দেখা পেয়ে, আপনাকে ভালবেসে স্বামীরূপে বরণ করতে গিয়ে দেখি—আমি কলঙ্কিনী। রত্নলেখা আমার জারজ সন্তান। তাই আপনাকে পাবার আশায় রত্নলেখাকে ভুলতে লাগলাম, ওকে ত্যাগ করলাম। ভাবলাম আপনিই আমার সব, রত্নলেখা কেউ নয়।

সজল স্তব্ধ, স্তম্ভিত! একমুষ্টি চালের বিনিময়ে নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার। যদি ভারত কোনদিন স্বাধীন হয় তবে ব্ল্যাক-মার্কেটের এ ধনী ব্যবসায়ীদের দেশ থেকে বা'র করে' দিতে হবে। ভারতের এ পুণ্যভূমিতে তাদের স্থান নেই। নেই তাদের স্থান এখানে! বলে সজল আহত রক্তাক্ত সৈন্যের মত সুধার ঘর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলো।

আজ মুক্তার কাছে সারা পৃথিবী অন্ধকার। তার চোখের সামনে কাঁপতে লাগলো, সমস্ত আকাশ, সমস্ত ভূতল। সজল বেরিয়ে গেলে মুক্তা বৃন্তচ্যুত লতার মতো পড়ে রইলো। অশ্রুসিক্ত মুদিত নয়ন তলে তার জেগে' উঠলো মধুলেখারস্মৃতি-শ্মশান। জারজ সন্তানের জীবন-দাহন।

মাসখানেক চলে গেলো। মুক্তা প্রতিদিন একটু একটু করে' মরতে মরতে এতটুকু হয়ে গেছে। বুকের তলে কি এক নৈরাশ্যের চিতা। ইচ্ছে করে' আকুল কান্না কেঁদে সে অশ্রুজলে বুকের চিতা নিবিয়ে দেয়। দিনরাতি চব্বিশ ঘণ্টা সে কেঁদেছে অনেক—কিন্তু বুকের আগুন নেবেনি একটুকু। আর সহ্য হয়না—সে আর সব কিছু সহ্য করতে পারে, কিন্তু সজলবাবুর এ কঠিন নীরবতা তার অসহ্য। দিন সমস্তের দু'একটা দরকারী কথা ছাড়া সজলবাবু তার সঙ্গে আজকাল আর কোন কথা বলেন না। অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলে দু' এক কথার উত্তর দেন এবং সে উত্তরে তিরস্কারের বেদনাই বেশী ঘনীভূত হয়ে ওঠে। আগের মতো তার চোখে নেই সে হাসি উজ্জ্বল দৃষ্টি। নেই উদ্দীপ্ত সৌম্য শান্ত চেহারা। মুখে চোখে কি যেন এক বিষাদ-ঘন কালো ছায়া। অসহ্য; মুক্তার আর সহ্য হয় না! তার একবার ইচ্ছে করে সজলবাবুর পা দু'টো জড়িয়ে ধরে বলে, আমাকে ক্ষমা করো তুমি। আমি ক্ষমা চাই; আমি জীবনে আর কাউকে ভালোবাসিনি। আমি আমার সর্ব্ব মন প্রাণ পূজার অর্ঘ্যাঞ্জলি তোমার পায়ে নিবেদন করেছি, আমার সে পূজা তুমি ফিরিয়ে দিওনা। ওগো, আমাকে বাঁচাও। তুমি আমাকে ত্যাগ করলে আমি যে মরে যাবো।

কিন্তু সজলের পা জড়িয়ে ধরে একথা বলতে মুক্তার সাহস হয়না। কি যেন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সন্দেহ-সংশয় মিশ্রিত অসীম দুর্ব্বলতা এসে তাকে

বাধা দেয়। বুকের তলে ঝড় ওঠে। থর থর কেঁপে ওঠে সারা দেহ। সারা প্রাণ অসীম অবসাদে নুয়ে পড়ে, বলতে আর সাহস হয় না।

কিন্তু এমনি দিনদিন জ্বলে' পুড়ে একটু একটু করে' মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাওয়ার চেয়ে কথাটা স্পষ্ট করে' জানা ভালো। সত্যই কি সে আর তাকে চায় না

পর দিন। রাত্রি অনেক হয়ে গেছে। মুক্তা আস্তে আস্তে সজলের ঘরে ঢুকলো। সুইচ্ টিপে বাতি জ্বাললো। সজল গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। মুক্তা সজলের শয্যাপ্রান্তে বসলো। ভীতি-কম্পিত হস্তে সজলের একখানি হাত নিজের হাতে তুলে নিলো। তারপর গভীর উত্তেজনায় হাতখানি টেনে তুলে নিজের অধর প্রান্তে ঠেকালো। সজলের ঘুম ভেঙ্গে গেলো। মুক্তা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো। লজ্জিত নতমুখে বললো, ক্ষমা করবেন, সজলবাবু আপনার ঘুমের ডিস্টার্ব করলাম।

সজল শায়িত অবস্থাতেই উপুড় হয়ে দুই কনুইয়ের ওপর ভর করে' মাথা তুলে মুক্তার দিকে চেয়ে গাঢ়স্বরে বললো, শুধু ঘুম নয়, মুক্তা, আমার সমস্ত জীবনটাকে তুমি ডিস্টার্ব করে' দিয়েছ।

মুক্তা শিউরে উঠলো, বুকের তলে যেন লক্ষ হাতুড়ীর আঘাত।

কিন্তু থাক সে কথা। এত রাত্রে তোমার এ ঘরে প্রবেশ করা ঠিক হয়নি। আমি তা পছন্দ করি না। আমি তোমাকে চাইনা, তুমি চলে যাও।

গভীর কণ্ঠে মুক্তা এবার বললো, যেহেতু আমি জারজ সন্তানের মা। জারজ সন্তানই আপনি বড় করে' দেখলেন! কিন্তু সেদিনের যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, ক্ষুধা এ সকলি তুচ্ছ?

সজল এবার সোজা হয়ে উঠে বসলো। তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললো, আজ দু'শো বৎসর যাবৎ ভারত অন্নহীন বস্ত্রহীন; সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের পুরুষদের অপমৃত্যু। কিন্তু ভারত-নারী পতিতা, সেটা দেশের কলঙ্ক।

তোমাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম ধনীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে, দরকার হলে' প্রাণ দিতে, দেহ দিতে নয়।

মুক্তা এবার সুইচ্ টিপে বাতিটা অফ করে' নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়লো। রাত অনেক হয়ে গেছে, কিন্তু ঘুম নেই তার চোখে। সহসা দারুণ আঘাতে তার বুকটা শতছিন্ন হয়ে গেলো। মুক্তা বিছানার ওপর পড়ে ছট্‌ফট্ করতে লাগলো। তার দুই চোখ তিক্ত অশ্রু-বেদনায় ভরে' উঠলো। অবারিত চোখের জলে বালিশটা ভিজে উঠলো। অসহ্য এ যন্ত্রণা! এত বড় আঘাত সে জীবনে যেন আর পায়নি। সে একান্ত চিত্তে সজলের পায়ে মন-প্রাণ ঢেলে দিয়েছিল। তার বুকে মুখ লুকিয়ে এ কঠিন পৃথিবীর সমস্ত আঘাত ভুলতে চেয়েছিল। সে ধন চায়না, ঐশ্বর্য্য চায়না, চায় সে শান্তি, চায় সে একটুকু ছায়া-শীতল স্থান সজলের পাশে। সমস্ত পৃথিবীটা একটা কুরুক্ষেত্র। মানুষের ওপর মানুষের অমানুষিক অত্যাচার। মানুষকে নিয়ে মানুষ দিনরাত টানাটানি করছে। শৃগাল কুকুরের মত সম্মুখ থেকে বিতাড়িত করছে। সভ্যতার নামে দেশে দেশে চলেছে জঘন্য বর্ব্বরতা। তার জীবনের এ সতের আঠারো বছরের অভিজ্ঞতার মাঝে সে শুধু দেখেছে এ পৃথিবীতে মানুষ নামে কতগুলি দস্যু-দানব; প্রকৃত সত্য সুন্দর মানুষ যেন কেউ নেই। সে প্রতি মানবের কাছে পেয়ে এসেছে শুধু ঘৃণা, অবহেলা, অপমান, লাঞ্ছনা, যাতনা, উৎপীড়ন, শেষে সত্য সত্যই সে একটি সুন্দর মানুষের দেখা পেলো। সত্যই তাকে মানুষ বলে মানতে ইচ্ছা হ'লো। এ নিষ্ঠুর পৃথিবী থেকে দূরে সরে' গিয়ে তার কাছে আশ্রয় পেতে ইচ্ছা করলো। কিন্তু আজ সে সজলও তাকে নিষ্ঠুরভাবে ত্যাগ করলো। তবে? তবে আর তার স্থান কোথায়? কোথায় তার আশ্রয়? বেঁচে থেকে তবে আর কি লাভ!

যুদ্ধের অবস্থা তখন অত্যন্ত খারাপ। জাপান সৈন্য মণিপুর অঞ্চলে

ঢুকে পড়েছে। যে কোন মুহূর্তে সমস্ত ভারত ব্রিটিশের হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে। সে আশঙ্কায় হাজার হাজার সৈন্য আসাম অঞ্চলে দিবারাত্রি পাঠানো হচ্ছে। তাদের খাওয়া-পরার যাতে কোন রকম অসুবিধা না হয় সে জন্য ভারত সরকার অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। দেশের সমস্ত চা'ল কিনে গুদাম বোঝাই করে' রেখেছে। ভারতের কাপড়ের সমস্ত মিলের ওপর আদেশ করা হয়েছে যে মিল প্রস্তুত সমস্ত কাপড় আগে সরকারকে দিতে হবে। মুক্তা কটন মিল দেশের নগ্নদের জন্য। কিন্তু এখন উপায়? সজলের চোখে ঝরলো জল দেশের গরীব দুঃখীদের দিকে চেয়ে।

মুক্তা সেদিন সজলকে তার ঘরে ডেকে গর্ব্বিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো, মিলের সমস্ত কাপড় আপনি সরকারকে দিচ্ছেন?

সজল নম্রকণ্ঠে উত্তর দিলো, হাঁ, সরকারের আদেশ।

মুক্তা উত্তেজিত স্বরে বলে উঠলো, মিল আমার, আমার আদেশ, মিলিটারী সাপ্লাই বন্ধ করুন। এ মিলের সমস্ত কাপড় বাংলার উলঙ্গদেহ ঢাকবার জন্য, সৈন্যদের জন্য নয়। তারপর অশ্রুসিক্ত ব্যথাতুর কম্পিত কণ্ঠে মুক্তা দৃষ্টি ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করে' বললো। আজও মনে পড়ে—মার সেই উলঙ্গ শবদেহের কথা। এতটুকু বস্ত্র খুঁজে পাইনি। সেদিন মার মৃতদেহ ঢেকে দিবার জন্য। গভীর রাত্রে অন্ধকার গলি ঘুরে ঘুরে তাঁর মৃতদেহ বহন করে' গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর সজলের দিকে চেয়ে বললো, আমার আদেশ—মিল-প্রস্তুত সমস্ত কাপড় ভারতের সমস্ত উলঙ্গ নরনারীর জন্য।

সজল এবার একটু শক্তকণ্ঠে বললো, কিন্তু তোমার আদেশ আজ তুচ্ছ। মিলের ওপর তোমার আজ আর কোন অধিকার নেই।

মুক্তা জলে' উঠলো, কি? আমার মিল—আমার কোন অধিকার নেই?

—নেই।

—আপনিও বলছেন এ কথা ?

—হ্যাঁ, আমিও বলছি এ কথা।

—আশ্চর্য্য ! এ ক'বছরের মধ্যেই সব ভুলে গেছেন ?

—কি ভুলে গেছি ?

—আমি ছিলাম আপনার ছাত্রী, মনে নেই আপনি আমাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন অন্যায়, অত্যাচার, উৎপীড়নের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে। আজ আপনি ভারতসরকারের এ অন্যায়, এ উৎপীড়ন নীরবে সহ্য করতে বলছেন ?

সজল একটু ব্যথিত কণ্ঠে বললো, হ্যাঁ, ভারত সরকারের উৎপীড়ন ভারতবাসী নীরবেই সহ্য করে আসছে। ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষ তার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

—কিন্তু সে মূক নীরব মৃত ভারতবাসীর দলে আমি নই। যেখানে অন্যায়, যেখানে অত্যাচার সেখানে প্রলয়ঙ্করী বেশে করব তার প্রতিকার। নিজেদের মিলের কাপড় নিজ নগ্ন অঙ্গের লজ্জা ঢাকবার জন্য নয়, আগে সৈন্য অঙ্গ সুশোভিত করতে হবে ! কত বড় অন্যায় আদেশ ! খাওয়া পরার স্বাধীনতা প্রতি মানবের জন্মগত দাবী।

—না না, সেই স্বাধীনতাও আজ আমাদের নেই।

—না থাক সে স্বাধীনতা, কিন্তু একটা সুসভ্য জাতকে এমনি বিবস্ত্র করে' রাখা একি সভ্যতার বিরুদ্ধে অসভ্যতার অভিনয় নয় ? ঘোরতর এ অত্যাচার আপনি সহ্য করতে পারেন কিন্তু আমি তা পারবো না।

সজল লজ্জিত হ'লো। কোন জবাব দিতে পারলো না।

সপ্তাহখানেক পরে। রাত্রি গভীর, কেওড়াদের পারে বিজলী বাতিটা আজ যেন রক্তশিখায় জ্বলছে। মুক্তার বুকেও আজ রক্তশিখা। তার

সহস্র অর্দ্ধ যেন আজ কি এক বিদ্রোহানলে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। সে দেয়ালের ঘড়িটার দিকে চাইলো—ছ'টো। না না, আর দেরী করা চলে না। নীরব, নিঝুম চারিধার—এখনি সময়। পৃথিবীর বক্ষ হ'তে বিদায় নেবার এখনি সময়! রক্তলেখা, না না সে আরজ সজল-বাবুর চোখে, পৃথিবীর চোখে সে কলঙ্ক। সে মরে যাক, মুক্তা ড্রয়ার খুলে' এক টুক্‌রা কাগজে লিখলো:

সজল বাবু,

আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন। আজ আমি বিদ্রোহী, শয়তানী, ধ্বংসরূপী মহাপ্রলয়। আমার প্রথম বিদ্রোহ ভারত সরকারের বিরুদ্ধে, ভারতবাসীকে বস্ত্রহীন করবার অধিকার তার নাই। দ্বিতীয় বিদ্রোহ আপনার বিরুদ্ধে, আপনি "মিলিটারী সাপ্লাই" সরকারের আদেশে গ্রহণ করতে পারলেন—কিন্তু আমার গর্ভজাত সরল, সত্য, সুন্দর নিরীহ একটি মানবশিশুকে গ্রহণ করতে পারলেন না। এর চেয়ে কলঙ্ক আপনার আর কি থাকতে পারে? এ দু'য়ের বিরুদ্ধেই আমি বিদ্রোহ-ঘোষণা করে' আপনার কাছে বিদায় চাচ্ছি। আমার মিলের একটা সুতোও আমি মিলিটারীর জন্য দিতে রাজী নই। আজ মিলে আগুন ধরিয়ে দিয়ে এবং সে আগুনের পবিত্র শিখায় নিজের দেহ দান করে' ভারতের বুকের এ মহা পাপ থেকে নিজকে মুক্তি দিতে চললাম।

ইতি—

মুক্তা

রাত্রি তখনও ভোর হয়নি। সহসা সজলের ঘুম ভেঙে যেতেই দেখে তার দরটা আলোকোজ্জ্বল পূর্ব্বদিকের ঘরটাকে দিনের মত করে তুলেছে। সজল উদ্ভ্রান্ত বিস্ময়ে তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে এসে

জানালার ধারে দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখে মিলে।
সজল দৌড়ে মুক্তার ঘরে ঢুকে ডাকলো—মুক্ত, মিলে আগুন!

কিন্তু মুক্তার কোন সাড়া শব্দ নেই। ঘরটা অন্ধকার। জানালা বন্ধ। সজল সুইচ টিপে বাতি জেলে দিলো। [illegible] শয্যা, মুক্তা নেই। সজল তবু চীৎকার করে' ডাকতে লাগলো—মুক্তা! মুক্তা! কোথায় তুমি? সম্মুখে এগিয়ে আসতেই টেবিলের ওপর এক টুকরা কাগজে কি লেখা দেখতে পেলো। ব্যস্ত উদ্বিগ্ন [illegible] কাগজখানা হাতে তুলে নিয়ে পড়লো—পড়ে' উচ্চৈস্বরে চীৎকার করে বললো, মুক্তা, তুমি এ কি করলে, দৌড়িয়ে এসে জানালা খুলে' বাইরের দিকে মুখ করে' আবার চীৎকার করে' বললো, মুক্তা, তুমি এ কি করলে! জানলা খুলতেই বিভীষিকাময় আগুনের রাঙা আলো এসে সজলের মুখে চোখে পড়লো। রক্ত আলোরঞ্জিত সজলের রুদ্ধ বক্ষ হ'তে গভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে অতি আস্তে বেরিয়ে এলো—আগুন নয়, বিদ্রোহ।